সাহিত্য সমাজ ভাবনা

আবু জাফর

CamScanner

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৪০২
জুন ১৯৯৫

বাএ ৩১৭৭

পাণ্ডুলিপি
গবেষণা উপবিভাগ

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রাকর
আশফাক-উল-আলম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

প্রচ্ছদ
মামুন কায়সার

মূল্য
নব্বই টাকা মাত্র

SHAHITTE SAMAJ BHABNA by Abu Zafor. Published by Shamsuzzaman Khan, Director, Research-Compilation-Folklore Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First edition : June 1995. Price : Taka 90·00 only.

ISBN-984-07-3186-6

উৎসর্গ

প্রয়াত অগ্রজ অধ্যাপক আবু জোবের-কে
তোমার কথা ভুলিনি, ভুলবো না

লেখকের কথা

নির্ভুলভাবে একটা বই বের করা যে কতো কঠিন কাজ তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। নির্ভুলভাবে শব্দ ছাপা হয়েছে কিনা দেখতে গিয়ে হয়তো বাক্য ব্যবহারে ত্রুটি থেকে যায় কিংবা বাক্যের ত্রুটি মোচন করতে গিয়ে শব্দের বানানে ভুল থেকে যায়। আর বইটি যখন সঙ্গত কারণে অত্যন্ত তাড়াহুড়ার মধ্য দিয়ে বের করা হয় তখন এ ধরনের প্রমাদ থেকে মুক্তি পাওয়া সত্যিই কঠিন। এই বইটি বেশ তাড়াহুড়ার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং সেই কারণে বানান ভুলতো বটেই, বাক্য গঠনেও ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়—আমি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে সেই কারণে আগে থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ক্ষমা চাচ্ছি এই আশ্বাসের ভিত্তিতে যে এর পরের সংস্করণে বইটি যথাসম্ভব ত্রুটিহীনভাবে বের করা হবে। বাংলা একাডেমীর গবেষণা বিভাগের উপ পরিচালক ড. সুকুমার বিশ্বাস খুবই বিশ্বস্ততার সঙ্গে পরীক্ষকদ্বয়ের কাছ থেকে পৌনঃপুনিক-তাগাদার মাধ্যমে বইয়ের পরীক্ষিত পাণ্ডুলিপি আনিয়ে তা ছাপানোর ব্যাপারে যে আগ্রহ ও শ্রম স্বীকার করেছেন তা সত্যিই মনে রাখার মতো। মুদ্রণ বিভাগের আফজল সাহেবের আন্তরিক সহযোগিতার কথাও মনে পড়ছে।

বাংলা একাডেমী থেকে বইটি প্রকাশিত হওয়ায় বান্ধবী সুলতানা (গুড়িয়া) খুবই আনন্দিত—তার সহর্ষ সেই অভিব্যক্তি আমার মনের মধ্যে গাঁথা রইলো।

বইটির সবগুলি প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো—প্রত্যেকটি প্রবন্ধের নীচে তারিখসহ সে সব তথ্য সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

এই বই উৎসর্গ করেছি আমার প্রয়াত অগ্রজকে। তিনি বরিশাল সরকারী মহিলা কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। প্রাবন্ধিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি আছে। 'সাহিত্যের দিগন্ত' নামে তাঁর একমাত্র প্রবন্ধের বই পুঁথিঘর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বইটি পড়লে বোঝা যায় তাঁর বৈদগ্ধ্যে কোনো ফাঁকি ছিল না। ১৯৮৯ সালের ৩রা নভেম্বরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি আকস্মিকভাবে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর শোকাবহ স্মৃতির ভার আমি বয়ে বেড়াচ্ছি। আমার জীবনে তাঁর মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ কোনোকিছুতেই সম্ভব নয়—আমরা দুজনে ছিলাম অভিন্নহৃদয়ের মানুষ। গভীর শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় ভালবাসার মধ্যদিয়ে যে মানুষটিকে জ্যেষ্ঠ সহোদর হিসেবে পেয়েছিলাম তাঁকে এভাবে হারাতে হবে একথা যখনই ভাবি তখনই সবকিছুকেই নিরানন্দময় মনে হয়, এক ধরনের বিষাদময়তা বা বিষণ্নতা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এ গ্রন্থ তিনি দেখে যেতে পারলেন না, যদিও আমার সান্ত্বনা এটুকু যে এর অধিকাংশ প্রবন্ধই তিনি পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। বইটি তাঁকে উৎসর্গ করতে পেরে এই মুহূর্তে বেদনার ভার কিছুটা লাঘব হচ্ছে।

২৩/২০ পল্লবী
মিরপুর, ঢাকা।

আবু জাফর

সূচিপত্র

রবীন্দ্রনাথের মুৎসুদ্দি মধুসূদন	১
রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়'	২০
নজরুল কাব্যে পুঁথি ও পুরাণের ব্যবহার	৫৪
সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে কয়েকজন কল্লোলীয় গল্পকার	৭৮
লাল সালু : দেশকাল	১২৭
এয়াকুব–মানস ও তাঁর সাহিত্য পরিচয়	১৪৪
সুকান্ত সমীক্ষা	১৫৫

রবীন্দ্রনাথের মুৎসুদ্দি মধুসূদন

রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি প্রকাশ করেন তখন তাঁর বয়স ছিল আটষট্টি বছর। অর্থাৎ ইংরেজী ১৯২৯ সালে ঐ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। আটষট্টি বছর বয়সে 'যোগাযোগ'-এর মতো একটি উপন্যাস রচনার প্রেরণা প্রধানত উনিশ শতকের আর্থ-সামাজিক জীবনের দ্বন্দ্বকে উপস্থাপন করার ঐকান্তিক আগ্রহ থেকেই এসেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বের বাজারে পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের লক্ষণগুলি বিশ্বের প্রায় সর্বত্র প্রকট হতে হতে ১৯২৯-৩০ সালে তা নিদারুণ আকার ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথ পুঁজিবাদের এ-দারুণ অবক্ষয়ও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের বিকাশ অনেক আগে থেকে ঘটলেও ঐ সময় বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ যে সময়ের পটভূমিতে 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি রচনা করেন (উনিশ শতকের শেষার্ধের পটভূমিতে) তখনও শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অংশীদারত্ব লাভের ঘটনা কিছু কিছু পরিলক্ষিত হলেও তাতে পুঁজি বিনিয়োগের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি হয় নি। সমকালীন বঙ্গদেশের উঠতি পুঁজিপতিদের শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও ঐ একই অচল অবস্থা বিরাজমান ছিল। ইংরেজদের খুশি করে শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স, পারমিট প্রভৃতি পাওয়ার জন্য নানান ফন্দি-ফিকিরে অনেকেই তখন তাদের দরজায় দরজায় ধর্ণা দিচ্ছে, তাদেরকে খুশি করার জন্য পার্টি দিচ্ছে—এ ধরনের নির্লজ্জ-স্তাবকতার চিত্র আমরা শিল্পপতি মধুসূদনের ইংরেজ-তোষণের কিছু কিছু ঘটনার মধ্যে লক্ষ্য করেছি।

ঐতিহাসিক প্রবাহের নিয়মে উনবিংশ শতকের শেষার্ধে একদিকে বিকৃত নতুন পুঁজিবাদী সমাজের জন্ম (অনেক আগে থেকেই যার সূত্রপাত) এবং অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভাঙ্গন—খুব কাছের থেকে রবীন্দ্রনাথ দুই সমাজ জীবনের ভাঙ্গা-গড়ার ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভাঙ্গনকে সহ্য করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না কতকটা শ্রেণীস্বার্থের কারণেই। উঠতি পুঁজিবাদী সমাজকে রবীন্দ্রনাথ যে সহজ মনোভাব নিয়ে স্বাগত জানাতে পারেন নি সেকথা 'যোগাযোগ' উপন্যাস ছাড়া তাঁর আরো অনেক লেখা থেকেই বেশ স্পষ্ট হয়। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যে ঘটনাধারার বাস্তবতার কারণেই মধুসূদনের তুলনায় বিপ্রদাস ও কুমুকে মহিমান্বিত করেন নি এবং এ-ব্যাপারে তিনি যে কতকটা তাঁর শ্রেণীগত অবস্থানের কারণেই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে বিপ্রদাস ও কুমুকে উপরে

উঠিয়েছেন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। উঠতি পুঁজিবাদের বিকৃত দিকগুলি রবীন্দ্রনাথের সামন্ততান্ত্রিক জীবনের কিছু কিছু আদর্শায়িত চিন্তা চেতনার মর্মমূলে আঘাত হেনেছে। কোন্ দিক থেকে এবং কতোখানি সেই আঘাত হেনেছে তার স্বরূপ জানতে হলে মধুসূদনের স্বভাব ও চরিত্রকে জানতে হবে। মধুসূদন হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট তেমনি একটি চরিত্র যার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক উনিশ শতকের উঠতি পুঁজিবাদী সমাজের বিকৃতিপূর্ণ অভ্যুদয়কে নানাভাবে আক্রমণের সুযোগ করে নিয়েছেন।

মধুসূদনের চরিত্র বিশ্লেষণের পূর্বে তার শ্রেণীগত অবস্থানের ব্যাপারটা ঐতিহাসিক ধারার দৃষ্টিকোণ থেকে সংক্ষেপে যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে। বৃটিশ পুঁজিবাদই নিজেদের স্বার্থে ভারতবর্ষের সামন্তবাদী সমাজের ভাঙ্গনকে ত্বরান্বিত করে এং তার পুরো ফায়দা নির্লজ্জভাবে তারাই লুটতে থাকে। বিদেশী পুঁজিবাদের দাপটে এতদ্দেশীয় ক্ষুদ্র উৎপাদকদের মধ্যে পুঁজি সঞ্চারের বা তা সম্প্রসারণের পথ রুদ্ধ হয়। ফলে দেশের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র উৎপাদকদের দ্বারা ঐতিহাসিক নিয়মে বুর্জোয়া শ্রেণী গড়ে ওঠার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়। স্মর্তব্য যে এতদ্দেশীয় ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত শ্রেণী থেকেই একটি শ্রেণীর জন্ম হতে থাকে— এর নাম মুৎসুদ্দি শ্রেণী। কোম্পানী আমলেই এই শ্রেণীর জন্ম হয়। অর্থবান বাঙালিরা বিদেশী ফার্মকে টাকা ঋণ দিতেন। তারা ফার্মের দেওয়ান, সদর-মেট বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি প্রভৃতি হলেই নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করতেন। "বেনিয়ানরা ছিলেন ফার্মের ইন্টারপ্রেটার, প্রধান হিসাব রক্ষক, প্রধান সম্পাদক, প্রধান দালাল, মহাজন, অর্থরক্ষক এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিশ্বাস ভাজন কর্মচারী... ইংরেজ প্রভুত্ব এদেশে কায়েম হবার পর থেকে প্রধান হিন্দু পরিবারের লোকেরা এই চাকুরী পাবার জন্য উৎসুক থাকতেন"[১]। দাস মনোভাবসম্পন্ন এক শ্রেণীর মানুষ যার মধ্যে অভিজাত শ্রেণীর একটা অংশও গা ভাসিয়ে দিয়েছিল, তাদের নিয়ে কোম্পানী সরকার এইভাবেই এদেশে এক দাস সমাজ তৈরী করেছিল। বিদেশী প্রভুর পা চেটে নিজেদের স্বার্থ আদায় করাই ছিল এই দাস সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষগুলোর একমাত্র কাজ এবং "সমগ্র জাতির চোখে সমাজের মুষ্টিমেয় এই অংশ (অভিজাত অংশ) ছিল বিদেশী শাসনের আশ্রিত জাতির দুশমন।"[২] মুষ্টিমেয় অভিজাত ছাড়াও ক্রমে ক্রমে ঐতিহাসিক ধারার নিয়মে সমাজের অনভিজাত অংশ থেকেও অনেক দালাল, টাউট, ফড়িয়া প্রভৃতি কোম্পানীর দাসত্ব করে নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলেছিল। সব মিলিয়ে ঐ শ্রেণীটিকে মুৎসুদ্দি শ্রেণী (Comprador) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ঐতিহাসিক কালের বিবর্তনে মুৎসুদ্দিরা এক পর্যায়ে গিয়ে বুর্জোয়ায় রূপান্তরিত হতে থাকে। অর্থবান মুৎসুদ্দির কেউ কেউ তোষণ ও তদবিরের মাধ্যমে ১৮৫০ সালের পর থেকে খুব সীমিতভাবে হলেও শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ লাভ

---

১. নরহরি কবিরাজ- স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা, পৃষ্ঠা ৩৪
২. ঐ ঐ পৃষ্ঠা ৩৫

উঠিয়েছেন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। উঠতি পুঁজিবাদের বিকৃত দিকগুলি রবীন্দ্রনাথের সামন্ততান্ত্রিক জীবনের কিছু কিছু আদর্শায়িত চিন্তা চেতনার মর্মমূলে আঘাত হেনেছে। কোন্ দিক থেকে এবং কতোখানি সেই আঘাত হেনেছে তার স্বরূপ জানতে হলে মধুসূদনের স্বভাব ও চরিত্রকে জানতে হবে। মধুসূদন হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট তেমনি একটি চরিত্র যার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক উনিশ শতকের উঠতি পুঁজিবাদী সমাজের বিকৃতিপূর্ণ অভ্যুদয়কে নানাভাবে আক্রমণের সুযোগ করে নিয়েছেন।

মধুসূদনের চরিত্র বিশ্লেষণের পূর্বে তার শ্রেণীগত অবস্থানের ব্যাপারটা ঐতিহাসিক ধারার দৃষ্টিকোণ থেকে সংক্ষেপে যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে। বৃটিশ পুঁজিবাদই নিজেদের স্বার্থে ভারতবর্ষের সামন্তবাদী সমাজের ভাঙ্গনকে ত্বরান্বিত করে এং তার পুরো ফায়দা নির্লজ্জভাবে তারাই লুটতে থাকে। বিদেশী পুঁজিবাদের দাপটে এতদ্দেশীয় ক্ষুদ্র উৎপাদকদের মধ্যে পুঁজি সঞ্চারের বা তা সম্প্রসারণের পথ রুদ্ধ হয়। ফলে দেশের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র উৎপাদকদের দ্বারা ঐতিহাসিক নিয়মে বুর্জোয়া শ্রেণী গড়ে ওঠার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়। স্মর্তব্য যে এতদ্দেশীয় ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত শ্রেণী থেকেই একটি শ্রেণীর জন্ম হতে থাকে— এর নাম মুৎসুদ্দি শ্রেণী। কোম্পানী আমলেই এই শ্রেণীর জন্ম হয়। অর্থবান বাঙালিরা বিদেশী ফার্মকে টাকা ঋণ দিতেন। তারা ফার্মের দেওয়ান, সদর-মেট বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি প্রভৃতি হলেই নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করতেন। "বেনিয়ানরা ছিলেন ফার্মের ইন্টারপ্রেটার, প্রধান হিসাব রক্ষক, প্রধান সম্পাদক, প্রধান দালাল, মহাজন, অর্থরক্ষক এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিশ্বাস ভাজন কর্মচারী... ইংরেজ প্রভুত্ব এদেশে কায়েম হবার পর থেকে প্রধান হিন্দু পরিবারের লোকেরা এই চাকুরী পাবার জন্য উৎসুক থাকতেন"[১]। দাস মনোভাবসম্পন্ন এক শ্রেণীর মানুষ যার মধ্যে অভিজাত শ্রেণীর একটা অংশও গা ভাসিয়ে দিয়েছিল, তাদের নিয়ে কোম্পানী সরকার এইভাবেই এদেশে এক দাস সমাজ তৈরী করেছিল। বিদেশী প্রভুর পা চেটে নিজেদের স্বার্থ আদায় করাই ছিল এই দাস সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষগুলোর একমাত্র কাজ এবং "সমগ্র জাতির চোখে সমাজের মুষ্টিমেয় এই অংশ (অভিজাত অংশ) ছিল বিদেশী শাসনের আশ্রিত জাতির দুশমন।"[২] মুষ্টিমেয় অভিজাত ছাড়াও ক্রমে ক্রমে ঐতিহাসিক ধারার নিয়মে সমাজের অনভিজাত অংশ থেকেও অনেক দালাল, টাউট, ফড়িয়া প্রভৃতি কোম্পানীর দাসত্ব করে নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলেছিল। সব মিলিয়ে ঐ শ্রেণীটিকে মুৎসুদ্দি শ্রেণী (Comprador) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ঐতিহাসিক কালের বিবর্তনে মুৎসুদ্দিরা এক পর্যায়ে গিয়ে বুর্জোয়ায় রূপান্তরিত হতে থাকে। অর্থবান মুৎসুদ্দির কেউ কেউ তোষণ ও তদবিরের মাধ্যমে ১৮৫০ সালের পর থেকে খুব সীমিতভাবে হলেও শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ লাভ

---

১. নরহরি কবিরাজ- স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা, পৃষ্ঠা ৩৪
২. ঐ ঐ পৃষ্ঠা ৩৫

করতে থাকে। বিত্তের দিক থেকে সমৃদ্ধ ঐ দক্ষিণপন্থী অংশটিকে অর্থাৎ ইংরেজের পদলেহী ঐ শ্রেণীটিকে বৃটিশ সরকার কিছুটা নিজেদের স্বার্থের গরজেই শিল্পের ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করে। এইভাবে ভারতীয় পুঁজিবাদের বিকাশের ধারার মধ্য দিয়ে কতকগুলি নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটে। সমালোচকের বক্তব্য অনুযায়ী তার স্বরূপ ছিল এইরূপ ঃ "১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের আগে ভারতীয় পুঁজিতন্ত্র তার শৈশব অবস্থা অতিক্রম করতে পারে নি। কিন্তু তবুও উপরোক্ত তিনটি শক্তির আবির্ভাব (১. ভারতীয় শিল্পপতি (বুর্জোয়া) শ্রেণী, ২. শ্রমিক শ্রেণী, ৩. ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত (যারা ছিল নবোদ্ভূত পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্গত) ভারতের সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে দিল। ... তাছাড়া ১৮১৩ থেকে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে যে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল তাঁরাও অনেকে ব্যবসাতে টাকা নিয়োগ করলেন। এই বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ সরকারী চাকুরী ও বিলাতী সওদাগরদের দালালি করে অনেক টাকা জমাতে পেরেছিলেন।...এত দিন ইংরেজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা সংখ্যায় ছিল মুষ্টিমেয় এবং তারা অধিকাংশ হয় সওদাগরী অফিসের দালালি, নয় সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমশ একটি স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হল।"[১] মধুসূদন সদ্যোদ্ভূত এই ধরনের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারেরই সন্তান। কাল বিচারে তার আবির্ভাব উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই ঘটেছে বলে ধরা যায়। উপন্যাসে তার মধ্যে যে ধরনের আচরণ ও স্বভাব লক্ষ্য করা যায় তাতে বলা যায় তার মানসলোকে দুই ধরনের ভাবধারা বিদ্যমান ছিল। সে নিম্ন মধ্যবিত্ত মানসিকতার সঙ্গে টাউট, ফড়িয়া, দালাল ও বেনিয়ানদের মানসিকতাকে চমৎকার কৌশলে লালন করতো এবং নিজস্ব স্বার্থের গরজেই আবার সে কখনো কখনো ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা-চেতনাকেও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে লালন করতো। একথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে মুৎসুদ্দিদের উদ্ভব ক্ষয়িষ্ণুসামন্ত শ্রেণী থেকেই ঘটেছিলো এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সঙ্গে তারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার কারণে কিংবা তারা ঐ শক্তির পদলেহী শ্রেণীতে পরিণত হওয়ার কারণে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কোন ক্ষমতাই তাদের মধ্যে ছিল না। কালের বিবর্তনে উনবিংশ শতকের শেষ পর্যায়ে মুৎসুদ্দি শ্রেণী থেকেই মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম হয়—এই শ্রেণী উৎপাদন সম্পর্কের দিক থেকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর ভূমিকা পালন করার উত্তরোত্তর সুযোগ লাভে এমনই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে নির্লজ্জ-শোষণের অবাধ সুযোগ হারাবার ভয়ে এরা সর্বদাই ইংরেজ সরকারের সঙ্গে আপোসের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতো। তবে একথা সত্য যে বৃটিশ পুঁজিবাদের আওতায় ভারতীয়রা শিল্পের ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করতে গিয়ে এক পর্যায়ে তাদের স্বার্থে এতই আঘাত লাগে যে বৃটিশ

---

১. নরহরি কবিরাজ- স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা, পৃষ্ঠা ১২৭-২৮

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে প্রবল দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে তারা বাধ্য হয় এবং শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার কারণেই ভারতীয় শিল্পপতি বুর্জোয়ারা (কিছু কিছু জমিদারও) শাসন ক্ষমতায় অংশ গ্রহণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ডাক দেয়। কিন্তু দেশের বিশাল কৃষক ও শ্রমিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে না ওঠার কারণে ঐ দ্বন্দ্ব বৈপ্লবিক সংগ্রামের রূপ নিতে ব্যর্থ হয়। বলাই বাহুল্য যে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা যায় প্রধানত বিংশ শতকের প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে। শিল্পপতি বুর্জোয়া ও বড় বড় জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারটাই সেখানে মুখ্য ছিল—বৈপ্লবিক সংগ্রামের মাধ্যমে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনের বিষয়টি ছিল গৌণ। সেই কারণেই দেখা যায় আপোসের মাধ্যমে কিছুটা স্বার্থ সংরক্ষিত হলেই ঐ দ্বন্দ্বের অবসান হতো। মূলত শিল্পপতি বুর্জোয়াদের স্বার্থে গঠিত ভারতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা আগাগোড়ো লক্ষ্য করলেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে তাদের পৌনঃপুনিক দর কষাকষির নেপথ্য-উদ্দেশ্য সহজেই উদ্ঘাটিত হয়। তবুও একথা স্মর্তব্য যে বিংশ শতকের প্রথম পর্যায়ের মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ধীরে ধীরে জাতীয় গণতান্ত্রিক চেতনার যে-উন্মেষ ঘটে এবং অন্যের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার আদায়ের ব্যাপারে যে-সহনশীল ও প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, ঐতিহাসিক কারণেই উনিশ শতকের শেষার্ধের মুৎসুদ্দি শ্রেণীর চিন্তা-চেতনার মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য লক্ষণই ছিল না। রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অবশেষে একজন বিরাট শিল্পপতি হিসেবে দাঁড় করালেও তার স্বভাব চরিত্রে তিনি টাউট-ফড়িয়া-দালাল, এক কথায় মুৎসুদ্দি শ্রেণীর কদর্য কিছু কিছু মানসিকতার পরিচয়কে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন। উপন্যাসের ঘটনাধারা অনুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করলে একথা স্পষ্ট হয় যে, শিল্পপতি হবার মধ্য দিয়ে বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীকে মধুসূদন স্পর্শ করলেও তার সত্তায় মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণীর জাতীয় গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ আদৌ যেমন ঘটেনি, তেমনি অন্যের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সহনশীল ও প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার বিকাশও তার মধ্যে ছিল সুদূরপরাহত। সেই কারণেই দেখা যায় মধুসূদন তার জীবনের সর্বক্ষেত্রে (সবচেয়ে বেশী তার পারিবারিক জীবনে) 'অবিচলিত আত্ম কর্তৃত্ব'কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যতোদূর নীচে নামা তার পক্ষে সম্ভব ততদূর নীচে নেমেছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে কুমু ও বিপ্রদাসের সঙ্গে মধুসূদনের সংঘাতকে সেই কারণে শ্রেণী সংঘাতই বলা যায় এবং একথা স্মর্তব্য যে এই আত্মকর্তৃত্ব লাভের ব্যাপারটা কোন ব্যক্তি-মধুসূদনের ব্যাপার নয়—এটি শ্রেণী-মধুসূদনের ব্যাপার। আর মধুসূদনের সেই শ্রেণীটি স্বভাব ও চরিত্রের দিক থেকে ছিল পুরোপুরি মুৎসুদ্দি শ্রেণী। বৃটিশ সরকারের পদলেহী শ্রেণী হিসেবেই এর আত্মপ্রকাশ এবং ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে এর বিকাশ সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিলনা বলেই নানা ধরনের বিকৃতি ও অস্বাভাবিক আচরণ এই শ্রেণীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য—মধুসূদন সেই শ্রেণীরই প্রতিনিধিত্বশীল একটি চরিত্র।

দুই

মধুসূদন মূলত সামন্তশ্রেণী থেকে উদ্ভূত একটি চরিত্র, যদিও তার ক্রমবিকাশ ও বিবর্ধন ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক ও মুৎসুদ্দি শ্রেণীতেই ঘটেছে। ঘোষাল পরিবারে তার জন্ম। এককালে সামন্ততান্ত্রিক ঐ পরিবারের প্রতিপত্তি ও মান-মর্যাদা যথেষ্ট ছিল। সামন্ত শ্রেণীর ক্ষমতাদর্পী চাটুজ্যে পরিবারের সঙ্গে ছিল ঘোষাল পরিবারের বিত্তকেন্দ্রিক প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এক সময় ঘোষাল পরিবারের লোকেরা চাটুজ্যে পরিবারের কাছে দারুণ মার খেয়েছিল। মধুসূদন তার পূর্ব পুরুষের সে অপমানের জ্বালা কোনদিন ভোলেনি। ঘটনাচক্রে কয়েক পুরুষের ব্যবধানে ঘোষাল পরিবারের ধন-মান নিঃশেষিত হতে হতে এক পর্যায়ে মধুসূদনের বাবা আনন্দ ঘোষালকে রজবপুরের আড়তদারদের মুহুরিগিরি করতে দেখা গেল। চার ছেলের মধ্যে তিন ছেলে গোমস্তাগিরি করে কোনমতে পেট চালাচ্ছে, মধুসূদন লেখাপড়ায় ভালো হওয়ায় আনন্দ ঘোষালের প্রত্যাশা ছিল ছেলেটা গোটা কয়েক পাশ দিয়ে হয় স্কুল মাস্টার আর না হয় উকিল-মোক্তার হবে। মধুসূদন কলেজে ভর্তি হলো—উঠলো কলকাতার এক মেসে। কিন্তু আই.এ. পাশ দেবার আগেই হঠাৎ আনন্দ ঘোষালের মৃত্যু হলো। মধুসূদনের পড়ালেখা শিকেয় উঠলো। সংসারে শোচনীয় দারিদ্র্য দেখে মধুসূদন স্থির করলো সে ব্যবসা করবে। পুরনো বইগুলো বিক্রি করে কিছু মূলধন যোগাড় হলো। মায়ের আশা ছিল ছেলে কেরানী হয়ে তার মুখ উজ্জ্বল করবে। কিন্তু মধুসূদন তার সংকল্পে অটল।

কলেজ জীবনের বন্ধু কানাই গুপ্তের বিত্তবান বাবার বিশেষ কৃপা ও আনুকূল্যে মধুসূদন রজবপুরে কেরোসিনের এজেন্ট হিসেবে প্রথম ব্যবসার ক্ষেত্রে তার যাত্রা শুরু করলো—তারপর "সৌভাগ্যের দৌড় শুরু হল, সেই যাত্রা পথে কেরোসিনের ডিপো কোন্ প্রান্তে বিন্দু আকারে পিছিয়ে পড়ল। জমার ঘরে মোটা মোটা অংকের পা ফেলতে ফেলতে ব্যবসা হু-হু করে এগোল গলি থেকে সদর রাস্তায় খুচরো থেকে পাইকারীতে, দোকান থেকে অফিসে, উদযোগপর্ব থেকে স্বর্গারোহণে।" (পৃ. ১১) ছোট ছোট কারবার থেকে বড়ো বড়ো কারবার এবং তারপর এক পর্যায়ে বিরাট শিল্পপতি হিসেবে মধুসূদনের এহেন আত্মপ্রকাশকে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণীতে উত্তরণ বলা যায়। কিন্তু নিজের বিপুল কর্মোদ্যম ও দারুণ শ্রমের বিনিময়ে মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে সামান্য কেরোসিন তেলের এজেন্ট থেকে বিরাট শিল্পপতি হবার সৌভাগ্য মধুসূদন অর্জন করলেও তার মন-মানসিকতায় মুৎসুদ্দি শ্রেণীর ফড়িয়া-টাউট-দালাল প্রভৃতির স্বভাব প্রধানভাবে বিদ্যমান ছিল। শিল্পপতি হিসেবে মধুসূদন মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্গত হলেও তার মধ্যে তখনও কতকটা ঐতিহাসিক কারণেই জাতীয় গণতান্ত্রিক চরিত্র তৈরী হয়নি। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সবার অধিকারকে মর্যাদার সঙ্গে মেনে নেবার মতো সহনশীল ও প্রগতিশীল চেতনারও জন্ম হয়নি—তার সমগ্র সত্তায় ছিল আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অবিচল

কিন্তু সংকীর্ণ এক মনোভঙ্গি। পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদগ্র অভীপ্সা মূলত তার সামন্ততান্ত্রিক চেতনাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। অবশ্য তার ঐ একগুঁয়ে স্বভাবের সঙ্গে মুৎসুদ্দি শ্রেণীর স্থূল ও সংকীর্ণ মানসিকতা সংযুক্ত হবার কারণেই তার চরিত্র বেশী মাত্রায় বিকৃত ও অধঃপতিত হয়েছে। মধুসূদন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নানাভাবে কনসেশন লাভের মধ্য দিয়ে শিল্পপতি হয়েছে—সে ঐ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ না হয়ে শুধু নির্লজ্জ-তোষণের মাধ্যমে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সিদ্ধি অর্জনের জন্য মধুসূদন শুধু ইংরেজ-তোষণে পারঙ্গম ছিল না, সে তার ভাগ্য পরীক্ষার জন্য এবং ঐশ্বর্য অর্জনের ক্ষেত্রে দৈবের অমঙ্গলকর গ্রন্থি মোচনের জন্য কুম্ভকোনাম থেকে আগত বেংকট স্বামী নামক এক জ্যোতিষীর (নবীনের সাজানো জ্যোতিষী) গণনায় বিশ্বাস স্থাপন করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। বলাবাহুল্য যে এহেন বিশ্বাস সামন্তসমাজেরই বৈশিষ্ট্য। মধুসূদন বিশাল বিত্তের অধিকারী হবার অভিলাষে তার ব্যক্তিসত্তাকে বিসর্জন দিতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিল। ইংরেজ তোষণের ক্ষেত্রে সে তার ব্যক্তিত্বকে কিভাবে খর্ব করতো তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ স্বল্প কথায় 'যোগাযোগ' উপন্যাসের একস্থানে সুন্দরভাবে দিয়েছেন,—"এই মধুসূদনকে কুমু তার দাদা আর অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে ব্যবহার করতে দেখেছে, আজ তাকেই দেখলে বন্ধু মহলে। ভদ্রতায় অতি গদ্‌গদ ভাবে অবনম্র, আর হাসির আপ্যায়নে মুখ নিয়তই বিকশিত। চাঁদের যেমন এক পিঠে আলো আর এক পিঠে চির অন্ধকার, মধুসূদনের চরিত্রও তাই। ইংরেজ-এর অভিমুখে তার মাধুর্যপূর্ণ চাঁদের আলোর মতোই যেমন উজ্জ্বল তেমনি স্নিগ্ধ। অন্য দিকটা দুর্গম দুর্দৃশ্য এবং জমাট বরফের নিশ্চলতায় দুর্ভেদ্য"। (পৃঃ ৬৪-৬৫) ইংরেজদের অভিমুখে মধুসূদনের মাধুর্য পূর্ণ চাঁদের আলোর মতো উজ্জ্বল কেন থাকে এতক্ষণ সেকথা বলা হয়েছে। নির্লজ্জ ঐ স্তাবকতা ফড়িয়া কিংবা টাউট অর্থাৎ এক কথায় মুৎসুদ্দি চরিত্রেই শোভা পায়—মধুসূদন বিরাট শিল্পপতি হয়েও সেই বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে এসে উদার মানসিকতায় সমৃদ্ধ হতে পারেনি। উনিশ শতকের শেষার্ধে বিত্তবান কোন মুৎসুদ্দির কাছ থেকে সেটা প্রত্যাশা করাও কতকটা ঐতিহাসিক কারণেই অবাস্তব ছিল।

তিন

চাটুজ্যেদের দ্বারা ঘোষাল পরিবারের উপর এককালের অপমানের আঘাতকে কড়ায় গণ্ডায় পুষিয়ে নেবার দুরন্ত বাসনা থেকেই মধুসূদন কুমুকে বিয়ে করার অটল সিদ্ধান্ত নেয়। বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তাঁদের সুন্দরী মেয়েদেরকে মধুসূদনের হাতে তুলে দিতে পারলে ধন্য মনে করতেন। কিন্তু মধুসূদন তার সিদ্ধান্তে অবিচল—স্ত্রী হিসেবে সে

চাটুজ্যে পরিবারের মেয়েকেই ঘরে তুলবে, অন্য কাউকেই নয়। তার এই সিদ্ধান্তের মধ্যে একরোখা যে মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় তা সামন্ততান্ত্রিক সমাজেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য—মুৎসুদ্দি বা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া সমাজের বৈশিষ্ট্য নয়। বড়ো বাজারের তনসুকদাসের কাছে মোটা দেনার দায়ে বাঁধা ছিল বিপ্রদাস। অসময়ে সে টাকাটা চেয়ে বসলো। সহপাঠী বন্ধু অমূল্যধনের পরামর্শে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে সদ্য রাজা খেতাবপ্রাপ্ত মধুসূদনের উদারতায় সাত পার্সেন্ট সুদে এগারো লাখ টাকা ঋণ পেয়ে তনসুকদাসের টাকাগুলো পরিশোধ করে সে যাত্রায় বিপ্রদাস যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। প্রায়-প্রৌঢ় মধুসূদন সেই অধমর্ণ-বিপ্রদাসের কাছেই এক সময় তার উনিশ বছরের বোন কুমুকে বিয়ে করার জন্যে প্রস্তাব পাঠালো। বয়সের যথেষ্ট ব্যবধান সত্ত্বেও বিপ্রদাস কুমুর আগ্রহাতিশয্যের কারণে বিয়েতে মত দিতে বাধ্য হলো। বিয়েটা শেষ পর্যন্ত মধুসূদনেরই নিজস্ব পরিকল্পনা ও ইচ্ছা অনুযায়ী নূরনগরেই হবার ব্যবস্থা পাকা হলো। নূরনগরে তার পূর্ব পুরুষের ভিটে বাড়ি। মধুসূদনের কলকাতা থেকে সেখানে গিয়ে বিয়ে করার মনস্তাত্ত্বিক কারণ হচ্ছে তার পূর্ব পুরুষ যে বাড়িতে থাকা অবস্থায় একদা চাটুজ্যেদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছিল ঠিক সেখানেই বিয়ের উৎসবের মাধ্যমে মধুসূদন তার বিশাল বিত্তের জৌলুস সারা গ্রামবাসীসহ ক্ষয়িষ্ণু চাটুজ্যে পরিবারের সবাইকে দেখিয়ে তাক লাগাতে চায়। অঘ্রাণ মাসে বিয়ে কিন্তু আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহ থেকেই নূরনগরের পার্শ্ববর্তী শেয়াকুলিতে ঘোষাল-দিঘির ধারে মধুসূদনের ইঞ্জিনিয়ার, ওভারশিয়ার, টেকনিসিয়ান প্রভৃতিকে তাঁবু তৈরী করতে দেখা গেল। বিয়ের অনেক আগেই বর ও বরযাত্রীরা এখানে এসে বসবাস করবে, তাই ঐ সব তাঁবুর আয়োজন। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে মধুসূদন নূরনগরে অবস্থান করে বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে চাটুজ্যে পরিবারের সবাইকে এবং তাবৎ গ্রামবাসীকে তার বিশাল বিত্তের মাহিমা খুবই সুপরিকল্পিত কিন্তু স্থুল ভাঙ্গিতে দেখিয়ে ছাড়লো।

ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের মেয়ে কুমুর সঙ্গে মধুসূদনের বিয়ে ধনগরিমার ইতরতার মধ্যে দিয়ে এইভাবেই সম্পন্ন হলো। যাকে বিয়ে করে মধুসূদন কলকাতার মির্জাপুর স্ট্রীটের মধু প্রাসাদে উঠলো সেই কুমু দেখতে কেমন, তার মানসিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থাটা কেমন? প্রথমে তার মনের গঠন সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া যাক। চার বোনের বিয়ে বাবা মুকুন্দলাল নিজেই জমিদারীর শানশওকত অনুযায়ী দিতে পেরেছিলেন, কিন্তু কুমুর সময় থেকে জমিদারীতে ভাঙ্গন শুরু হয়। তাই বিয়েটা তিনি দিয়ে যেতে পারেননি। কুমুর বয়স বাড়তে বাড়তে এখন একেবারে উনিশে এসে ঠেকেছে। কিন্তু কুমু সুন্দরী এবং কুমু তার দাদার গৃহে বড়ই আদরের ধন। সৌন্দর্যের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "দেখতে সে সুন্দরী লম্বা ছিপ্ ছিপে, যেন রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড; চোখ বড় না হোক একেবারে নিবিড় কালো, আর নাকটি নিখুঁত রেখায় যেন পাপড়ি দিয়ে তৈরী। রঙ শাঁখের মতো চিকন গৌর; নিটোল দুখানি হাত; সে

সকরুণ ভাব।" (পৃ. ১৪-১৫) অন্যত্র– "এক রকমের সৌন্দর্য আছে, তাকে মনে হয় একটা দৈব আবির্ভাব পৃথিবীর সাধারণ ঘটনার চেয়ে অসাধারণ পরিমাণে বেশি–প্রতিক্ষণেই যেন সে প্রত্যাশার অতীত। কুমুর সৌন্দর্য সেই শ্রেণীর। ও যেন ভোরের শুকতারার মতো, রাত্রের জগৎ থেকে স্বতন্ত্র, প্রভাতে জগতের ওপারে।" (পৃ. ৬৮-৬৯) কুমুর অস্তিত্ব সম্পর্কে তার ভাইদের অনুভূতি "ও যে চাঁদের আলোর টুকরো, দৈন্যের অন্ধকারকে একা মধুর করে রেখেছে।" (পৃ. ১৫) এহেন সুন্দরী কুমুকে নব্য শিল্পপতি মধুসূদন বিয়ে করে এনেছে দেখে যুবক-অভ্যাগতদের মধ্য থেকে একজন বলে ওঠে–"দৈত্য স্বর্গ লুঠ করে এনেছে রে, অপ্সরী সোনার শিকলে বাঁধা"। আর একজনের মন্তব্য–"সাবেক কালে এমন মেয়ের জন্য রাজায় রাজায় লড়াই বেধে যেত, আজ তিসি চালানির টাকাতেই সিদ্ধি। কলি যুগের দেবতাগুলো বেরসিক। ভাগ্যচক্রের সব গ্রহনক্ষত্রই বৈশ্যবর্ণ।" কুমু শুধু রূপে অতুলনীয়া ছিল না, গুণেও ছিল তুলনাহীনা। তার কোন একাডেমিক শিক্ষা ছিল না। দাদার নিবিড় স্নেহচ্ছায়ায় একটু একটু করে এক এক বিষয়ের উপর দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছিল। দাদার কাছ থেকে সংস্কৃত ভাষা ভালোভাবে আয়ত্ত করে নিয়ে কালিদাসের মূল কাব্যগুলো পড়ে ফেলেছিল। ইংরেজী সাহিত্যের উপরও তার দখল হয়েছিল। এসরাজ বাজানো, গান গাওয়া, দাবা খেলা, বন্দুক চালানো—এমনকি ফটোগ্রাফী বিদ্যেও কুমু ভালভাবে শিখে নেয়। কুমু কতকটা প্রকৃতি কন্যাও বটে। মনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে প্রকৃতির বিশালতার মধ্যে সে মাঝে মাঝে ডুবে যেত। কখনো কখনো সুন্দরের স্বপ্ন ও অনুধ্যানে তার মন মগ্ন থাকতো। কুমু ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক জমিদার ঘরের মেয়ে কিন্তু তার ব্যক্তি-আচরণে পিতা কিংবা পিতামহদের মতো অহংকৃত স্পর্ধা বা দর্পিত কোন ভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় না। তার চলনে-বলনে ছিল চমৎকার পরিমার্জিত রুচি ও শুচিতার ছাপ—ব্যক্তিসত্তায় ছিল আকর্ষণীয় বিনম্র একটি ভঙ্গি যা সহজেই অন্যকে কাছে টেনে নেয়। কিন্তু এত সহজ-সুন্দর মেয়ের মধ্যেও ছিল ইস্পাত কঠিন আত্মমর্যাদাবোধ—একবার কেউ সেই আত্মমর্যাদায় আঘাত হানলে কুমু কাউকেই ক্ষমা করে না। এমনকি স্বামী মধুসূদনকেও নয়।

চার

নূরনগরের এহেন কুমুকে মধুসূদন যেন দৈত্য-মধুসূদন হয়ে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে এলো তার কলকাতার 'মধুপ্রাসাদ' নামক দৈত্য-পুরীতে। কিন্তু কুমু এ কোন্ লোকের ঘরে উঠলো? ভাইদের বোঝা হালকা করতে গিয়ে দেবতার ইঙ্গিতে কুমু কার গলায় মাল্যদান করলো? মধুসূদন বিরাট শিল্পপতি, বৃটিশ সরকার তাকে 'রাজা' উপাধি দিয়েছে। দেখতে খুব খারাপ নয়। কিন্তু তবুও রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে ওর স্বভাবের স্বরূপকে যেভাবে উদ্ঘাটন করেছেন তাতে শেষ পর্যন্ত পাঠক-পাঠিকা ঠিকই বুঝে নেয় কুমুর সঙ্গে তার চেহারা ও বয়স মোটেই মানানসই হয়নি। রবীন্দ্রনাথ

মধুসূদনের চেহারার বর্ণনা কিভাবে দিয়েছেন তা লক্ষ্য করা যাক। যেমন—"বেঁটে, মাথায় প্রায় কুমুদিনীর সমান। হাত দুটো রোমশ ও দেহের তুলনায় খাটো। সবসুদ্ধ মনে হয় মানুষটা একেবারে নিরেট; মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বদাই কী একটা প্রতিজ্ঞা যেন গুলি পাকিয়ে আছে। যেন ভাগ্যদেবতার কামান থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে একাগ্রভাবে চলেছে একটা একগুঁয়ে গোলা।" (পৃ. ৫৫) রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গাত্মক শব্দ ব্যবহারের ধরন লক্ষ্য করলে স্পষ্টই বোঝা যায় মধুসূদনের চিত্র বা চরিত্র তুলে ধরতে গিয়ে তিনি উনিশ শতকের শেষার্দ্ধের মুৎসুদ্দি শ্রেণীর 'নিরেট' ও 'মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বদাই কী একটা প্রতিজ্ঞা'-সর্বস্ব টিপিকাল ফড়িয়া-টাউটকেই উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। এহেন মতলববাজ ও হিসাবদক্ষ বেঁটে-খাটো স্বামীর সঙ্গে কুমুর প্রথম সংঘাত বাধলো হাওড়া স্টেশন থেকে ব্রুহাম গাড়ীতে করে মির্জাপুরের বাড়িতে যাবার পথে। নীলার আংটি কুমুর আঙ্গুলে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনের মেজাজ বিগড়ে যায়, কারণ এক সময় সে যখন নীলা ব্যবহার করতো তখন একবার তার পাট বোঝাই নৌকা হাওড়ার পুলে ধাক্কা খেয়ে ডুবে গিয়েছিল। তখন থেকে মধুসূদনের নীলার প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা ছিল, কিন্তু কুমু তার দাদাকে দাবায় হারিয়ে আংটিটা পারিতোষিক হিসেবে পেয়েছিলো অতএব সেও ওটা মধুসূদনের কাছে রাখার ব্যাপারে আপত্তি জানায়। আংটিটি অবশেষে মধুসূদনের রূঢ়তার কারণে বাধ্য হয়ে কুমু খুলে রাখে কিন্তু অন্য একটি আংটি পাবার আশ্বাস পাওয়া সত্ত্বেও সে মধুসূদনকে সেটি দেয় না। কর্তৃত্বের খর্বতায় মধুসূদনের মেজাজ সাংঘাতিকভাবে বিগড়ে যায়। কুমু গৃহ প্রবেশের আগেই মধুসূদনের উদ্ধত আচরণ দেখে ভাবলো সে কোন্ অশিষ্ট ও অমার্জিত রুচির মানুষের পাল্লায় পড়তে যাচ্ছে!

মধুসূদন কয়েকদিনের মধ্যেই কুমুর সঙ্গে তার অশালীন ও উদ্ধত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিলো যে সে তার অগাধ বিত্তের জোরেই কুমুকে তার সংসারে দাসী হিসেবেই এনেছে—কুমুর নিজস্ব কোন অধিকার ঐ গৃহে নেই। মধুসূদনের সংসারে কুমুরও যে স্বতন্ত্র অধিকার থাকতে পারে কিংবা কুমুও যে তার স্বাধীন সত্তা নিয়ে ঐ সংসারে তার অভিরুচি ও ইচ্ছা অনুযায়ী কোন কিছু করতে পারে, তারও যে ভালো লাগা, মন্দ লাগার একটা ব্যাপার আছে মধুসূদন গোড়া থেকেই সেটা সদম্ভ ঘোষণার দ্বারা নাকচ করে দিয়েছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের উপরে নিজের অবিচল কর্তৃত্ব জাহিরের মাধ্যমে মধুসূদন কুমুকে সচেতনভাবে পদে পদে অপমান করেছে এবং ঐ সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়েই (যেমন হাবলুকে কাঁচের কাগজচাপা, কিংবা রুমাল প্রদান করা ইত্যাদি) সে উচ্চকণ্ঠে কুমুর অধিকারের সীমানা নির্দেশ করে দিয়েছে। কাঁচের কাগজচাপাটা কুমু হাবলুকে উপহার হিসেবে দিয়ে তার মন জয় করার চেষ্টা করেছিলো কিন্তু মধুসূদন তুচ্ছ সেই ব্যাপারটাকে নিয়ে তুলকালাম বাধিয়ে দিয়ে কুমুকে অত্যন্ত কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলো, "একটি কথা মনে রেখো, আমার হুকুম ছাড়া জিনিসপত্র কাউকে দেওয়া চলবে না।...এ বাড়িতে তোমার স্বতন্ত্র জিনিস বলে কিছু নেই।" (পৃঃ ৯২-৯৩) নবীন

রসিকতাহাতের সেবা কমলার বরদান, কৃতজ্ঞ হয়ে গ্রহণ করতে হয়। সমস্ত মুখে একটি বেদনার

করে বলেছিল "এ বাড়িতে টিকটিকি মাছি ধরতে পারে না কর্তার (মধুসূদনের) হুকুম ছাড়া" (পৃ. ১০৪)–রসিকতার আড়ালে আসলে নবীন তার দাদার প্রকৃত স্বভাবের কথাটাই বলেছিল। স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারে স্বামীকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যে ধরনের 'কলানৈপুণ্য' আয়ত্ত করতে হয় মধুসূদনের স্বভাবে ও আচরণে তার কোন পরিচয়ই ছিল না। সে তার স্বভাবসুলভ স্থূল ভঙ্গিতে সংসারে নিজের অধিকারকে সবার উপরে প্রতিষ্ঠিত করে কুমুকে রাখতে চেয়েছে দাসীর মতো—অবশ্য নামেমাত্র বড়ো বৌ হিসেবে কুমুর একটি বাড়তি পরিচয় ছিল, কিন্তু তার অধিকারের সীমানা দাসীর চেয়ে বেশী কিছু নয়। তাই কুমু বিপ্রদাসের কাছে দুঃখ করে বলেছিল, "এখানে (মধুসূদনের গৃহে) সমস্তটাই অন্তরে অন্তরে আমার যেন অপমান"। (পৃ. ২২২) ক্রিস্টোফার কডওয়েল তাঁর 'স্টাডিজ ইন এ ডায়িং কালচার' নামক গ্রন্থের 'ভালোবাসা' নামক প্রবন্ধের একস্থানে বলেছেন, "পুরুষ প্রায়ই ভালোবাসাকে বুর্জোয়া সম্পত্তি-সম্পর্কের অনুরূপ একটা কিছু ব'লে, মানুষ ও সামগ্রীর মধ্যকার সম্পর্ক ব'লে এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নয় ব'লে মনে করে। স্ত্রী হল তার সারাজীবনের সম্পত্তি। তার সম্পত্তি-সংগ্রহকারী প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করার জন্য স্ত্রীকে সুন্দরী হতে হবে; পুরুষের সম্পত্তি পুরুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না বলে স্ত্রীকে হতে হবে বিশ্বস্ত কিন্তু পুরুষ মালিক, সে অবিশ্বস্ত হতে পারে; কারণ নিজের সম্পত্তিকে তেমন ব্যাহত না করে সে অন্যের সম্পত্তি অর্জন করতে পারে।" মধুসূদনও কুমুকে ঠিক তার সম্পত্তির মতোই ব্যবহার করতে চেয়েছে। তার ধারণা ছিল বাজারে দরদাম করে টাকার বিনিময়ে পাঁচটা পণ্য-সামগ্রী যেমন কেনা যায় স্ত্রীও তেমনি এক ধরনের পণ্য। মেয়েরা যে পণ্য সামগ্রীর মতোই রবীন্দ্রনাথও তা উপলব্ধি করেছেন মর্মে মর্মে। কুমুর অনুভূতির মধ্য দিয়ে সেই কথাটিকে প্রকাশ করেছেন এভাবে–"তোমার ভক্তকে (কুমু ঠাকুরের উদ্দেশে মনে মনে বললো) নিজে না গ্রহণ করে তাকে বিক্রি করে দিলে কোন্ দাসীর হাটে–যে হাটে, মাছ মাংসের দরে মেয়ে বিক্রি হয়, সেখানে নির্মাল্য নেবার জন্য কেউ শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজার অপেক্ষা করে না, ছাগলকে দিয়ে ফুলের বন মুড়িয়ে খাইয়ে দেয়।" (পৃ. ১৫২) সুতরাং সেই বস্তুটির সঙ্গে হৃদয়ের প্রকৃত ভালোবাসার কোন সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না। মুৎসুদ্দি বা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণীতে ভালোবাসা ইলিউশন ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মধ্যে অবস্থান করার কারণে তার মনে কোমল অনুভূতির অবশেষ কিছুটা ছিল এবং সেই কারণে প্রকৃত ভালোবাসা তার কাছে ইলিউশন নয়।[১]

---

১. ভালোবাসার উপর বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্ক যেসব অন্যায় ও প্রবঞ্চনা করেছে ভালোবাসা তার এক ভয়াবহ অভিযোগ লিপি তৈরী করতে পারে। জগতের দুঃখকষ্ট অর্থনৈতিক, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সেটা নগদভিত্তিক। সেটা হল এক বুর্জোয়া ভ্রান্তি। সেগুলি যেহেতু অর্থনৈতিক, ঠিক সেই কারণেই সামাজিক

এক বুক ভালোবাসা স্বামীকে উজাড় করে দেবার প্রত্যাশা নিয়ে কুমু মধুসূদনের সংসারে এসেছিল কিন্তু পণ্য-যাচাইয়ে-অভিজ্ঞ ও হিসেবে-দক্ষ মধুসূদনের হৃদয়ে প্রকৃত কোন ভালোবাসা না থাকার কারণে কুমুর নৈবেদ্যের সব আয়োজন বিফলে গেল। মোতির মা কুমুকে যখন প্রশ্ন করছিল, "তুমি কি বড়ো ঠাকুরকে ভালোবাসতে পারবে না মনে কর?" তখন ঐ প্রশ্নের জবাবে কুমু বলেছিল, "পারতুম ভালোবাসতে। মনের মধ্যে এমন-কিছু এনেছিলুম যাতে সবই পছন্দ করে নেওয়া সহজ হত। গোড়াতেই সেইটাকে তোমার বড়ো ঠাকুর ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছেন। আজ সব জিনিস কড়া হয়ে আমাকে বাজছে। আমার শরীরের উপরকার নরম ছালটাকে কে যেন ঘষড়ে তুলে দিল, তাই চারিদিকে সবই আমাকে লাগছে, কেবলই লাগছে; যা-কিছু ছুঁই তাতেই চমকে উঠি, এর পরে কড়া পড়ে গেলে কোনো একদিন হয়তো সয়ে যাবে, কিন্তু জীবনে কোনোদিন আর আনন্দ পাব না তো।" (পৃ. ১৯৭) 'কুমুর শরীরের উপরকার নরম ছালটাকে', মধুসূদন তার সংসারে আধিপত্য ও কর্তৃত্ব রক্ষার ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই 'ঘষড়ে তুলে দিল'।

এছাড়া 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমুর সঙ্গে মধুসূদনের তীব্র সংঘাত বেধেছে কুমুর দাদা বিপ্রদাসকে কেন্দ্র করে। কুমু মধুপ্রাসাদে আসার পর থেকেই মধুসূদন বিভিন্ন ঘটনাধারার মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করেছে বিপ্রদাসই কুমুর চেতনালোকের অধীশ্বর হয়ে বিরাজ করেছে এবং কুমু সর্বক্ষণই তার দাদার কথা বলতে ও শুনতে অজ্ঞান। তার ধারণা হয়েছে কুমু তার দাদার পরামর্শ ছাড়া যেন এক পাও চলতে চায় না। মধুসূদনের কাছে বিপ্রদাসের প্রতি কুমুর ভক্তির এই আতিশয্যের অর্থই হচ্ছে তার অবিচল আত্মকর্তৃত্বকে সচেতনভাবে উপেক্ষা করা। কুমুর মনোজগতে সার্বক্ষণিকভাবে বিপ্রদাসের অস্তিত্বের

মানুষের কোমলতম ও সর্বাধিক মূল্যবান অনুভূতির সঙ্গে সেগুলি জড়িত। বুর্জোয়া সম্পর্ক তাকে যে সমস্ত সমৃদ্ধ আবেগগত সামর্থ্য থেকে এবং সামাজিক কোমলানুভূতি থেকে বঞ্চিত করেছে সেগুলির পরিতৃপ্তির জন্য মানুষ বৃথাই ধর্ম, ঘৃণা, দেশ প্রেম, ফ্যাসিবাদ এবং চলচ্চিত্র ও উপন্যাসের ভাবালুতার দিকে ছুটে যায়। যে ভালোবাসার অভিজ্ঞতা জীবনে সে লাভ করে না, সেই ভালোবাসাকেই এগুলি কল্পনায় চিত্রিত করে।...এই কারণের জন্যই জীবন তার কাছে শূন্য, বিবর্ণ ও আকর্ষণহীন। পুরুষ তাকে আনন্দ দেয় না, নারীও না।

এইভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের যাবতীয় কোমল সম্পর্কগুলিকে পণ্যের সঙ্গে সম্পর্কে রূপান্তরিত করে বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্ক তার নিজেরই ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করে। সামন্ত প্রভুকে তার প্রজার সঙ্গে, প্রধানকে উপজাতির সঙ্গে, দাস প্রভুকে গৃহদাসের সঙ্গে, পিতাকে সন্তানের সঙ্গে যে সূত্রগুলি বেঁধে রাখে সেগুলি কোমল বলেই দৃঢ়। কিন্তু যে সূত্রগুলি শেয়ার মালিককে মজুরি- ভিত্তিক কর্মচারীর সঙ্গে, পৌর কর্মচারীকে করদাতার সঙ্গে এবং সমস্ত ব্যক্তিকে নৈর্ব্যক্তিক বাজারের সঙ্গে বেঁধে রাখে, সেগুলি যেহেতু নিছক নগদ মূল্য মাত্র এবং কোমল সম্পর্করহিত, সেই কারণেই সেগুলি দৃঢ় নয়। উপজাতি প্রধানের আইনগুলি বোধগম্য। নরদেবতার হুকুম নামাও একটা ব্যক্তিগত ও স্নেহসিক্ত আদেশ।...ভালোবাসা আর অর্থনৈতিক সম্পর্ক আজ যেন দুই বিপরীত মেরুতে গিয়ে জমা হয়েছে। এক মেরুতে জমা হয়েছে মানুষের সহজ প্রবৃত্তির যাবতীয় অব্যবহৃত কোমলতা, আর অপর মেরুতে জমা হয়েছে অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি, পণ্যের উপর অনাবৃত দমনমূলক অধিকারে যেগুলি পর্যবসিত।" (ক্রিস্টোফার কডওয়েল-স্টাডিজ ইন এ ডায়িং কালচার, অনুবাদ ঃ রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। (পৃঃ ১৫৬-৫৭)

ব্যাপারটা মধুসূদনকে কতোখানি উৎক্ষিপ্ত করেছিল তার পরিচয় উপন্যাসের একস্থানে পাওয়া যায়। হাবলুকে কুমু কাঁচের কাগজচাপা উপহার দেওয়ার কারণে মধুসূদন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে কুমুকে জানিয়ে দেয় তার হুকুম ছাড়া ভবিষ্যতে কুমু যেন কাউকে কিছু দান বা উপহার হিসেবে না দেয়। কুমু মধুসূদনের এহেন কথাবার্তা শুনে ঘৃণায় ক্ষোভে, দুঃখে সেই রাতে শোবার ঘর ছেড়ে বাতি রাখার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ঐরাতে মধুসূদন একা শোবার ঘরে থাকার সময় কুমুর ডেস্কের দেরাজ খুলে পুঁথিগাঁথা থলেতে বিপ্রদাসের টেলিগ্রামে ''ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন'—এই লেখা দেখতে পায়। দেখতে পায় একখানা ফটোগ্রাফ—তার মধ্যে বিপ্রদাস ও সুবোধের ছবি। এসব দেখার সঙ্গে সঙ্গে— ''ঈর্ষায় মধুসূদনের মন ক্ষত বিক্ষত হতে লাগল। দাঁতে দাঁত লাগিয়ে বিপ্রদাসকে মনে মনে লোপ করে দিলে। সেই লুপ্তির দিন একদা আসবে ও নিশ্চয় জানে—অল্প অল্প করে স্ক্রু আঁটতে হবে, কিন্তু কুমুদিনীর যে, উনিশটা বছর মধুসূদনের আয়ত্তের বাইরে, সেইটে বিপ্রদাসের হাত থেকে মুহূর্তেই ছিনিয়ে নিতে পারলে তবেই ও মনে শান্তি পায়। আর কোনো রাস্তা জানে না জবরদস্তি ছাড়া।" (পৃ. ৯৬) ঐ সময়ই মধুসূদন মনে মনে পরিকল্পনা আঁটে জবরদস্তির মাধ্যমে হলেও কুমুকে সে সন্তানের জননী হতে বাধ্য করবে এবং তখন কুমু অনেকখানি তার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এসে যাবে। স্মর্তব্য যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে মধুসূদন কুমুকে বিয়ে করে তার ঘরে আনে নি— মধুসূদন কুমুকে ঘরে এনেছে তার নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে। সেদিক থেকে মধুসূদনের কাছে কুমুর বিপ্রদাস-বন্দনার ব্যাপারটা অসহনীয় মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া মধুসূদন বিপ্রদাসকে আত্মীয় হিসেবে তেমন সম্মান দেয়নি কারণ সে বিপ্রদাসের উত্তমর্ণ—উত্তমর্ণের অহংকৃত-চেতনা তাকে সব সময় মনে মনে উচ্চাসনে বসিয়েছিলো। কুমু মধুসূদনের নিজস্ব সম্পত্তি অথচ সে তার অধমর্ণ-বিপ্রদাসকে সারাক্ষণ দেবতা জ্ঞানে পূজা করবে—কি ধৃষ্টতা কুমুর! বিপ্রদাসের প্রসঙ্গ নিয়ে কথা উঠলে মাঝে মাঝে মধুসূদনের মাথায় খুন চড়ে যেতো, তাই সে একদিন ক্রোধোন্মত্ত হয়ে গর্জন করে বলে ওঠে—"জেনে রেখো আমি তোমার সেই দাদার মহাজন, তাকে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারি।" পৃ.৮৭

পাঁচ

মধুসূদনকে কুমু মন দিতে পারে নি, কিন্তু নানা রকম ওজর আপত্তি সত্ত্বেও মধুসূদনের জবরদস্তির কারণেই দেহদান থেকে বিরত করতে পারেনি। ভালোবাসাহীন, শ্রদ্ধাহীন এ-মিলন কুমুর কাছে কাঙ্ক্ষিত মিলন ছিল না। মনের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি ব্যতিরেকে দেহের মিলন সার্থক ও সুন্দর হতে পারে না—কুমুর কোমল মনের লালিত এই সুন্দর ধারণাটিকে মধুসূদন জোরপূর্বক অস্বীকার করেই যে 'শরীরটার মধ্যে মন নেই সেই মাংসপিণ্ডকেই' মধুসূদন ভোগ করলো। মধুসূদন মনের প্রস্তুতি কাকে বলে জানে না, সে চায় কুমুকে তার

নিয়ন্ত্রণে আনতে—তাছাড়া তার সম্পত্তি থেকে নতুন আর এক সম্পত্তি সে সৃষ্টি করতে চায় অর্থাৎ তার প্রয়োজন বংশধর। মধুসূদন কুমুকে এক ধরনের ভালোবাসা দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে উঠতো কিন্তু কুমু তার মধ্যে প্রকৃত ভালোবাসার কোন পরিচয় খুঁজে পায়নি। সেই কারণেই মধুসূদন যখন অত্যুগ্রকামনায় অস্থির হয়ে কুমুকে ভালোবাসা নিবেদন করার জন্য এগিয়ে আসতো তখন তার বুক কেঁপে কেঁপে উঠতো। প্রৌঢ় বয়সের মধুসূদনের নারীদেহ সম্ভোগের কামনা যখন অত্যন্ত প্রবল হতো তখন কুমুর দিক থেকে দূরত্ব রচনার সযত্ন-প্রয়াস মধুসূদনকে উৎক্ষিপ্ত না করে পারে নি। পঁয়তাল্লিশ নম্বর পরিচ্ছেদে দেখা গেল কুমুর উপেক্ষাকে পুষিয়ে দেওয়ার জন্য বহু আগে থেকে মধুসূদনের জন্য ব্যবস্থা তৈরী হয়েই আছে— আর সে হচ্ছে শ্যামা, যে "সমস্ত জীবন মন নিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করে আছে।" কুমুকে তার দাদার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার (যতদিন মধুসূদন না ডাকবে) নির্দেশ যেদিন রাতে নবীনকে মধুসূদন দিলো তার পরেই খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে জ্যোৎস্নার আলোকে মোতির মা শ্যামার সঙ্গে মধুসূদনের নিবিড়ভাবে মিলনের দৃশ্য দেখতে পেলো। কডওয়েল বলেছেন–"পুরুষের সম্পত্তি পুরুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না বলে স্ত্রীকে হতে হবে বিশ্বস্ত; কিন্তু পুরুষ মালিক, সে অবিশ্বস্ত হতে পারে, কারণ নিজের বর্তমান সম্পত্তি ব্যাহত না করে সে অন্যের সম্পত্তি অর্জন করতে পারে।" স্ত্রীর কাছে অবিশ্বাসী হবার অধিকার মধুসূদনের আছে এবং অন্য স্ত্রীলোককে ভোগ করার অধিকারও তার আছে। বলাই বাহুল্য যে মধুসূদনের এহেন লাম্পট্যের জন্য অবাধ স্বীকৃতি তার সমাজই তাকে দিয়েছে। উল্লেখ্য যে বিপ্রদাসের বাবা মুকুন্দলালও বাইরে বাইরে অন্য নারীর সঙ্গে রাত কাটানোর ফলে নন্দরানী দিনের পর দিন অসম্মানিত ও অপমানিত হয়েছিলেন—বিপ্রদাস সেজন্য সমাজকে দায়ী করে বলেছিল, "সমাজকে সেজন্য ক্ষমা করতে পারব না, সমাজের ভালোবাসা নেই আছে কেবল বিধান" (পৃ. ২৪৯) (আশ্চর্য হলেও একথা সত্য যে কুমু তার বাবার চারিত্রিক স্খলনের কথা জেনেও এবং এ কারণে মা রাতের পর রাত দারুণভাবে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে জেনেও সে তার বাবার প্রতিই বেশী শ্রদ্ধাশীল ছিল)।

শ্যামার সঙ্গে মধুসূদনের অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের খবরটা বিপ্রদাস কালুর কাছ থেকে শোনার পর দারুণ ক্রোধে আর্তনাদ করে উঠলো কিন্তু শেষ পর্যায়ে দেখা গেল ঐ ক্রোধোন্মত্ত আর্তনাদ কতই না নিষ্ফল! ঘরে সুন্দুরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও এবং স্ত্রী বিশ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও মধুসূদন কেমন করে আপন গৃহে সবার সামনে এত বড়ো বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে শ্যামার সঙ্গে কদর্য সম্পর্ক স্থাপন করলো এবং গৃহের পরিবেশ ও সমাজ তা কেমন করে মেনে নিলো তা ভাবতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বিপ্রদাস মধুসূদনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য কৃতসংকল্প হলো। বিপ্রদাস খুব জোরের সঙ্গে কুমুর কাছে ঘোষণা দিল—"যে সমাজ নারীকে তার মূল্য দিতে বেশি ফাঁকি দিয়েছে তার সঙ্গে লড়াই।" (পৃ. ২৪৯) লড়াইয়ের জন্য যৌথ সম্মতিতে প্রথম কর্মসূচী নির্ধারিত হয়ে গেল—ঠিক হলো কুমু

লম্পট মধুসূদনের গৃহে আর কখনোই ফিরে যাবে না। বিপ্রদাস কুমুকে নিজের অধিকারে মাথা উঁচু করে তার গৃহে (বিপ্রদাসের) বাকী জীবন কাটিয়ে দেবার পরামর্শ দিলো—কুমু সানন্দে সে প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন মোতির মা কুমুকে নিয়ে যাবার জন্য এলো এবং কুমু যে দারুণ রকমের ভুল করছে সেটা নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলো। তার বক্তব্য এরূপ ঃ "মধুসূদন যত অযোগ্য হোক, যত অন্যায় করুক তবুও সে তো পুরুষ মানুষ; এক জায়গায় সে তার স্ত্রীর চেয়ে আপনিই বড়ো, সেখানে কোনো বিচার খাটে না। বিধাতার সাথে মামলা করে জিতবে কে ?" (পৃ.২৫২-৫৩) কিন্তু বিপ্রদাস ও কুমু মোতির মায়ের যুক্তিকে মেনে নিলো না। এর পর স্বয়ং মধুসূদন এলো কুমুকে নিতে। কিন্তু কুমু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মধুসূদনকে জানিয়ে দিলো সে আর তার গৃহে ফিরে যাবে না। মধুসূদন ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে ওঠে, "জান পুলিশ ডেকে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি ঘাড় ধরে। 'না' বললেই হল।" (পৃ. ২৭৫) মধুসূদনের গর্জনে দাদার ব্যাঘাত ঘটতে পারে এই বিবেচনায় মধুসূদনকে কুমু আস্তে কথা বলার জন্য অনুরোধ করে। তার প্রত্যুত্তরে মধুসূদন আরো বেশী গর্জন করে বলে "জান এই মুহূর্তেই ওকে পথে বার করতে পারি।" মধুসূদন বিপ্রদাসের গৃহ ত্যাগের আগে বলে গেল—'মনে থাকবে তোমার এই আস্পর্ধা। তোমার নূরনগরের নূর মুড়িয়ে দেব তবে আমার নাম মধুসূদন।" বিপ্রদাস পাশের ঘর থেকে মধুসূদনের সব কথাই শুনেছিল। এসব শোনার পর বিপ্রদাস বুঝলো কার বিরুদ্ধে সে লড়াই করতে চেয়েছিল ? কি তার ক্ষমতা ? আসলে ক্ষমতা তো এখন মধুসূদনদেরই হাতে, তারা কি না করতে পারে! তাই কুমুকে বিপ্রদাস বলতে বাধ্য হলো–"দেখ কুমু ওরা উৎপাত করবে। সমাজের জোরে, আইনের জোরে উৎপাত করার ক্ষমতা ওদের আছে।" (পৃ.২৭৮) অবশ্য বিপ্রদাস কুমুকে লোক সমাজের সামনে দাঁড়িয়ে সেটাকে ঋজুভঙ্গিতে অগ্রাহ্য করার কথা বলেছে, কিন্তু তা কি কোনভাবেই সম্ভব ? কোন্ সমাজের মাটিতে দাঁড়িয়ে মধুসূদন পুলিশ দিয়ে কুমুকে ঘাড় ধরে তার বাড়িতে নিতে চেয়েছে এবং কোন্ সাহসে মধুসূদন যে কোন মুহূর্তে বিপ্রদাসকে টেনে পথে বের করতে পারে বলে শাসিয়েছে তা সে খুব ভালো করেই জানে। এটা সেই সমাজ, যে সমাজ মধুসূদনের মতো লোকদের দ্বারাই তৈরী হয়েছে, এটা সেই আইন যা মধুসূদনদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই প্রণীত হয়েছে। ঐ সমাজের প্রশাসন যন্ত্র মধুসূদনদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, তাদের স্বার্থের কারণেই তা পরিবর্তিত হয়। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি বিপ্রদাসের হাতে কোন্ শক্তি আছে যা দিয়ে সে এহেন মধুসূদনের বিরুদ্ধে লড়াই করবে ? বিপ্রদাসের শক্তি ছিল শুধু তার মনের মধ্যে। সে তার বিবেক দ্বারা নারীর অসম্মানকে রোধ করে তাদেরকে স্বাতন্ত্র্যের মহিমায় উজ্জ্বল করে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু মধুসূদন স্ত্রীকে সম্পত্তি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে চায় না—নারীর স্বাতন্ত্র্য তার কাছে পুরুষকে অবজ্ঞা করার অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাই কুমুর স্বাতন্ত্র্য বা স্বকীয়তাকে সে সহ্য করতে পারে নি। স্বাতন্ত্র্যের মহিমায় উজ্জ্বল এই ধরনের নারীর প্রতি উপেক্ষাই সমাজের বাস্তব সত্য। আর

এই বিচারবুদ্ধির জন্যই সমাজ মধুসূদনকেই সমর্থন করবে, বিপ্রদাসকে নয়। পুলিশের সহায়তায় কুমুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের তেজকে মধুসূদন ম্লান করে দিয়ে তাকে মধুপ্রাসাদে নিয়ে যেতে পারতো কিন্তু সে ধরনের বলপ্রয়োগের আগেই এমন এক অভাবিত ঘটনার খবর পাওয়া গেল যাতে কুমুকে বাধ্য হয়েই শেষ পর্যন্ত বিপ্রদাসের পরামর্শে মধুগৃহে হাজির হতে হলো। সেটি কুমুর গর্ভবতী হবার ঘটনা। গর্ভ সঞ্চারের সংবাদ এক মুহূর্তে বিপ্রদাসের তেজকে যেমন হরণ করলো তেমনি কুমুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সমুজ্জ্বল দীপ্তিও এক ফুৎকারে যেন নিভে গেল। ভারতীয় সমাজে নারী যে কতো অসহায়, তাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মহিমা যে কতো ঠুনকো ব্যাপার তা মধুসূদনের মতো অমার্জিত, অশালীন, কর্কশ, দাম্ভিক, ইতর ও লম্পট মানুষও কতো অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝিয়ে ছাড়ালো! তাই কুমু যখন বিপ্রদাসকে জিজ্ঞাসা করলো এবার তাকে সত্যিই কি মধুসূদনের বাড়িতে যেতেই হবে, তখন জবাবে বিপ্রদাস নিতান্ত অসহায়ের মতো বলতে বাধ্য হলো–"তোকে নিষেধ করতে পারি এমন অধিকার আর আমার নেই। তোর সন্তানকে তার নিজের ঘরছাড়া করব কোন স্পর্ধায়?"

মধুসূদনের পয়সা-পুজার মধ্যে সীমাহীন যে লোভ ছিল, তার ভাষার মধ্যে যে কর্কশতা ছিল, তার দৈনন্দিন আচরণ ও ব্যবহারে যে উগ্রতা, অভব্যতা, ও অশোভনতার ছাপ ছিল– তা "প্রত্যহই কুমুর শরীর মনকে সংকুচিত করে তুলেছে", ইদানিং মধুসূদন দারুণ বেপরোয়াভাবে সবার জ্ঞাতসারেই শ্যামার সঙ্গে শুরু করেছে অবৈধ জীবন যাপন। এহেন ইতর লম্পটের ঔরসের দ্বারা তার গর্ভে সন্তান আসার কথা সে কোনদিন ভাবতেই পারে না। এর চেয়ে ঘৃণার ব্যাপার তার জীবনে আর কি হতে পারে! যে মানুষটাকে কুমু অন্তরে অন্তরে সব চেয়ে বেশী ঘৃণা করলো আজ সেই ঘৃণিত মানুষটার সন্তান তার পেটে এবং সেই লোকটার সন্তানের কারণেই তাকে তার প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও মধুপ্রাসাদে ফিরে যেতে হচ্ছে। বিপ্রদাস কুমুকে উপন্যাসের শেষ দিকে এক স্থানে বলেছিল, "আজ যেখানে তোর স্বাতন্ত্র্যকে কেউ বুঝবে না, সম্মান করবে না, সেখানে যে তোর নরক।" (পৃ. ২৭৮-৭৯) আসলে কুমুর মধুপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন তো এক যন্ত্রণাখিন্ন নারকীয় জীবনে প্রত্যাবর্তনেরই নামান্তর।

পুরুষ শাসিত সমাজের নিয়মের নিগড়ে কি সুকৌশলেই না মেয়েদের বন্দী রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। লোকাচার মধুসূদনের পক্ষে, সমাজের আইনও মধুসূদনের নিয়ন্ত্রণে–কুমু পালাবে কোথায়? কুমু মধুপ্রাসাদে ফিরে গিয়ে যদি শোনে শ্যামা ছাড়া আরো একাধিক নারীর সঙ্গে মধুসূদন দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে চলেছে, যদি শোনে তাদেরকে সে অন্য জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে এবং নিয়মিত সেইসব জায়গায় সে যাতায়াত করে, তাহলেও কি কুমুর পালাবার পথ ছিল? মধুপ্রাসাদে ফিরে যাবার আগে কুমু তার দাদাকে খুব জোরের সঙ্গেই বলেছিল, "কিন্তু একদিন ওদেরকে মুক্তি দেব; আমিও মুক্তি নেব; চলে আসবই এ তুমি দেখে নিয়ো। মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না। আমি

ওদের বড়োবউ তার কি কোন মানে আছে যদি আমি কুমু না হই" ? (পৃ. ২৮৮) উপন্যাসের উপান্তে কিংবা প্রারম্ভে (যেখানে অবিনাশের বত্রিশ বছরের জন্ম দিবস পালিত হতে দেখা যাচ্ছে) কুমুর মধুপ্রাসাদ থেকে পুনরায় চলে আসার কোন তথ্য নেই এবং কুমু তার পুত্রের জন্মদিনে উপস্থিত ছিল কিনা তাও বোঝা যায় না। সেখানে মধুসূদনকেও দেখানো হয়নি।

আসলে "মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে" কুমুকে বাধ্য করেছে মধুসূদন ও তার সমাজ। বলাই বহুল্য যে মধুসূদনের সমাজের ভিত্তিমূলেই রয়েছে অসততা, অসত্য ও কদর্য কারচুপির নানা কৌশলময় পংকিল-ইতিহাস—এ ইতিহাসের ধারক ও বাহক সে এবং তার শ্রেণী। মধুসূদন কুমুর স্বাতন্ত্র্য-দীপ্ত-সত্তাকে সহ্য করতে পারেনি—সে কুমুর মধ্য থেকেই নতুন করে সৃষ্ট বড়ো বউয়ের সেই সত্তাকে পেতে চেয়েছিলো যে-সত্তা মিথ্যে হয়ে শ্যামার সঙ্গে একই নরকে বসবাস করতে বাধ্য হয়। কুমু তার কুমুত্বকে বজায় রেখে মধুপ্রাসাদের বড়োবউ হতে চেয়েছিল কিন্তু মধুসূদন ও তার সমাজ কুমুকে কুমুত্বহীন বড়োবউ হবার অধিকারটুকুই দিয়েছে। স্বাতন্ত্র্যবর্জিত সেই পরিচয়ের মধ্যে কুমু নিজেকে খুঁজে পাবে না— এর চেয়ে ট্রাজেডী কুমুর জীবনে আর কি হতে পারে! প্রকাশ্য দিবালোকে আসা-সোটাসহ লোকজন পালকিতে করে সমারোহের সঙ্গে কুমুকে মির্জাপুরের প্রাসাদে উঠালো—সেখানে তখন নহবত বাজছে আর সাড়ম্বরে চলছে ব্রাহ্মণ বিদায়ের আয়োজন। কিন্তু নহবতের মধ্য দিয়ে তখন কোন্ ধরনের শব্দ শোনা যাচ্ছিল ? মধুসূদন তার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কুমুর নূরনগরীয় নূর মুড়াতে পেরেছে বলেই কি নহবতের মধ্য দিয়ে তার বিজয়োল্লাসের শব্দ ধ্বনিত হচ্ছিল ? রবীন্দ্রনাথ এ কোন্ কুমুকে এত মহাসমারোহে মির্জাপুরের প্রাসাদে পাঠালেন ?

ছয়

বাস্তবধর্মী উপন্যাসের মধ্যে একজন ঔপন্যাসিক যেমন নিরাসক্ত ও নিস্পৃহ ভঙ্গিতে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে Detached থেকে শুধু বাস্তব ঘটনাপ্রবাহের চাহিদা অনুসারে যেভাবে চরিত্রকে রূপদান করেন, রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেই পদ্ধতি অনুসারেই কি মধুসূদনকে উপস্থাপন করেছেন ? 'যোগাযোগ' উপন্যাস আদ্যন্ত পাঠ করে মধুসূদনকে আমরা যেভাবে পেয়েছি, বিশেষ করে বিপ্রদাস ও কুমুর পাশাপাশি যে মধুসূদনকে আমরা পেয়েছি তাতে একথা অস্বীকার করা যায় না যে মধুসূদনকে কতকটা হীনভাবে এবং বিপ্রদাস-কুমুকে বহুলাংশে মহিমান্বিতভাবে চিত্রিত করার একটা অভিলাষ রবীন্দ্রনাথ পূর্ব থেকেই পোষণ করে রেখেছিলেন। অভিলাষটিকে আড়ালে রাখতে পারলে ঐ তিনটি চরিত্রের বাস্তবতা রক্ষা করা অনেক সহজ হতো। উপন্যাসের চরিত্রসমূহের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণের পশ্চাতে চালিকা শক্তি হিসেবে ঔপন্যাসিকের ভূমিকা প্রধান হলেও ঔপন্যাসিককে এমনভাবে

CamScanner

চরিত্রসমূহের সঙ্গে আড়াল রচনা করতে হয় যাতে করে কোনভাবেই তাঁর প্রত্যক্ষ ছায়া কোন চরিত্রের উপরে না পড়ে। বাস্তব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের তরঙ্গতাড়নে চরিত্ররা এগিয়ে যাবে এবং তার মাধ্যমেই তাদের বিকাশ ঘটবে এটিই প্রত্যাশিত—কিন্তু তৎপরিবর্তে ঔপন্যাসিকের বিশেষ মতাদর্শের সক্রিয় প্রভাবে চরিত্র চিত্রিত হলে বাস্তববাদী উপন্যাস হিসেবে তা সার্থকতা হারায়। রবীন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন একজন জমিদার—জমিদার শ্রেণীর মানুষের প্রতি শ্রেণীগত কারণেই কিছুটা দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক ছিল। মুকুন্দলাল, বিপ্রদাস ও কুমুর চরিত্র অংকন করতে গিয়ে তিনি তাঁর ঐ দুর্বলতাকে কতোখানি প্রশ্রয় দিয়েছেন তা মধুসূদনের পাশাপাশি রেখে চরিত্রগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে সহজে বুঝা যায়। মুকুন্দলাল স্খলিত চরিত্রের মানুষ ছিলেন, তিনি মেয়ে মানুষ নিয়ে বজরায় রাত কাটাতেন—তবুও রবীন্দ্রনাথ ছোট্ট একটি ক্যানভাসের মধ্যে এই চরিত্রকে আঁকতে গিয়ে স্বল্প কয়েকটি কথার আঁচড়ে মুকুন্দলালের মহিমান্বিত দিকটিকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তাতে শ্রেণীগত দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতিত্বের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিপ্রদাসকে রবীন্দ্রনাথ অতিমানবের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন—জমিদার শ্রেণীতে বিপ্রদাসের মতো ভালো মানুষের ছড়াছড়ি ঐ সময় কি এতই বেশী ছিল? আর মধুসূদন, যে মানুষটি দারুণ উদ্যম আার অবিরাম কর্মের মধ্য দিয়ে দীন-হীন অবস্থা থেকে নিজের ভাগ্যকে উন্নীত করতে করতে এক পর্যায়ে শিল্পপতি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, সেই মানুষটির ব্যক্তিগত আচরণে, দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপে, বিশেষ করে স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারে যে-নীচতা ও সংকীর্ণতার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন তাকে কি পুরোপুরিভাবে বাস্তব সম্মত বলে মেনে নেওয়া যায়? উনিশ শতকের শেষার্ধে নবোদ্ভূত মুৎসুদ্দি শ্রেণীর মানুষ বিত্তলাভের জন্য যে কোন পর্যায়ে নামতে প্রস্তুত ছিল একথা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত হলেও রবীন্দ্রনাথ যে সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় ও সামগ্রীকে কেন্দ্র করে মধুসূদনের মনের নীচতা ও সংকীর্ণতাকে পরিমাপ করার সুযোগ করে দিয়েছেন তাতে বাস্তবতার ছাপ যতটা পাওয়া যায়, তার চেয়ে মুৎসুদ্দি শ্রেণীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিদ্বেষ ও ঘৃণার পরিচয় বেশী পাওয়া যায়। সামন্ততান্ত্রিক জমিদারদের মধ্যে কারণে-অকারণে অকাতর ব্যয়-বাহুল্যের যে প্রবণতা দেখা যেতো, তাদের দয়া-দাক্ষিণ্যের ও অকৃপণ দান ও উদার আতিথেয়তার মধ্যে যে ঔদার্য প্রকাশ পেতো—তার সমস্ত কিছুই রবীন্দ্রনাথের কাছে গৌরবময় ঐতিহ্য বলেই মনে হয়েছে। শুধু অর্থ ব্যয়ের বিরাট ঔদার্যে নয়, শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে জমিদারদের অবদানকেও রবীন্দ্রনাথ দারুণ শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। বিপ্রদাস ও কুমুর চিত্তলোকে গৌরবময় সেই ঐতিহ্যের ধারাকে লালন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাশীল সেই মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে অধিকাংশ জমিদারই যেখানে প্রজার দৃষ্টিতে ব্যাঘ্রের চেয়েও হিংস্র এবং প্রজা সাধারণের রক্ত শোষণ করেই যাঁরা অকৃপণ ব্যয় বাহুল্যে, দয়ায়, দানে, দাক্ষিণ্যে প্রজাদের কাছে নন্দিত হন, সেক্ষেত্রে তাঁদের চরিত্রকে মহিমান্বিত করার এমন নির্বারিত সুযোগ

কোথায় ? রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রমী দু-চারজন দয়ালু ও সংস্কৃতিবান জমিদারের উদাহরণ থেকে বিপ্রদাস-কুমুকে সৃষ্টি করেছেন—সেই কারণে ওদের মধ্যে বাস্তবাতার সমগ্রতায় শ্রেণীগত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়ে নি। ঠিক একইভাবে মধুসূদনকে অংকন করতে গিয়েও কোন কোন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়।

ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সমাজকে টিকিয়ে রাখা যে কোন মতেই আর সম্ভব নয় একথা মানতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়-মন দারুণভাবে বিষাদ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তবু উঠতি পুঁজিবাদী সমাজের প্রতি তাঁর ঘৃণা ও বিদ্বেষ যতই প্রবল হোক না কেন, ঐ সমাজের মানুষের মন, মানসিকতা ও রুচির দৈন্য তাঁকে যতই পীড়িত করুক না কেন—নবজাত ঐ সমাজের গতি যে অপ্রতিরোধ্য, রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত সেটা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই উপন্যাসটির মর্যাদা বহুলাংশে রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর মানস-কন্যা কুমুকে উঠতি পুঁজিবাদী সমাজের যূপকাষ্ঠের দিকে ঠেলে দিয়ে তার বলির ব্যবস্থা না করতেন তাহলে উপন্যাসের বাস্তবতা কি রক্ষিত হতো ? কুমু তো ইবসেনের নোরা নয় যে স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হলো না বলে বাড়ি থেকে চিরদিনের জন্য বেরিয়ে যাবে অনির্দেশ্যভাবে কিংবা সে গলসওয়ার্দির আইরিনও নয় যে স্বামী সোমস্ -এর সঙ্গে এ্যাড্জাস্ট করতে পারলো না বলে আর একজনকে বিয়ে করবে। কুমু বঙ্গদেশের মতো একটি দেশের সামন্ত সমাজের নানা সংস্কারের নিগড়ে আবদ্ধ এক হিন্দু নারী—স্বামী তাদের কাছে ইহকাল ও পরকালের দেবতা হিসেবে স্বীকৃত। স্বামী মদ্যাসক্ত, বেশ্যাসক্ত কিংবা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হলেও, এমনকি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামী বেশ্যালয় গমনে অভ্যস্ত হলেও (প্রয়োজনে সতী-সাধ্বী স্ত্রী স্বামীকে বেশ্যালয় গমনে সাহায্য করবে) স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে দেবতাজ্ঞানে ঐ ধরনের স্বামীকে দেহ-মন সমর্পণ করে পূজা করা। আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে কুমুর নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র পথ খোলা ছিল—ওর মধ্য দিয়েই তার সব জ্বালা, সব যন্ত্রণা জুড়িয়ে যেতো। কিন্তু তা তো হবার নয়—কারণ মধুসূদনের কাছে তার যন্ত্রণাভোগের পালা তো কেবল শুরু হলো। মধুসূদনের গায়ের জোরে সে সন্তানের মা হতে চলেছে, অতএব কুমুকে মধুগৃহে ফিরে যেতেই হয়। মধুগৃহে কুমুর এ-প্রত্যাবর্তন শুধু দুঃসহ যন্ত্রণার ব্যাপার নয়, তা চরম অপমানেরও ব্যাপার। সব জেনেই রবীন্দ্রনাথ বাধ্য হয়েই কুমুকে সেইদিকে ঠেলে দিয়েছেন। তাই বলা যায় নারকীয় জীবনের সীমাহীন অপমান ও অসম্মানের অতলান্ত গহ্বরে কুমুকে এভাবে নিক্ষেপ করে এবং তার পাশাপাশি মধুসূদনের বৈজয়িক সাফল্যকে স্বীকৃতি দিয়ে (সে সাফল্য যত হীন কৌশলেই অর্জিত হোক না কেন) রবীন্দ্রনাথ সমকালীন সমাজ জীবনের ঐতিহাসিক বাস্তবতাকেই মেনে নিয়েছেন।*

---

* রবীন্দ্রনাথ তাঁর যোগাযোগ উপন্যাসে মধুসূদন ও কুমুর চরিত্র অংকন করতে গিয়ে গলসওয়ার্দির 'The Forsyte Saga' নামক উপন্যাসের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন– কোন কোন সমালোচক এ কথা

বলেছেন। (দেবীপদ ভট্টাচার্যের 'উপন্যাসের কথা'ও সত্যব্রত দে'র 'রবীন্দ্র-উপন্যাস সমীক্ষা' নামক গ্রন্থদ্বয়ে এর উপর আলোচনা আছে)। তিন পুরুষের কাহিনী সংবলিত বিশাল উপন্যাসটি যথাক্রমে ১৯০৬,১৯২০ ও ১৯২১ সালে প্রকাশিত হয়। গলসওয়ার্দির ঐ উপন্যাসে সোম্‌স্‌-এর মধ্যে ছিল 'Possessive instinct এবং ওই Possessive instinct-এর কারণেই সোম্‌স্‌ তার সুন্দরী স্ত্রী আইরিনকে নিজস্ব সম্পত্তি ছাড়া অন্য কিছু মনে করেনি। কডওয়েল বলেছেন, "(বুর্জোয়া সমাজে বুর্জোয়ার কাছে) স্ত্রী হল তার সারা জীবনের সম্পত্তি।"। সোম্‌স্‌ তার স্ত্রী আইরিন -এর উপর কতোখানি অবিচল আত্মকর্তৃত্ব বিস্তার করতে চেয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় আইরিন-এর দ্বিতীয় স্বামী জোলিঅন-এর কথার মধ্য দিয়ে। জোলিঅন-এর উক্তি ঃ 'He (সোমস্‌) loved her in his own way. She was his property. That was the view he holds of life—of human feelings and hearts— property. মধুসূদনও কতকটা সোমস্‌-এর মতোই কুমুকে ভালোবেসেছিলো 'In his own way. এবং কুমুও মধুসূদনের কাছে ছিল property-র মতোই। এ ছাড়াও দেখা যায় 'ফরসাইট সাগা'তে সোমস্‌ আইরিনের সৌন্দর্যে মাঝে মাঝে অভিভূত হয়ে যেভাবে মুগ্ধতা ও বিস্ময় প্রকাশ করেছে, 'যোগাযোগ' উপন্যাসে মধুসূদন কুমুর সৌন্দর্য অবলোকন করে মাঝে মাঝে একইভাবে বিস্ময় প্রকাশ করেছে। যেমন একস্থানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যে মধুসূদনকে জীবনের সাধনায় কেবল প্রাণপণ লড়াই করতে হয়েছে, প্রতিদিন উদ্যত সংশয় নিয়ে নিরন্তর যাকে সতর্ক থাকতে হয়, তাঁর কাছেও কুমুর এই সর্বাঙ্গীণ সুপরিণতির অপূর্ব গাম্ভীর্য বিস্ময়ের বিষয়"। কিংবা অন্যত্র–"মধুসূদনের পক্ষে কুমু একটি নতুন আবিষ্কার। মধুসূদন তার অবচেতন মনে নিজের অগোচরে কুমুকে একরকম অস্পষ্টভাবে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বোধ করলে"। আইরিন সম্পর্কে সোম্‌স্‌-এর মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে গলসওয়ার্দি বলেছেন, 'An enigma to him from the day that he first saw her, he was enigma to him still". মধুসূদনের কাছে কুমুও ছিল- 'enigma'-র মতই। রবীন্দ্রনাথ কোথাও অবশ্য একথা স্বীকার করেননি যে তিনি 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কোন কোন চরিত্রের ভাব সম্পদকে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করতে গিয়ে পাশ্চাত্যের কোন কথাসাহিত্য, বিশেষ করে গলসওয়ার্দির 'ফরসাইট সাগা' নামক উপন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মধুসূদন ও কুমুর সঙ্গে গলসওয়ার্দির সোমস্‌ ও আইরিন-এর মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট এবং ঐ পার্থক্যের কারণেই রবীন্দ্রনাথের ঐ চরিত্রদ্বয় বিভিন্ন দিক থেকে সুচিহ্নিতভাবে স্বাতন্ত্র্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে মধুসূদনের মতো একটি চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের শেষার্ধের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত ও মুৎসুদ্দি শ্রেণীর এক রুচিহীন ধনাঢ্য ব্যক্তির সঙ্গে সমন্বিত করে যেভাবে তার বিকাশ ঘটিয়েছেন তাতে মধুসূদনকে সোম্‌স্‌-এর অনুকরণ মনে করা সমীচীন হবে না। কুমুর ভিন্নতর স্বাতন্ত্র্যকেও ঐ একই দৃষ্টিকোণ থেকে অস্বীকার করা যায় না। বলা সঙ্গত যে উভয় চরিত্রে 'ফরসাইট সাগা'র পূর্বোল্লিখিত চরিত্রদ্বয়ের মিলের চেয়ে গরমিল অনেক বেশী এবং হয়তো সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ গলসওয়ার্দির কাছ থেকে তাঁর ঋণের কথা স্বীকার করার যৌক্তিকতা খুঁজে পাননি। তৎসত্ত্বেও বলা যায় প্রভাবের কথা যখন পুরোপুরিভাবে এড়ানো যায় না তখন রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট করে উল্লেখ করা উচিত ছিল গলসওয়ার্দির ঐ উপন্যাস তাঁকে কতোখানি প্রভাবিত করেছিল কিংবা আদৌ কোন প্রভাব বিস্তার করেনি। ঋণ স্বীকার করলে রবীন্দ্রনাথের মাহাত্ম্য খর্বিত হতো না, বৃদ্ধি পেতো।

উত্তরাধিকার
এপ্রিল-জুন, ১৯৮৯

CamScanner

রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়'

ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসী নেতাদের আপোষমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ হিসেবে বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ইংরেজ সরকারকে দেশ ছাড়া করার এক মরণপণ বৈপ্লবিক আদর্শ গড়ে উঠেছিল। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বড় বড়-ইংরেজ কর্মকর্তাদের খতম না করলে ইংরেজ সরকার কোনদিনই এ দেশ ত্যাগ করবে না, এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু, চন্দ্রশেখর, বিনয়, দীনেশ, বাদল, যতীন, সূর্যসেন, প্রীতিলতা, মাতঙ্গিনী হাজরা, সত্যেন, রাজেন প্রভৃতি থেকে শুরু করে হাজার হাজার বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী তরুণ কিভাবে হাসতে হাসতে মৃত্যুযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার গৌরবময় ইতিহাস অল্পবিস্তর সবারই জানা আছে। সশস্ত্র বিপ্লবীদের এ আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে সফল না হবার পেছনে অনেক কারণ বিদ্যমান ছিল। তার মধ্যে দু'টি প্রধান কারণের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। প্রথম কারণ দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙক্ষাকে সম্পৃক্ত না করে বিচ্ছিন্নভাবে এ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। দুই, ভারতবর্ষের দুই বৃহত্তর রাজনৈতিক দল অর্থাৎ ইংরেজ সরকার সৃষ্ট ও সরকার-লালিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ঐ আন্দোলনের পরিপোষকতা করেনি, বরঞ্চ বলা চলে ঐ দুটি দলই চরমপন্থী আন্দোলনের ঘোর বিরোধিতা করেছিল। যাই হোক, আমাদের আলোচনার বিষয় তা নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় এমন একটি বিতর্কিত ও স্পর্শকাতর রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কেন রবীন্দ্রনাথ জীবনের উপান্তে পৌঁছে বিপ্লব বিরোধী একখানা উপন্যাস লেখার জন্য এত আগ্রহী হলেন? সেক্ষেত্রে আমাদের বিবেচ্য বিষয় উপন্যাসটি কি তাহলে উদ্দেশ্যধর্মী? এ ধরনের বক্তব্যকে সামনে রেখে বিগত ষাট বছর ধরে বইটির বহু সমালোচনা হয়েছে। অরবিন্দ পোদ্দার ঐ উপন্যাস রচনার মূল উদ্দেশ্যের শিকড় ধরে টান দিয়েছেন, যা ইতোপূর্বে দেখা যায়নি।

দুই

'চার অধ্যায়' প্রথম প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথ কাহিনী উন্মোচনে সাহায্যকারী হিসেবে যে ভূমিকাটি সংযুক্ত করেছিলেন, দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে তা বর্জন করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ ঐ

CamScanner

ভূমিকা কেন রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে বর্জন করেছিলেন রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাসে তার কোন কৈফিয়ৎ খুঁজে পাওয়া যায় না। সেজন্য অরবিন্দ পোদ্দার বিবৃতিকে 'রহস্যময়' বলে আখ্যায়িত করেছেন। সে যাই হোক ঐ ভূমিকায় আসলে কি ছিল তা দেখা প্রয়োজন। ভূমিকাটি ছিল এরূপ:

"একদা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যখন Twentieth century মাসিক পত্রের সমালোচনায় নিযুক্ত তখন সেই পত্রে তিনি আমার নতুন প্রকাশিত নৈবেদ্য গ্রন্থের এক সমালোচনা লেখেন। তৎপূর্বে আমার কোন কাব্যের এমন অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাদ কোথাও দেখিনি। সেই উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।"

"তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপরপক্ষে বৈদান্তিক-তেজস্বী, নির্ভীক ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী। অধ্যাত্মবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে।"

"শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তাঁকেই আমার প্রধান সহযোগী পাই। এই উপলক্ষে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রাম পথে পদচারণ করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাকালে যে সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত হই।"

"এমন সময়ে লর্ড কার্জন বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প হলেন। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রথম হিন্দু মুসলমান বিচ্ছেদের রক্তবর্ণ রেখাপাত হল। এই বিচ্ছেদ ক্রমশ আমাদের ভাষা সাহিত্য আমাদের সংস্কৃতিকে খণ্ডিত করবে, সমস্ত বাঙালি জাতকে কৃশ করে দেবে এই আশঙ্কা দেশকে প্রবল উদ্বেগে আলোড়িত করে দিল। বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেল না। লর্ড মর্লি বললেন, যা স্থির হয়ে গেছে তাকে অস্থির করা চলবে না। সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন, 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলেন। এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলাদেশের আভাসে ইঙ্গিতে বিপ্লবিকাপন্থার সূচনা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এতবড় প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল।"

"এই সময়ে দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। মনে করেছিলুম হয়তো আমার সঙ্গে তাঁর রাষ্ট্র আন্দোলন প্রণালীর প্রভেদ অনুভব করে আমার প্রতি তিনি বিমুখ হয়েছিলেন অবজ্ঞাবশতই।"

"সম্প্রতি দেশে উপদ্রবের উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। সেই অন্ধ উন্মত্ততার দিনে একদিন যখন জোড়াসাঁকোয় তেতলার ঘরে একলা বসেছিলেম হঠাৎ এলেন উপাধ্যায়। কথাবার্তার মধ্যে আমাদের সেই পূর্বকালের আলোচনার প্রসঙ্গও কিছু উঠেছিল। আলাপের

শেষে তিনি বিদায় নিয়ে উঠলেন। চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, 'রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে।' এই বলেই আর অপেক্ষা করলেন না, গেলেন চলে। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম এই মর্মান্তিক কথাটি বলবার জন্যই তাঁর আসা। তখন কর্মজাল জড়িয়ে ধরেছে, নিষ্কৃতির উপায় ছিল না।"

"এই তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা ও শেষ কথা।"

"উপন্যাসের আরম্ভে এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।"

ভূমিকার ঐ অংশটি উদ্ধৃত করার পর অরবিন্দ পোদ্দার তাঁর 'বিপ্লবী আন্দোলনের রবীন্দ্র প্রেক্ষিত' নামক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন এভাবে ঃ

"বলা নিষ্প্রয়োজন, এই ভূমিকায় উপাধ্যায়ের স্বীকারোক্তি 'রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে, এটাই সব কথার সার কথা। কারণ তাঁর পতন যদি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত ও স্বীকৃত হয় তাহলে 'চার অধ্যায়'-এ বর্ণিত বিপ্লবী কর্মকান্ডের বা রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত চরমপন্থী রাজনীতির চিত্র যথাযথ বলে গ্রহণযোগ্য হয়। ব্রহ্মবান্ধব সমস্ত বিপ্লবী সংস্থা এবং কর্মকান্ডের প্রতিভূ বলে সম্মানিত। তাঁর তথাকথিত আদর্শ বিচ্যুতি, শুভাশুভ বিচারের চেতনার অভাব বা নৈতিক অবনতি, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যেকোন প্রকার সৎ বা অসৎ উপায় অবলম্বন যদি সত্য হয়, তাহলে সামগ্রিকভাবে বিপ্লবী বা চরমপন্থী আন্দোলনই কলঙ্কিত ও নিন্দনীয় হয়ে ওঠে। 'সে জন্য উল্লিখিত পতনের তত্ত্বই রবীন্দ্রনাথের ঐ উপন্যাস রচনার প্রাথমিক প্রত্যয়। কিন্তু প্রশ্ন এই প্রত্যয়ের ভিত্তি কি অভ্রান্ত? অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ-উপাধ্যায় সাক্ষাৎকার কি সত্যিই ঘটেছিল? আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ঘটেনি।"

অরবিন্দ পোদ্দার তাঁর প্রবন্ধে উপাধ্যায় যে এমন কথা কখনোই বলতে পারেন না এবং কেন পারেন না তার কারণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। উপাধ্যায়ের মতো 'উন্নত মস্তক' 'অকুতোভয়' মানুষের পতনকে অরবিন্দ পোদ্দার যেভাবে 'অকল্পনীয়' ও 'অবিশ্বাস্য' বলে অভিহিত করেছেন সেটাকে সর্বাংশে স্বীকার করতেও কিছুটা দ্বিধা হয়। ঐ রকম মানুষেরও পতন বিশেষ কোন দুর্বল মুহূর্তে ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় সংস্করণে ঐ ভূমিকা কেন বাতিল করলেন তার কোন কারণ না দেখানোটাই তাঁর জন্য আত্মপ্রতারণারই শামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রতারণার এখানেই শেষ নয়। অরবিন্দ পোদ্দার আরো এমন কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন যাতে বোঝা যায় চরমপন্থী বিপ্লবীদের বিপ্লব প্রচেষ্টাকে হেয়-প্রতিপন্ন করার জন্য রবীন্দ্রনাথ হয়তো ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা ভেতরে ভেতরে অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন নতুবা তিনি নিজেই ঐ ধরনের একটা বই লিখে সরকারকে সাহায্য করার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে গেছেন।

তিন

'চার অধ্যায়' উপন্যাসে ইন্দ্রনাথ, অতীন, এলা, কানাই, বটু প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশের সন্ত্রাসী আন্দোলনের শোচনীয় ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরেছেন। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস প্রকাশিত হবার আগে থেকে (গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে) চরমপন্থী আন্দোলনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রচুর মন্তব্য করেছেন। ১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ ঐ আন্দোলন সম্পর্কে বললেন, "দেশের যে দুর্গতি দুঃখ আমরা আজ পর্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি তাহার গভীর কারণ আমাদের জাতির অভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে—গুপ্ত চক্রান্তের দ্বারা নর-নারী হত্যা করিয়া আমরা সে কারণ দূর করিতে পারিব না, আমাদের পাপের বোঝা কেবল বাড়িয়াই চলিবে। এই ব্যাপারে যে সকল অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও বিচলিতবুদ্ধি যুবক দন্ডনীয় হইয়াছে তাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারে না—কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই দন্ড আমাদের সকলের দন্ড, ঈশ্বর আমাদিগকে এই বেদনা দিলেন কারণ, বেদনা ব্যতীত পাপ দূর হইতে পারে না—সহিষ্ণুতার সহিত এ সমস্তই আমাদিগকে বহন করিতে হইবে এবং ধর্মের প্রশস্ততর পথকেই অবলম্বন করিতে হইবে।" বিপ্লবী আদর্শের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার জন্য যাঁরা মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে দলে দলে আত্মাহুতি দিচ্ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ কঠোর ভাষায় তাঁদের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ ব্যক্ত করেছেন। 'পথ ও পাথেয়' 'সফলতার সদুপায়' 'দেশহিত' 'ছোটো ও বড়ো' প্রভৃতি প্রবন্ধে তার পরিচয় পাওয়া যায়। চরমপন্থী আন্দোলনের বিরুদ্ধে বক্তব্য তুলে ধরতে গিয়ে তিনি 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের প্রায় সবক'টি চরিত্রের উপর যে ভাবে কালিমা লেপন করেছেন তাতে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যে কোন পাঠকই ক্ষুব্ধ না হয়ে পারেন না। উপন্যাসের প্রত্যেকটি প্রধান প্রধান চরিত্র প্রারম্ভে মেধায়, মননে, উচ্চতর আদর্শে যেমন মহিমান্বিত তেমনি দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাঁরা নির্ভীক প্রত্যয়ে উৎসর্গীকৃতও; কিন্তু পরিণামে তাঁদেরকেই আপন আপন সংকীর্ণ ও হীন স্বার্থের কারণে আদর্শ থেকে স্খলিত ও অধঃপতিত হতে দেখি। বিপ্লববাদের আদর্শকে বিশেষত যে আদর্শের কারণে বঙ্গদেশের বহু তরুণ হাসতে হাসতে ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, সেই আদর্শকে এত জঘন্যভাবে কলঙ্কিত করার প্রবল প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ করে পেলেন কোথা থেকে? নিষ্ঠুর ঐ তৎপরতার মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করা যাবে না—এ বিশ্বাস মনে মনে পোষণ করা এক কথা আর সেই যুদ্ধে লিপ্ত তরুণ-তরুণীদের বৈপ্লবিক আদর্শকে কলংকিত করার জন্য শেষ বয়সে পৌঁছে একখানা উপন্যাস রচনা করা অন্য কথা। রহস্য সেখানেই। আসলে অন্য কথার পেছনেও কিছু গোপন কথা ছিল। ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে ঐ উপন্যাস রচনা করেছিলেন। সে প্রসঙ্গে যাবার আগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের সম্পর্ক কেমন ছিল, বিশেষ করে উপন্যাসটি রচনার আগে কেমন ছিল তা একটুখানি যাচাই করে দেখা যেতে পারে। ১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আজ

যে পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া ভারতেতিহাসের একটা প্রধান অংশ জুড়িয়া বসিয়াছে ইহা কি সম্পূর্ণ আকস্মিক, অপ্রয়োজনীয়। ইংরেজের নিকট কি আজ আমাদের শিখিবার কিছুই নাই। তিন সহস্র বৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাহা আমাদের দিয়া গিয়াছেন, বিশ্ব মানব ভাণ্ডারে তাহা অপেক্ষা নতুন জ্ঞান কি আর কিছুই থাকিতে পারে না। নিখিল মানবের সঙ্গে জ্ঞান প্রেম কর্মের নানা আদান প্রদানে আমাদের অনেক প্রয়োজন আছে, ইংরেজ বিধাতৃপ্রণোদিত হইয়া তাহারই উদ্যম আমাদের মধ্যে জাগাইতে আসিয়াছে, সফল না হওয়া পর্যন্ত সে নিশ্চিত হইবে না। সে সফলতা পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনে, বিরোধে নহে। আসল কথা এই, পশ্চিমের সহিত প্রাচ্যকে মিলিতেই হইবে। পশ্চিমকে আপনার শক্তিতে আপনার করিয়া লইতে হইবে।......... তীব্র উক্তির দ্বারা নহে, দুঃসাহসিক কার্যের দ্বারা নহে, কিন্তু ত্যাগের দ্বারা আজ আমাদিগকে শ্রেয়কে বরণ করিয়া লইতে হইবে।" বলাই বাহুল্য যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এ সমস্ত বক্তব্যের মধ্যদিয়ে 'বড়ো ইংরেজ'কে দেখতে পেয়েছিলেন। 'ছোট ইংরেজ'-এর পাশবিক ও পৈশাচিক রূপ প্রথম প্রত্যক্ষ করলেন জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। জেনারেল ডায়ারের ঐ বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডকে ইংরেজ প্রশাসন সগর্ব-উল্লাসে সমর্থন করলো— রবীন্দ্রনাথ ক্ষোভে দুঃখে ও তীব্র ঘৃণায় ইংরেজ প্রদত্ত নাইট উপাধি পরিত্যাগ করে ঐ হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ব্যক্ত করলেন। ইংরেজদের কাছ থেকে ভারতবাসীর আশা করার আর কিছুই অবশিষ্ট রইলোনা জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস ঘটনা থেকে তিনি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন। তাঁর ঐ অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে এক বন্ধুকে লিখলেন (প্রবাসী পত্রিকায় ঐ চিঠি ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়) ঃ "........পাঞ্জাবে এরা যে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল, মনে করেছিলুম, সেটা আকস্মিক এবং সাময়িক আতঙ্ক থেকে তার উৎপত্তি। কিন্তু এখানে (বিলেতে) পার্লামেন্টে সে সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছিল তার থেকে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছি এই প্রচণ্ডতা এদের মজ্জায় নিহিত, তাদের রক্তে বহমান। ডায়ারের কীর্তিকে এরা কেউ কেউ Splendid brutality বলে প্রশংসা করেছে। এই উপলক্ষে এদের মেয়েদের মধ্যেও রক্তলোলুপ হিংস্রতার পরিচয় পেয়ে আমি বিস্মিত হয়ে গেছি। আমাদের বোঝবার সময় এসেছে যে, এদের কাছ থেকে আমাদের কিছু আশা করা আত্মাবমননা।'

১৯২৫ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্রনাথ তাঁর ডায়রিতে লিখেছেন, "ভারতবর্ষকে ইংরেজ যেমন করে হারিয়েছে এমন আর য়ুরোপের কোন জাত নয়।..........তার ফৌজের গাঁটের মধ্যে যে বস্তুটিকে কষে বাঁধতে পারলে সেই থেকেই সে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ বলে বুক ফুলিয়ে গদীয়ান হয়ে বসে রইল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তার বিস্ময় নেই, অবজ্ঞা যথেষ্ট আছে। রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বাইরে ইংরেজ ভারত সম্বন্ধে যত অল্প আলোচনা করেছে এমন ফ্রান্স করেনি, জর্মান করেনি।........ইংরেজের লোভ যে-ভারতবর্ষকে পেয়েছে ইংরেজের আত্মা সেই ভারতবর্ষকে হারিয়েছে।" দমন ও

CamScanner

নিপীড়নের মাত্রা উত্তরোত্তর এতই বৃদ্ধি পেতে থাকে যে তার ফলে চরমপন্থীদের প্রতিশোধ গ্রহণের দুর্বার স্পৃহা ও তার ব্যাপকতা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কারণে সেনাবাহিনী ও পুলিশের বিরুদ্ধে চরমপন্থী বিপ্লবীদের যে সংগ্রাম শুরু হয় তাতে সমগ্র ভারতবর্ষ এক অভূতপূর্ব আনন্দ-বিস্ময়-সংকল্পের শিহরণে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী দমননীতি এমন বর্বর ও হিংস্র রূপ নেয় যে, বারট্রান্ড রাসেলের মতো বিশ্ববিশ্রুত মনীষীও তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া না জানিয়ে পারেননি। ঐ সময়ের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন, জনগণের সংগ্রাম স্তব্ধ করার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদ দেশব্যাপী সৃষ্টি করে এক ভয়ঙ্কর আতঙ্কের পরিবেশ। সেজন্য এক আধটি নয়, দশটি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছিল, তার কয়েকটি পরে বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত করা হয়।

ঐসব অর্ডিন্যান্স ও আইনের জোরে শুধু বাংলারই ৩,১১০ জন বিপ্লবী নেতা -কর্মীকে কারারুদ্ধ করা হয় ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সনের মধ্যে, এ জন্য বক্সা, হিজলি ও দেওলি বন্দীনিবাস নির্মিত হয়। দ্বীপান্তরে প্রেরিত বন্দীদের এই হিসাবে ধরা হয়নি।.......... ১৯৩০ সনের ১ এপ্রিল থেকে ১৪ই জুলাইয়ের মধ্যে পুলিশ জনতার উপর ২৪ বার গুলীবর্ষণ করে, ফলে ১০৩ জনের মৃত্যু ও ৪২০ জন সত্যাগ্রহী আহত হয়। এটাই ছিল সরকারের অনুসৃত নীতি, আর এর দর্পণেই পরবর্তী ঘটনা অনুমান করা চলে।.......... কংগ্রেসের হিসাব অনুযায়ী ১৯৩০-৩১ সনে, মাত্র দশ মাসের মধ্যে নব্বই হাজার নারী-পুরুষ ও শিশুকে নানাবিধ দন্ডে দন্ডিত করা হয়। ১৯৩২-৩৩ পর্যায়ে ১৯৩৩ সনের' এপ্রিল মাস পর্যন্ত গ্রেফতারের সংখ্যা ১,২০,০০০-এ পৌঁছায়, এর মধ্যে রাজবন্দীদের ধরা হয়নি। লন্ডনে ইন্ডিয়া লীগ ভারতবর্ষের পরিস্থিতি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার জন্য চার সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। তাঁদের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সনে। তাতে তাঁরা বলেন, ব্যাপক সন্ত্রাসী সৃষ্টি, দৈহিক উৎপীড়ন, গুলীবর্ষণ, ভূসম্পত্তি ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের সামগ্রী বাজেয়াপ্তকরণ, সম্পত্তি ধ্বংসকরণ, পাইকারি শাস্তি ও জরিমানা, গ্রামবাসীদের জমি ও সম্পত্তি বে-দখল করা, চাবুক ও বেত্রাঘাত, বন্দীদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার ইত্যাদি সব রকমের নির্মম ব্যবস্থাই ঔপনিবেশিক প্রশাসন গ্রহণ করেছিল। ঐ প্রতিবেদনের ভূমিকায় বারট্রান্ড রাসেল লেখেন, "নাৎসী জার্মানীর অনাচার-অত্যাচার সম্পর্কে আগ্রহের কোন অভাব দেখা যায় না, সংবাদপত্রে তা সবই প্রকাশিত হয় এবং ন্যায়সঙ্গত ক্রোধ ও বিক্ষোভ তার বিরুদ্ধে ব্যক্ত হয়। কিন্তু ইংল্যান্ডের খুব অল্প সংখ্যক লোকই জানে যে, ভারতে বৃটিশ প্রশাসনও সেই ধরনের বীভৎস কার্যকলাপই চালিয়ে যাচ্ছে।" রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' উপন্যাসখানি বিচার বিশ্লেষণ করতে হলে উপরোক্ত রাজনৈতিক পটভূমি জানা দরকার বলেই অরবিন্দ পোদ্দার বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো। (তাঁর রবীন্দ্রনাথ/রজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গ্রন্থ দ্রঃ)।

চার

সিংহলে কান্ডি শহরে ১৯৩৪ সালের জুন মাসে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের রচনাকালের কথা বলা হয়েছে। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ঐ সালে নভেম্বর মাসে, কিন্তু বাজারজাত করা হয় ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে। এ তথ্য নেপাল মজুমদারের 'রবীন্দ্রনাথ/কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ' নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। উপরে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর যেসব মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তাতে সন্দেহ থাকে না যে, ঐ শাসন ব্যবস্থার রুদ্ররূপের প্রতি তিনি দারুণভাবে ক্ষুব্ধ ও বীতশ্রদ্ধ। এমনকি গ্রন্থটি রচনার মাত্র কয়েকমাস আগে অর্থাৎ ১৯৩৩ সালে জুলাই-আগস্ট মাসে তাঁর 'কালান্তর' নামক প্রবন্ধে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ ও মর্মবেদনা তিনি প্রকাশ করলেন তাতে ঐ শাসন ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধার কোন পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না। ঐ প্রবন্ধের একস্থানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যুরোপের বাইরে অনাত্মীয় মন্ডলে যুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে।" "আয়র্লন্ডে রক্ত পিঙ্গলের যে উন্মত্ত বর্বরতা দেখা গেল, অনতিপূর্বেও আমরা তা কোনদিন কল্পনাও করতে পারতুম না। তারপরে চোখের সামনে দেখলুম জালিয়ানওয়ালাবাগের বিভীষিকা।" "যুদ্ধ পরবর্তীকালীন যুরোপের বর্বর নির্দয়তা যখন আজ এমন নির্লজ্জভাবে চারিদিকে উদঘাটিত হতে থাকলে তখন এই কথাই বারবার মনে আসে, কোথায় রইলো মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপিল পৌঁছবে আজ।"

এর মাত্র কয়েকমাস পরে রচিত ঐ উপন্যাসের সেই রকম একজন বিপ্লবী নায়ক যিনি ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ প্রশাসনের উৎসাদন ঘটানোর জন্য দলপতি হিসেবে কাজ করছেন, সেই ইন্দ্রনাথের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়ে নিচ্ছেন, "সমস্ত যুরোপের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, আমি ইংরেজকেও জানি। যত পশ্চিমী জাত আছে তার মধ্যে ওরা সবচেয়ে বড়ো জাত।" এও বলিয়েছেন, "ষোলো-আনা মারের চোটে আমাদের মেরুদন্ড ওরা চিরকালের মতো গুঁড়িয়ে দিতে পারত। সেটা ওরা পারলে না। আমি ওদের মনুষ্যত্বকে বাহাদুরি দেই। পরের দেশ শাসন করতে করতে সেই মনুষ্যত্ব ক্ষয় হয়ে আসছে, তাতেই মরণদশা ধরছে ওদের ভিতর থেকে। এত বেশি বিদেশের বোঝা আর কোন জাতের ঘাড়ে নেই, এতে ওদের স্বভাব যাচ্ছে নষ্ট হয়ে।" (ইংরেজ সরকার শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত করলে তিনি রবীন্দ্রনাথকে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে পত্রিকায় দু-চার কথা লিখে দেবার অনুরোধ জানালে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬ সালে লেখা এক পত্রে তাঁকে বেশ কিছু হিতবাক্য শুনিয়েছিলেন, তার এক স্থানে উপরোক্ত বচনসমূহেরই প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়—যেমন "আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম—আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলেম একমাত্র ইংরেজ গবমেন্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গবর্মেন্টই এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না ....।"

ইংরেজ প্রশাসনের প্রতি বিরূপ সমালোচনার পাশাপাশি অন্তরে অন্তরে তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত থাকার এই ভঙ্গি রবীন্দ্রনাথ আশি বছর পূর্তির আগে পর্যন্ত লালন করেছিলেন। আশি বছর পূর্তির পর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে সেই শ্রদ্ধা সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেন। ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে উচ্চারণ করেন, "জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।" এর আগে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে 'ভদ্র সম্বন্ধ' বজায় রেখে তার বিরুদ্ধে আলোচনা-সমালোচনা করেছেন কিন্তু সে সমালোচনা যতই কঠোর হোক, মনে মনে শ্রদ্ধার ভাবটিকে তিনি ঠিকই বজায় রেখে চলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ঐ ধরনের দু'মুখো নীতির ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যায়। চরমপন্থী তরুণদের বৈপ্লবিক আদর্শ প্রসঙ্গে তাঁর দু'মুখো ভাবের প্রকাশ কিভাবে ঘটেছে এখানে দেখানো যেতে পারে। 'ছোট ও বড়ো' প্রবন্ধের এক্স্থানে তিনি বলেছেন, "কিন্তু এটা ভুলিলে চলিবে না যে, দেশভক্তির আলোকে বাংলাদেশে কেবল যে চোর ডাকাতকে দেখিলাম তাহা নহে, বীরকেও দেখিয়াছি। মহৎ আত্মত্যাগের দৈবী শক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছি এমন কোনদিন দেখি নাই। ইহারা ক্ষুদ্র বিষয় বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে।...... আজ সহসা ইহাই দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি যে, বাংলাদেশে এই ধনমানহীন সংকটময় দুর্গমপথে তরুণ পথিকের অভাব নাই। ইহারা কংগ্রেসের দরখাস্ত বিছাইয়া আপন পথকে সুগম করিতে চায় নাই।" যিনি বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠী বা দলের তরুণদেরকে দেশের স্বাধীনতার জন্য দলে দলে নিঃস্বার্থভাবে আত্মাহুতি দিতে দেখে এভাবে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন তিনিই আবার কেমন করে বিপ্লবীদেরকে কলংকিত করার জন্য অতীনের মুখ দিয়ে বলাতে পারেন— "আগাগোড়া কলঙ্কে কালো হয়ে পরাভবের শেষ সীমায় অখ্যাতির অন্ধকারে মিশিয়ে যাব আমরা।" কেমন করে বলাতে পারেন—"তোমরা যাকে পেট্রিয়ট বলো আমি সেই পেট্রিয়ট নই। পেট্রিয়টিজমের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চে না মানে তাদের পেট্রিয়টিজম কুমীরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়ানৌকা। মিথ্যাচারণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতা লাভের চক্রান্ত ,গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই গর্তর ভিতরকার কুশ্রী জগৎটার মধ্যে দিনরাত মিথ্যের বিষাক্ত হওয়ায় কখনোই নিজের স্বভাবে সেই পৌরুষকে রক্ষা করতে পারব না, যাতে পৃথিবীতে কোনো বড়ো কাজ করতে পারা যায়।" বিপ্লবীদেরকে পতনের শেষ সীমায় নিয়ে যেতে রবীন্দ্রনাথ অতীনকে দিয়ে এমন স্বীকারোক্তিও আদায় করিয়ে নিলেন–"কী না করতে পারি আমি! পড়েছি পতনের শেষ সীমায়। সেদিন আমাদের দল অনাথা বিধবার সর্বস্ব লুট করে এনেছে। মন্মথ ছিল বুড়ির গ্রাম সম্পর্কে চেনা লোক, খবর দিয়ে পথ দেখিয়ে সে-ই এনেছে দলকে। ছদ্মবেশের মধ্যেও বিধবা তাকে

চিনতে পেরে বলে উঠল, মনু, বাবা তুই এমন কাজ করতে পারলি ? তারপরে বুড়িকে আর বাঁচতে দিলে না। যাকে বলি দেশের প্রয়োজন সেই আত্মধর্মনাশের প্রয়োজনে টাকাটাও এই হাত দিয়েই পৌঁচেছে যথাস্থানে। আমার উপবাস ভেঙেছি সেই টাকাতেই। এতদিন পরে যথার্থ দাগি হয়েছি চোরের কলঙ্কে, চোরাই মাল ছুঁয়েছি, ভোগ করেছি।" এই বক্তব্যের পাশাপাশি কি একথা বলা যায়— "মহৎ আত্মত্যাগের দৈবীশক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জল করিয়া দেখিয়াছি এমন কোনদিন দেখি নাই। ইহারা ক্ষুদ্র বিষয়বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে.......।' রবীন্দ্রনাথের কোন্ বক্তব্যকে সত্য বলে গ্রহণ করবো ? এ ধরনের বক্তব্যে যদি কোন ভেজাল না থাকে তাহলে বলতেই হয় যে 'চার অধ্যায় উপন্যাসের চরিত্রসমূহকে তিনি বিশেষ উদ্দেশ্যে কারো স্বার্থ রক্ষার্থেই পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কলংকিত, স্খলিত ও অধঃপতিত হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এই পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অরবিন্দ পোদ্দার তাঁর প্রবন্ধে যে আভাস দিয়েছেন তার উল্লেখ প্রয়োজন–"চার অধ্যায় রচনার প্রাক্‌কালে এন্ডারসন প্রশাসন যখন সন্ত্রাসবাদ দমন আইন প্রণয়ন করে প্রবল অত্যাচার উৎপীড়নের বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল এবং অন্যদিকে সাংস্কৃতিক অভিযানও চালিয়েছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের উপর কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল কিনা, তা নিরূপণ করা কঠিন। নিরূপণ করা অসম্ভব হলেও আমার অনুমান, ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে সেই সময়ে তাঁর সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল এবং তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন।"

সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন অথবা বাড়াননি সে প্রসঙ্গে যাবার আগে বাংলার গভর্ণর স্যার এন্ডারসন সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার। বিপ্লবীরা তাঁর আসার আগে মেদিনীপুরের দু'জন অত্যাচারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অনেকগুলি প্রাণের বিনিময়ে হত্যা করেছিলেন। যেমন ১৯৩১ সালে তাঁরা হত্যা করেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডিকে এবং ১৯৩২ সালে খতম করেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাসকে। এ ঘটনা ইংরেজ সরকারকে দারুণভাবে আতংকিত ও দিশেহারা করে তোলে। সরকারের আশংকা হলো এভাবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হত্যালীলা চলতে থাকলে প্রশাসন ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। সরকার তাই অনেক ভেবে-চিন্তে বিপ্লবীদের দমন করার মতো সাহসী ও পাশবিক নিপীড়নে পারঙ্গম কোন এক গভর্ণরকে বঙ্গদেশে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জন এন্ডারসন দানবীয় শক্তিতে আয়ারল্যান্ডের সিন্‌ফিন আন্দোলন দমনে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, আনা হলো তাঁকেই। মূর্তিমান ত্রাসের মতো তিনি বিপ্লবীদের সমূলে উৎপাটিত করার জন্য একটার পর একটা আইন জারি করতে থাকলেন এবং বিপ্লবী সন্দেহে যাকে যেখানে পাওয়া গেল ধরে এনে জেলে ঢুকিয়ে তাদের উপর অকথ্য

নির্যাতন শুরু করলেন। কিন্তু এত ত্রাস সৃষ্টি করা সত্ত্বেও বিপ্লবীরা মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ-কে হত্যা করলো ১৯৩৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর । এন্ডারসন বিপ্লবীদের কঠোরহস্তে দমন করার চ্যালেঞ্জ নিয়ে ক্ষমতায় বসেছিলেন কিন্তু এহেন শোচনীয় পরাজয়ের কারণে তিনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মেদিনীপুরের উপর অত্যাচার আর নিপীড়নের যে তান্ডব শুরু করেছিলেন তা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানিয়েছিল। এন্ডারসনের ঐ বর্বরতায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো বাংলার তরুণ বিপ্লবী দল। তাঁকে খতম করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো ১৯৩৪ সালের ৮ই মে। স্থান দার্জিলিংয়ের লেবং ঘোড় দৌড়ের মাঠ। ঘোড় দৌড় শেষে বিজয়ীপক্ষকে গভর্ণরস কাপ পুরস্কার দেবেন এন্ডারসন নিজেই। এন্ডারসনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল বলতে হবে, কারণ তিনি তাঁর স্টেনো মিস থর্টনের আড়ালে আত্মগোপন করায় সামান্য আঘাত পেয়ে প্রাণে বেঁচে গেলেন। গুলীবিদ্ধ হলেন মিস থর্টন। চারজন বিপ্লবীর সুপরিকল্পিত আক্রমণ এভাবে ব্যর্থ হবে এটা ভাবাই যায়নি। একজন নারীসহ চরজন বিপ্লবীই ধরা পড়লেন।

বিখ্যাত রবীন্দ্র সমালোচক, নেপাল মজুমদার তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ, কয়েকটি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' নামক গ্রন্থের 'চার অধ্যায় ঃ প্রাসঙ্গিক তথ্য' শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে বলেছেন, "বস্তুত, ১৯৩৩ সালের মাঝামাঝি নাগাদ প্রায় সবক'টি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী গোষ্ঠীই পন্থা হিসেবে সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ করেছিলেন। ১৯৩৪ সালের 'লেবং-এ্যাকশন' একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা।"

ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী নেপাল মজুমদারের ঐ মন্তব্য সমর্থনযোগ্য নয়। এন্ডারসন হত্যাকে তিনি বিচ্ছিন্ন ঘটনা কিভাবে বলেন? ১৯৩১. ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে পর পর তিন বছরে মেদিনীপুরের তিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে চরমপন্থী বিপ্লবীরা হত্যা করেছিলেন সুপরিকল্পিতভাবে এবং ১৯৩৪ সালে এন্ডারসন মধ্যযুগীয় বর্বরতায় দমননীতি প্রয়োগ করায় বিপ্লবীরা তাঁকেও সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করার প্রচেষ্টা চালায়। সুতরাং এটাকে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা বলা ঠিক হবে না। তাছাড়া নেপাল মজুমদারের উক্তি '১৯৩৩ সালের মাঝামাঝি নাগদ প্রায় সবক'টি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী গোষ্ঠীই পন্থা হিসাবে সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ করেছিলেন, এ কথাটিও যথার্থ নয়। ১৯৩৫ সালের ১৫ই জুন ত্রাস সৃষ্টিকারী দারোগা আসাদ আলীকে হত্যা করেছিল সতেরো বছরের তরুণ রোহিনী বড়ুয়া। সে কারণে রোহিনী বড়ুয়ার ফাঁসি হয়েছিল ১৯৩৫ সালের ১৮ই ডিসেম্বরে ফরিদপুর জেলের ফাঁসির মঞ্চে। এ ঘটনাও চরমপন্থীদের বৈপ্লবিক ইতিহাসে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। তাছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী থেকে সুভাষ বসু ও জাপান থেকে রাসবিহারী বসু 'আজাদ হিন্দ'-এর মাধ্যমে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য যে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়েছিলেন চরমপন্থী রাজনীতির ধারাবাহিক ইতিহাসে তার মূল্যও কম নয়।

বাংলার গভর্ণর স্যার এন্ডারসনের প্রাণ রক্ষা পাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ দারুণভাবে স্বস্তি প্রকাশ করেছিলেন। দার্জিলিংয়ের লেবং ঘোড়দৌড়ের মাঠে যখন ঘটনাটি ঘটে তখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সিংহলের কান্ডি শহরে। সেখানে গিয়েছিলেন একদল শিল্পী নিয়ে। উদ্দেশ্য, শান্তিনিকেতনের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করা। ঐ সময় তিনি সেখানে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটি রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। ১৯৩৪ সালের ৮ই মে এন্ডারসনকে হত্যার জন্য গুলী ছোঁড়া হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে সেই গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি কিভাবে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সংবাদটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩৪ সালের ১০ই মে এক তারবার্তায় গভর্ণরকে বলেন, "আপনার প্রাণনাশের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টায় আমরা বাংলার সকলেই লজ্জিত ও অনুতপ্ত।" রবীন্দ্রনাথ গভর্ণরকে সমবেদনা জানাতে গিয়ে শুধু এটুকুতেই ক্ষান্ত হননি, তিনি 'Daily News' পত্রিকার রিপোর্টারের কাছে এভাবে একটি বিবৃতি দেন, "আমি বিস্ময়বিমূঢ় ও লজ্জিত। বিকারগ্রস্ত অপরাধ প্রবণতার এ হলো কুৎসিত একটা লক্ষণ।" (অরবিন্দ পোদ্দারের উপরোক্ত প্রবন্ধ থেকে এ উদ্ধৃতি গৃহীত হলো)। বলাই বাহুল্য যে, এন্ডারসন হত্যা প্রচেষ্টায় জড়িত ভবানী, রবি, মনোরঞ্জন ও উজ্জ্বলার ভাগ্যে কি সাংঘাতিক পরিণাম ঘটলো বা না ঘটলো সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে কোন উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করা গেল না। তাঁদের মাথার উপর শুধু 'বিকারগ্রস্ত অপরাধ প্রবণতার' কলঙ্ক চাপিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দায়িত্ব শেষ করলেন। মধ্যযুগীয় বর্বরতায় যিনি বাংলার মানুষের উপর উৎপীড়ন চালিয়ে জনজীবনকে দারুণভাবে দুর্বিষহ ও আতংকগ্রস্ত করে তুলেছিলেন তাঁকে সমবেদনা জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোন্ অধিকারে বলতে পারেন, 'আপনার প্রাণনাশের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টায় আমরা বাংলার সকলেই লজ্জিত ও অনুতপ্ত ? (নীচের লাইন আমার দেওয়া)। এন্ডারসনকে মারার প্রচেষ্টায় 'বাংলার সব মানুষ লজ্জিত ও অনুতপ্ত—এমন কথা রবীন্দ্রনাথ কোন্ অধিকারে বলেন সে প্রশ্ন খুব সঙ্গতভাবেই অরবিন্দ পোদ্দারও উত্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এহেন অনধিকার চর্চার পশ্চাতে অবশ্যই কোন কারণ জড়িত ছিল। কি সেই কারণ ? অরবিন্দ পোদ্দার তথ্য প্রমাণ সহযোগে যা দেখিয়েছেন তাতে সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না যে, 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটি রচিত হয়েছে ব্রিটিশ সরকারেরই অনুরোধে অথবা ব্রিটিশ সরকারকে খুশী করার জন্যই। কান্ডি শহরে যখন উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করছিলেন তখন তথ্য-প্রমাণের মাধ্যমে স্পষ্ট বোঝা যায় সরকারের সঙ্গে বিপ্লব-বিরোধী একটি উপন্যাস রচনার কথা তার সঙ্গে পূর্বেই পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল। এন্ডারসন প্রশাসন সাংস্কৃতিক দিক থেকে চরমপন্থী বিপ্লবীদের কার্যকলাপকে প্রতিহত করার জন্য ১৯৩৫ সালে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মেজর সিজি ব্রেনান এই পরিকল্পনার উদ্ভাবক ছিলেন। সরকারী দলিল-দস্তাবেজে তাঁর কিছু বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

মেজর ব্রেনান তাঁর প্রতিবেদনে বলেছেন ঃ "Arrangements have been made for the staging of plays to oppose the evils of terrorism and civil disobedience.

"Dr. Rabindranath Tagore has also recently been persuaded through the Assistant Disector of Public Instruction Bengal to dramatise one of his books Char Adhaya which delivers a powerful attack on the cult of terrorism. When ready copies will be distributed to district officers in the same manner as the Pathabhrasta, and it is also proposed to make an attempt to make it staged in the first class theatre in calcutta like Rangmahal or Natya-Niketan."

এই অংশটুকু তাঁর প্রবন্ধে উদ্ধৃত করার পর অরবিন্দ পোদ্দার যে মন্তব্য করেছেন সেটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তাৎপর্যপূর্ণও বটে। তিনি বলেছেন, "পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে অভিযানে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল এবং ইংরেজী 'পারসুয়েড' শব্দটির তাৎপর্য যদি স্মরণে রাখি তাহলে মানতে হয়, তিনি সরকার মহলের যুক্তি ও বক্তব্য স্বীকার করে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন। 'চার অধ্যায়' সে সময়ে কোথায়ও অভিনীত হয়েছিল কি হয়নি সেটা বড় কথা নয়, রবীন্দ্রনাথ যে এন্ডারসন প্রশাসনের নিকট নিজেকে গ্রহণীয় করে তুলেছিলেন এটা বাস্তব ঘটনা।" জানা যায় চন্দভ্রাতার মধ্যস্থতায় প্রশাসনের সঙ্গে ঐ সংযোগ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এন্ডারসন প্রশাসনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে 'চার অধ্যায়' রচনায় রবীন্দ্রনাথের ঐ গোপন-প্রয়াস সম্পর্কে আরো কিছু কথা পরে বলবো। তার আগে দেখা যাক রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আদর্শের স্বরূপ কি ছিল, কেন তিনি বিপ্লবীদের সন্ত্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার প্রচেষ্টার ঘোর বিরোধী ছিলেন। সন্ত্রাসীদের কলঙ্কিত ও অধঃপতিত চরিত্রচিত্রণে তিনি সর্বাধিক ভাবে কোন্ পুস্তকের সাহায্য নিয়েছিলেন তাও আলোচনা করবো।

ছয়

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা তখনকার সর্বব্যাপী -কংগ্রেসী আদর্শের ছকের মাধ্যমে গড়ে উঠেনি, তিনি দেশকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণার মধ্য দিয়ে। বহু প্রবন্ধে, আলোচনা-সমালোচনায় ও চিঠিপত্রে তিনি তাঁর সেই আদর্শের কথা ব্যক্ত করেছেন। এখানে ১৯২৭ সালে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁর বক্তব্য থেকে তাঁর সেই আদর্শ সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যায় ঃ "শাসনকর্তাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে যে কিছু বিকৃতি স্বদেশকে উপলব্ধি করিবার পক্ষে বাধা, তাহাই দূর করিবার চেষ্টা বর্তমান ভারতবর্ষের পলিটিক্স। এই উপলক্ষে আমাদের শিক্ষিতমন্ডলী

কখনো বা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগসাধন কখনো বা বিচ্ছেদ ঘোষণার ব্যাপারে নিরতিশয় প্রবৃত্ত। এই চেষ্টার প্রয়োজন যতই থাক ইহারই উত্তেজনা একান্ত হইয়া গুরুতর প্রয়োজন হইতে আমাদের কর্মোদ্যমকে দীর্ঘকাল বিক্ষিপ্ত করিয়াছে।

"আমাদের নিজেদের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে যে সকল গভীর বাধা বর্তমান, যাহার জটিল মূল আমাদের সমাজে, আমাদের সংস্কারে, আমাদের বুদ্ধির বিকারে, শক্তির জড়তায়, চিত্তের ঔদাসীন্যে, পরনির্ভরশীল মনোবৃত্তিতে, বিচারহীন গতানুগতিকতায়, দীর্ঘকালীন অভ্যাসে, তাহাই স্বদেশকে অন্তরে-বাহিরে সত্যভাবে লাভ করিবার সর্বাপেক্ষা প্রবল অন্তরায়। নিজেদের অন্তর্নিহিত এই অপূর্ণতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই বলিয়াই চোরাবালিতে পলিটিকসের ভিত্তি স্থাপন চেষ্টায় আমাদিগকে নানা প্রকার অত্যুক্তি ও আত্মবঞ্চনায় প্রবৃত্ত করিয়াছে। মেকি টাকায় বিধাতার সঙ্গে কারবার চলে না; সিদ্ধির পথকে অবাস্তবের সাহায্যে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করিবার কৌশল অবলম্বন করিলে নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া হয়। দেশের প্রজাসাধারণ দেশকে আপন করিবে এই ইচ্ছাটি সাধারণের মধ্যে যখন সত্য হইবে, গভীর হইবে, ব্যাপক হইবে, এই ইচ্ছার বিচিত্র দুঃখসাধ্য ত্যাগপরায়ণ দায়িত্ববোধ যখন অগভীর আবেগস্রোতে আন্দোলনের বিষয় না হইয়া সুসংযত বিচারবুদ্ধি ও সুশিক্ষিত সাধনার উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন বাহিরের প্রতিকূলতা আমরা উপেক্ষা করিতে পারিব। স্বদেশ সম্বন্ধে কল্যাণফল লাভের কথা যখন ওঠে তখন সাধন ক্ষেত্রের মাটিতে নামিয়া ঢেলা-ভাঙার কথাই ভাবি, একথা মনেও করি না, মুখে বলিতে লজ্জা হয় যে, ফসল ফলিয়াই আছে, কেবল তাহা গোলাজাত করিবার বাহ্য বাধা সরিয়া গেলেই সদ্যই আমাদের পলিটিক্যাল ভোজের আয়োজন পুরা হইবে"।

রবীন্দ্রনাথ J.T. Sunderland- কে লিখিত পত্রের একস্থানে বলেন, "Freedom, like all other best things in life, connot be given from outside but has to be own through the awakened personality of people truly claiming it with intelligence, feeling and active will."

বলাই বাহুল্য যে, এহেন মতাদর্শে বিশ্বাসী কোন লেখক সন্ত্রাসের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াসকে অভিনন্দিত করবেন এটা আশা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ চরমপন্থী রাজনৈতিক তৎপরতার বিরুদ্ধে তাঁর মতামত বহুস্থানে ব্যক্ত করেছেন। 'পথ ও পাথেয়' 'সফলতার উপায়' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি কেন ঐ নীতি পছন্দ করেন না তা বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ যা চান তাকে সমাজ বাস্তবতাবোধ-বিবর্জিত আদর্শ বলাই সমীচীন। তিনি যখন প্রায় দুইশত বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ জাতির উদ্দেশ্যে বলেন, "........ সিদ্ধির পথকে অবাস্তবের সাহায্যে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করিবার কৌশল অবলম্বন করিলে নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া হয়। দেশের প্রজাসাধারণ দেশকে আপন করিবে এই ইচ্ছাটি সাধারণের

মধ্যে যখন সত্য হইবে, গভীর হইবে, ব্যাপক হইবে, এই ইচ্ছার বিচিত্র দুঃখসাধ্য ত্যাগপরায়ণ দায়িত্ববোধ যখন অগভীর আবেগস্রোতে আন্দোলনের বিষয় না হইয়া সুসংযত বিচারবুদ্ধি ও সুশিক্ষিত সাধনার উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন বাহিরের প্রতিকূলতা আমরা উপেক্ষা করিতে পারিব..... ।" —তখন মনে হয়, এ শুধু একজন রোমান্টিক কবির ভাবাদর্শে পরিপুষ্ট রোমান্টিক বচনেরই নামান্তরমাত্র, পরাধীন দেশের কঠিন বাস্তব অবস্থার চাহিদার সঙ্গে এর কোন সম্পর্কই নেই। অকল্পনীয় শোষণ, দারুণ দুঃশাসন ও নিষ্ঠুর দমন-পীড়নের গুরুভারে যে জাতি দীর্ণ-শীর্ণ, সরকারী পরিকল্পনার কারণেই অনক্ষরতা, অজ্ঞানতা, সাম্প্রদায়িকতা ও নানা কুসংস্কারের জটাজালে আবদ্ধ থাকাটা যে জাতির জন্য ললাট লিখনে পরিণত হয়েছে সেই জাতির উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের ঐ হিতোপদেশ যতই শ্রবণলোভন হোক না কেন তা গ্রহণ ও পালন বাস্তবতার দিক থেকে মোটেই সহজসাধ্য ছিলনা। স্বাধীনতা কোন জাতিকে বাইরে থেকে কেউ হাতে তুলে দেয় না, স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়। এ অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা হচ্ছে-'has to be own through the awakended personality of people truly claiming it with interlligence, feeling and active will." অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে একমাত্র জাগ্রত জনতার বুদ্ধিমত্তা, অনুভূতি ও সক্রিয় বা অদম্য ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের দাবীকে ন্যায়সঙ্গত বলা যায়। তাঁর মতে 'মেকি টাকায় বিধাতার সঙ্গে কারবার চলে না; সিদ্ধির পথকে অবাস্তবের সাহায্যে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করিবার কৌশল অবলম্বন করিলে নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া হয়। দেশের প্রজাসাধারণ দেশকে আপন করিবে এই ইচ্ছাটি সাধারণের মধ্যে যখন সত্য হইবে, গভীর হইবে, ব্যাপক হইবে.......... তখন বাহিরের প্রতিকূলতা আমরা উপেক্ষা করিতে পরিব।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা কেন পূরণ হবার নয় তার একটা জবাব অরবিন্দের বক্তব্য থেকে যথার্থভাবেই পাওয়া যায় ঃ "Foreign rule is inorganic and therefore, tends to disintegrate the subjects body-politic by destroying its proper organs and centre of life." আর সেই কারণেই চরমপন্থীরা সহিংস পদ্ধতিতে সিদ্ধি অর্জনের পথকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করার কৌশল গ্রহণ করেন। কিন্তু কংগ্রেসীরা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ইংরেজের সঙ্গে একবার অহিংস সংগ্রাম এবং পুনরায় আপসের মাধ্যমে তাঁদের মনকে জয় করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন। কিন্তু পথ ভিন্ন হলেও তাঁরা একটি জায়গায় একমত পোষণ করেন, আর তা হচ্ছে ইংরেজ সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল না করা পর্যন্ত এদেশের ধনী-দরিদ্রের মানসিক পরিবর্তন ঘটানোর কোন আশাই করা যায় না। গান্ধীর ন্যাসীবাদ (trusteeship) সম্পর্কে নেহেরু যে মন্তব্য করেন, রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতারহিত রাজনৈতিক আদর্শের বেলায়ও সেই মন্তব্যকে একইভাবে প্রয়োগ করা যায় ঃ "All these are pious hopes till we gain power, and the real problem therefore before us is the conquest of power."

পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ দারিদ্র্য ও হতাশাখিন্ন একটা জাতিকে ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করতে হলে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকা দরকার, রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া ঐসব বড় বড় কথা যে শুধু কথার কথা হয়েই থেকে যাবে তা বলাই বাহুল্য। স্বাধীনতা অর্জন করার পর যদি ব্যাপক জনগোষ্ঠী বেঁচে থাকার জন্য পাঁচটি মৌলিক অধিকার না পায় তাহলে তার জন্য আত্মসার নেতাদের নেতৃত্বদানের অক্ষমতাকেই দায়ী করা যায়।

সাত

রবীন্দ্রনাথ দেশের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে কংগ্রেসের ভূমিকাকে সব সময় সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি, মাঝে মাঝে তার কার্যধারার বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব কঠোর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। আগেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ চরমপন্থীদের রাজনৈতিক আদর্শকে শুধু অপছন্দই করেননি, তার বিরুদ্ধে তাঁর অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা ছিল তীব্র। বিপ্লবীদের গুপ্ত হত্যার নিন্দা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন— "........ কিন্তু যেখানে আমাদের স্বদেশের লোক আমাদের যজ্ঞের পবিত্র হুতাশনে পাপ-পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া আমাদের হোমকে নষ্ট করিতেছে, তাহাদিগকে আমরা কেন সমস্ত মনের সহিত ভর্ৎসনা করিবার, তিরস্কৃত করিবার শক্তি অনুভব করিতেছি না। তাহারাই কি আমাদের সকলের চেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রু নহে।

"...... আজ দস্যুবৃত্তি, তস্করতা, অন্যায়, পীড়ন দেশহিতের নাম ধরিয়া চারিদিকে সঞ্চরণ করিতেছে, একি এক মুহূর্তের জন্য তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন যাহারা জানেন আত্মহিত, দেশহিত, লোকহিত, যে কোন হিতসাধনই লক্ষ্য হউক-না কেন, কেবলমাত্র বীর ও ত্যাগী ও তপস্বী তাহারা যথার্থ সঠিক।" রবীন্দ্রনাথ চরমপন্থী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে তাঁর এসব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন ১৯০৮ সালে। এরপর হেমচন্দ্র কানুনগো ১৯২২ সাল থেকে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় চরমপন্থী রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে ধারাবাহিকভাবে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত স্মৃতিচারণমূলক যে লেখা প্রকাশ করেন (১৯২৮ সালের ১লা জুন ঐ লেখা 'বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়)। রবীন্দ্রনাথ তার দ্বারা ভীষণভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁকে আকৃষ্ট করে যাদু গোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' নামক গ্রন্থটিও। প্রথম থেকেই সন্ত্রাসের মাধ্যমে বিপ্লবী রাজনীতির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ, অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা জন্মেছিল, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে তার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বৈপ্লবিক আদর্শের অন্তরালে বিরাজমান অবক্ষয় ও অধঃপতনের মাত্রা তাঁর কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেল হেমচন্দ্র কানুনগো'র বই পড়ে। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে ঐ গ্রন্থটিকে পরিপূর্ণরূপে অভ্রান্ত মনে করার কারণেই দিকভ্রষ্ট চরমপন্থী বিপ্লবীদের নিয়ে আর একখানা সেই

ধরনের উপন্যাস প্রণয়নের প্রেরণা অনুভব করলেন যার মধ্যে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে তাঁর মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত সমস্ত ক্রোধ, অশ্রদ্ধা ও ঘৃণাকে উজাড় করে দিতে পারেন এবং দেখাতে পারেন দেশোদ্ধারের জন্য তাদের অহৈতুকী আত্মাহুতি কতোখানি অন্তঃসারশূন্য ও আত্মপ্রতারণাশ্রয়ী। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায় ' রচনার পশ্চাতে তাঁর নিজস্ব তাগিদের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের তাগিদের যোগসূত্র আবিষ্কৃত হয় মেজর ব্রেনানের পূর্বোল্লিখিত প্রতিবেদনটি পাঠ করার পর, বুঝা যায় রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাস-বিরোধী একটি গ্রন্থ লেখার ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে অত্যন্ত সংগোপনে যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন, অন্তত ব্রেনানের প্রতিবেদনটি পাঠ করে তাই-ই মনে হয়। উপন্যাসটি যাঁরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেছেন তাঁরা একথা নিশ্চয়ই অকপটে স্বীকার করবেন যে, রবীন্দ্রনাথ চরমপন্থী বিপ্লবীদের আত্মাহুতির মহিমা প্রচারের জন্য গ্রন্থটি রচনা করেননি। রবীন্দ্র সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে, বিপ্লবীদের চরিত্রে কালিমালেপন করার উদ্দেশ্যে 'চার অধ্যায়' রচিত হয়নি। যেমন নেপাল মুজমদার বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়' রচনা করেছিলেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের চরিত্রে কালিমালেপনের উদ্দেশ্যে নয়,—এই ভ্রান্ত আত্মঘাতী রাজনীতির ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেবার জন্য। আর সেই সঙ্গে আরেকটা কথাও বলব, হেমচন্দ্রের 'বাংলায় বিপ্লবী প্রচেষ্টা'য় সন্ত্রাসবাদের এবং দল ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যত 'কলঙ্ক লেপন' হয়েছে 'চার অধ্যায়'-এ অতীন্দ্রের জবানিতে তার শতাংশের এক অংশও হয়নি—যদি তা আদৌ 'কলঙ্ক লেপন' হয়।" হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর গ্রন্থে কি লিখেছেন না লিখেছেন সেটা 'চার অধ্যায়' উপন্যাস আলোচনার ক্ষেত্রে ঐভাবে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে টেনে আনাকে অবান্তর বলে মনে করি, আসলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে বিপ্লবীদেরকে কিভাবে দেখেছেন সেইটিই বড় কথা। ঐ গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ খুব সচেতনভাবে অধঃপতিত ও কলঙ্কিত হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এক হিসাবে একথা বললে বোধকরি অত্যুক্তি শোনাবে না যে, এই গ্রন্থের সমুদয় বক্তব্যের একশত ভাগের মধ্যে প্রায় পঁচানব্বই ভাগেই বিপ্লবীদের শোচনীয় পতনের চিত্রকে খুবই উজ্জ্বলভাবে অংকন করা হয়েছে এবং বাকী পাঁচ ভাগে খুবই প্রচ্ছন্নভাবে ইংরেজ সরকারের মৃদু সমালোচনা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত কোন কোন চরিত্রকে, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ অতীনের চরিত্রকে কিভাবে নীচে নামিয়েছেন মাঝে মাঝে প্রসঙ্গক্রমে এক-আধটুকু তা উল্লেখ করেছি। প্রবন্ধের শেষ প্রান্তে প্রধান দু'তিনটি চরিত্রকে সামনে রেখে তার বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখাবো চরিত্রগুলো রসের দিক থেকে যতখানি না শিল্পসম্মত হয়েছে তার চেয়ে রাজনৈতিক তাৎপর্যের দিক থেকে হয়েছে অনেক, অনেক বেশী উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়' লিখতে গিয়ে বিভিন্ন তথ্যের জন্য সর্বাধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন হেমচন্দ্রের উপরোল্লিখিত গ্রন্থের উপর। শান্তিনিকেতনে মাঝে মাঝে 'অনুশীলন' ও

'যুগান্তর' পার্টির কোন কোন নেতা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতেন এমন তথ্যও পাওয়া যায়। পার্টির খবরাখবর তাঁদের কাছ থেকে কিছু কিছু শুনে থাকবেন। এছাড়া চরমপন্থী বিপ্লবীদলের ভেতরের বাস্তব অবস্থা জানার জন্য উল্লেখ করার মতো অন্য কোন সুযোগ তাঁর ছিল না। ভারতের মতো উপনিবেশ থেকে ইংরেজের মতো পরাক্রান্তশালী ও ধুরন্ধর শাসকগোষ্ঠীকে নিয়মানুবর্তিতার সাহায্যে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করা সহজ কাজ ছিল না। একশ' বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় ভারতের ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রথম তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিল বলেই ১৮৫৭ সালে মরণপণ সংকল্প নিয়ে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। মারাঠারা বিশ্বাসঘাতকতা না করলে হয়তো তখনই ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটতো। কিন্তু সে সাফল্য সেদিন অর্জিত না হলেও, সেদিনের অসংখ্য ভারতবাসীর রক্তদান সম্পূর্ণ বৃথা যায়নি। একশ্রেণীর ভারতবাসী ঐ ভয়ংকর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝতে সক্ষম হয়েছিল যে, আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে এদেশ থেকে ইংরেজদেরকে হটানো যাবে না (কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ অবশ্য ঐ আবেদন-নিবেদনের পথই বেছে নিয়েছিল), তাদেরকে হটাতে হলে সাতান্ন সালের মহাবিদ্রোহের আদর্শ অনুযায়ী হিংসার পথ ধরেই অগ্রসর হতে হবে। শুধু কৌশলগত দিক থেকে ঐ আক্রমণ হবে ভিন্ন প্রকারের। রবীন্দ্রনাথ হেমচন্দ্র কানুনগো'র গ্রন্থ পড়ে তার প্রতিটি বাক্যকে বেদবাক্য মনে করে 'চার অধ্যায়'-এর তথ্য হিসেবে কাজে লাগিয়েছিলেন। এক বিধবার ঘরে চুরির ঘটনার যে উল্লেখ হেমচন্দ্র করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেটিকেও ব্যবহার করেছেন অতীনকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু চরমপন্থী বিপ্লবীদের কি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে মহত্তর অন্য কিছুই আশা করার ছিল না ? কেন বিপ্লবীরা সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছিলেন, তাঁদের পরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা কি ছিল, রবীন্দ্রনাথ কি তা জানতেন ? ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, "....... আমাদের বোঝবার সময় এসেছে যে, এদের (ইংরেজ সরকার, আ, জা,) কাছ থেকে আমাদের কিছু আশা করবার নেই—আশা করা আত্মাবমাননা।" চরমপন্থীরা সেই কারণেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছিলেন, ঐ পথ অত্যুত্তম পথ নয় কিন্তু 'আত্মাবমাননা'র গ্লানি যে পথে রয়েছে সেপথ অর্থাৎ আবেদন-নিবেদনের পথ তাঁরা পরিহার করেছিলেন। এঁদের মহত্তর পরিকল্পনার রূপরেখাটি ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় তাঁর 'ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব' গ্রন্থে এভাবে তুলে ধরেছেন ঃ "পৃথিবীর প্রত্যেকটি বিপ্লবের ইতিহাসেই চারটি স্তর বা ধাপ লক্ষ্য করা যায়। (ক) প্রথম হল রাষ্ট্র-প্রতীক বা ব্যক্তিবিশেষ নিধন পর্ব (Stage of individual murder) (খ) দ্বিতীয় হল, বাধ্যতামূলক সম্মুখ-সংঘর্ষ পর্ব (Forced open fight) (গ) তৃতীয় হল, খন্ড অভ্যুত্থান পর্ব (Insurrection) (ঘ) চতুর্থ হল, বিপ্লব (Revolution) বা শেষ পর্ব। ভারতবর্ষের প্রথম পর্বের বিপ্লব ইতিহাসে দেখা যায়—দুঃসাহসী যুবকরা

প্রয়োজনে ব্রিটিশের স্বজন ও তাঁবেদার, তথা ভারতের শত্রুদের একটির পর একটি করে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজকে ভীত করা, দেশবাসীকে ভয়হীন করে তোলা, ইংরেজ শাসনকে না মানা। ১৮৯৭ সালে দামোদর চাপেকারের 'র‍্যান্ড' নিধন থেকে শুরু করে ১৯১২ সালে রাসবিহারীর নেতৃত্বে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের বোমাবর্ষণ পর্যন্ত সকল অ্যাকশনই উল্লিখিত কার্যক্রমের অন্তর্গত। তারপর আসে বিপ্লব-ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্ব।.......যতীন্দ্রনাথ তাঁর চারটি দুর্জয় সঙ্গীসহ স্থির করলেন—ঘরে আর ফিরে যাব না, পালিয়ে পালিয়ে আর ঘুরব না, সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দেব।........ এরই নাম 'ফোর্সড ওপেন ফাইট'। যতীন্দ্রনাথ বিপ্লবী ভারতকে দ্বিতীয় ধাপে তুলে দিলেন। শুরু হল সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দেবার ইতিহাস।

এল ১৯৩০ সাল। এ বছরেই বিপ্লবের তৃতীয় পর্বের সূচনা। সূর্যসেন বিপ্লবী-ভারতকে তৃতীয় ধাপে তুলে দিলেন। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ তাঁর নেতৃত্বে সফল 'ইনসারেকশান' সংঘঠিত করল।

অতঃপর এল চরম মুহূর্ত। ১৯৪১-৪৫ সাল। ভারতীয় বিপ্লবের ইতিহাসের এটাই চতুর্থ বা শেষ পর্ব। বিপ্লবের পূর্বে তুলে দিলেন বিপ্লবী-ভারতকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র। নেতাজীর অভূতপূর্ব নায়কত্বে 'আজাদ হিন্দ' বাহিনীর আবির্ভাব। তাঁরই প্রস্তাবে বিয়াল্লিশের আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ ইত্যাদি সব মিলিয়ে সার্থক 'বিপ্লব' দিল ব্রিটিশকে এমন আঘাত—যার ফলশ্রুতি হল ১৯৪৭ সালে ভারত থেকে ব্রিটিশের বহিষ্কার এবং ভারতের রাষ্ট্রিক-স্বাধীনতা প্রাপ্তি।"

রবীন্দ্রনাথ যদি সন্ত্রাসী তৎপরতাকে এইভাবে সমগ্রতার বাস্তবতায় আগাগোড়া বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়াস পেতেন তাহলে 'চার অধ্যায়'-এর চরিত্রসমূহের স্খলন- পতনকে অতখানি নিম্নগামী করতে গিয়ে অবশ্যই দ্বিধান্বিত হতেন কিন্তু পূর্বপরিকল্পিতভাবে একদেশদর্শী মনোভাব বদ্ধমূল থাকার কারণে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের ইতিহাসকে নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেননি, আর সেই কারণেই কেন্দ্রীয় চরিত্রসহ অন্যান্য চরিত্রকে অধঃপতনের শেষ সীমায় সহজেই নামাতে পেরেছেন। প্রাচীর ঘেরা ও চারদিকের দরজা বন্ধ করা পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল হিন্দুদের নববর্ষ পালনের জন্য উপস্থিত বিশ হাজার মানুষের উপর জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে ১৫০ জন পুলিশ ষোলশত রাউন্ড গুলী ছুঁড়ে (সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী)। চারশত জনকে তাৎক্ষণিকভাবে হত্যা, ১২০০ জনকে আহত, পরবর্তী সময়ে ৫১ জনের ফাঁসি, ৪৬ জনের দ্বীপান্তর ও বাদবাকী সবার ২ থেকে ১৩ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করায় ব্রিটিশ সরকার শুধু ভারতবর্ষে নয়, ইংলন্ডের পার্লামেন্টেও জেনারেল ডায়ারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পৈশাচিক ঐ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য কংগ্রেসী নেতাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন, কিন্তু আন্তরিকতার সঙ্গে কেউই অগ্রসর হয়ে ঐ কাজকে সফল করে তুলতে পারেননি বা

তুলতে চাননি। এমনকি গান্ধীও রবীন্দ্রনাথকে নিরাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সারাদেশের মধ্যে একমাত্র মহান ব্যক্তি যিনি দারুণ ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ চিত্তে ইংরেজ সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করে ঐ নারকীয় ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গ নিয়ে আগেই কিছু কথা বলা হয়েছে, পুনরায় বিষয়টি উত্থাপন করলাম এই কারণে যে, রবীন্দ্রনাথ ইংলন্ডের পার্লামেন্টে ঐ বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ইংরেজ পুরুষ ও নারী উভয়ের সহর্ষ-প্রতিক্রিয়া দেখে এতই হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন যা তাঁর কল্পনারও বাইরে ছিল। পুনরুক্তি হলেও রবীন্দ্রনাথের সেই বক্তব্য এখানে আর একবার স্মরণ করছি ঃ "পাঞ্জাবে এরা যে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল, মনে করেছিলুম সেটা আকস্মিক এবং সাময়িক আতঙ্ক থেকে তার উৎপত্তি। কিন্তু এখানে (বিলেতে) পার্লামেন্টে সে সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছিল তার থেকে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছি এই প্রচন্ডতা এদের মজ্জায় নিহিত, তাদের রক্তে বহমান। ডায়ারের কীর্তিকে এরা কেউ কেউ 'Splendid brutality' বলে প্রশংসা করেছে। এই উপলক্ষে এদের মেয়েদের মধ্যেও রক্তলোলুপ হিংস্রতার পরিচয় পেয়ে আমি বিস্মিত হয়ে গেছি। আমাদের বোঝবার সময় এসেছে যে, এদের কাছ থেকে আমাদের কিছু আশা করবার নেই—আশা করা আত্মাবমাননা"। রক্তলোলুপ ঐ হিংস্রতা যাদের মজ্জায় নিহিত রয়েছে তাদের কাছ থেকে দেশের স্বাধীনতা চেয়ে আনা যায় না, ছিনিয়ে আনা যায়, আর ছিনিয়ে আনতে গেলে সশস্ত্র সংগ্রামের বিকল্প কোন পথ খোলা থাকে না। চরমপন্থী বিপ্লবীরা ইংরেজ নিধনযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিজেদের মূল্যবান জীবনের বিনিময়ে, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল 'ভদ্র সম্বন্ধের' দ্বারা, আবেদন নিবেদনের দ্বারা কিংবা 'ভাগ্যচক্রের' দ্বারা রক্তলোলুপ হিংস্র ইংরেজ সরকারের উৎসাদন সম্ভব নয়। ইংরেজ সরকার স্বেচ্ছায় ভারত ছাড়েনি, তাকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল এবং এর পশ্চাতে সশস্ত্র সংগ্রামীদের আত্মাহুতি যে কতোখানি অবদান রেখেছে তা যারা অস্বীকার করেন তাঁরা ইতিহাসকেই অস্বীকার করেন। যাদের কাছ থেকে আশা করার কিছুই নাই, আশা করা আত্মাবমাননা বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন তাদের সঙ্গে 'চার অধ্যায়'-এর মতো একখানা বিপ্লব-বিরোধী উপন্যাস রচনার সংযোগ-সূত্র খুঁজে পেয়ে আমরা হতবাক না হয়ে পারি না। অতীনের অধঃপতিত চরিত্র তুলে ধরতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজে একজন বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব বিস্মৃত হয়েছেন। সশস্ত্র সংগ্রামের মহীয়ান ও গরীয়ান কোন দিকই রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করলো না। তার কোন ছায়াপাত তিনি ঐ উপন্যাসে ঘটাতে পারলেন না। একদেশদর্শিতার কালো ছায়া সমগ্র উপন্যাসটির উপর কালিমা লেপন করে দিয়েছে আর তাতেই স্পষ্ট হয় এ গ্রন্থ একজন সার্থক ও সফল ঔপন্যাসিকের আন্তর্তাগিদে ততটা রচিত হয়নি যতটা হয়েছে এন্ডারসন প্রশাসনকে খুশী করার তাগিদে।

বিনা উস্কানীতে পলায়নের পথ বন্ধ রেখে বিশ হাজার নিরীহ মানুষের উপর গুলী চালিয়ে হত্যা করার ঘটনাকে যে শাসকগোষ্ঠী তাদের দেশের পার্লামেন্টে সগর্বে ও সোল্লাসে 'Splendid brutality বলে আখ্যায়িত করে, সেই শাসকগোষ্ঠীর উৎসাদনের জন্য 'brutality'-র পথ বেছে নেওয়া ছাড়া আর কোন্ পথ খোলা ছিল? রবীন্দ্রনাথ ও কংগ্রেসের মধ্যমণি গান্ধী স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য কোন্ পথের সন্ধান দিয়েছিলেন? ভারতবাসীর মনের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ঘটানোর জন্য তাঁরা শুধু বড় বড় বুলি আওড়িয়েছেন, বাস্তব-ধর্মী কোন কর্মপন্থা তাঁরা গ্রহণ করতে পারেননি। নেপাল মজুমদার যর্থাথই বলেছেন, 'ভারতের কোটি কোটি অশিক্ষিত জনসাধারণকে কিভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে সংগঠিত এবং সেই সংগ্রামকে চূড়ান্ত জয়যুক্ত করা যায়, সেই সম্পর্কে প্রচলিত রাজনীতিক নীতি-কৌশল কিংবা দেশ- বিদেশের ইতিহাসের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লইতে গান্ধীজী বা রবীন্দ্রনাথ—উভয়েই নারাজ। এই দুই মহান ভাবুক সমগ্র মানুষের হৃদয় ও চিন্তা-চেতনায় কি করিয়া একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লব ঘটানো যায়, তাহারই চিন্তায় বিভোর।' রক্ত না ঝরিয়ে, দলে দলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত না হয়ে সাম্রাজ্যবাদী কোন সরকারকে হটিয়ে কোন দেশে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে—বিশ্বের ইতিহাসে এমন কোন ঘটনার নজির নেই। রক্তাক্ত সেই পথ মাড়িয়ে স্বাধীনতার ঝান্ডাকে উঁচু করে তুলে ধরে জীবিতরা তার সুফল ভোগ করে। বঙ্গদেশ তথা ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবীদের অগ্রযাত্রায় সেই আদর্শই কাজ করেছিল। নেতৃত্বে কখনো কখনো দুর্বলতা ছিল, কর্মীদের কর্ম সম্পাদনে কিছু ভুল-ত্রুটি ছিল, দলীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে কখনো কখনো ভুল বুঝাবুঝি হওয়টাও স্বাভাবিক ছিল কিন্তু কোন লেখক সামগ্রিকভাবে তার মহীয়ান ও গরীয়ান ভূমিকাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীদের প্রয়াস ও আশা- আকাঙ্ক্ষাকে 'বিধবার ঘটি চুরি'র পর্যায়ে যদি নামিয়ে আনেন তাহলে চরমপন্থী বিপ্লবীদের সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতাই শুধু প্রকাশ পায় না, এন্ডারসন প্রশাসনের সঙ্গে তাঁর সংসৃষ্টি ও সংসক্তির ব্যাপারটাও প্রমাণ হিসাবে সমর্থিত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়'-এর নাট্যরূপ দিয়েছেন কিংবা দেননি অথবা তা দেশের বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত হয়েছে কিংবা হয়নি সে ইতিহাস জানার কোন প্রয়োজনই নেই, রবীন্দ্রনাথ যে ইংরেজ প্রশাসনের সঙ্গে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসকে নাট্যরূপ দেবার জন্য আলাপ-আলোচনা চালিয়েছিলেন সেইটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এ সংযোগ যে খুব সংগোপনে সাধিত হয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথের নিজের ও তাঁর জীবনীকারদের নীরবতা থেকেই অনুমান করা যায়। সংগোপনে সাধিত ঐ সংযোগ আমাদেরকে হতবাক করে দেয় এই কারণে যে, উপন্যাসটি লিখিত হবার অল্প কয়েক মাস আগে অর্থাৎ ১৯৩৩ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে প্রকাশিত 'কালান্তর' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইংরেজ সরকারের সমালোচনা করে লিখেছেন, 'ক্রমে ক্রমে দেখা গেল য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয় মন্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার

জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে।' এ ধরনের ইংরেজ বিদ্বেষমূলক আরো সব কথা বলার পর রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস লিখেন কেমন করে? অরবিন্দ পোদ্দার তাঁর প্রবন্ধে খুব অবাক হয়ে সেই প্রশ্নই তুলেছেন ঃ 'মাত্র কয়েক মাস। এর মধ্যেই দৃষ্টিভঙ্গির ও প্রত্যয়ের এমন কল্পনাতীত রূপান্তর কি করে ঘটল তার কোন যুক্তি খুঁজে পাই না ; বুঝতে পারি না, কি করে কালান্তরের অভিসম্পাত চার অধ্যায়ের আশীর্বাদে পরিণত হলো। বুঝতে অসুবিধা হয় আরও এ কারণে যে, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ রোমা রোঁলা প্রভৃতির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। এই পটভূমিতে তাঁর রূপান্তর তাই অতিশয় বিভ্রান্তিকর'।

আট

১৯৩৫ সালে ২ মার্চ 'দেশ' পত্রিকায় শ্রী মেঘনাদ গুপ্ত (অনেকের ধারণা এটি কারও ছদ্মনাম) 'চার অধ্যায়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধের একস্থানে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান একটি মন্তব্য করেছেন, "মিস মেয়ো যেমন ভারতবর্ষে এসে নর্দমার কাদা ঘেঁটে গেছেন কবিও তেমনি গণ-আন্দোলনের আবর্জনার দিকটাই বেশী করে দেখেছেন।" 'চার অধ্যায়' সম্পর্কে একটিমাত্র বাক্যে এর চেয়ে মোক্ষম কথা আর হয় না। ঐ প্রবন্ধে মেঘনাদ গুপ্তের অন্যান্য বক্তব্যের কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ "বিভীষিকা পন্থার বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি তিনি দেখিয়েছেন সে সকলকে স্বীকার করে নিয়েও আমরা বলবো, অকম্পিত স্বরে বলবো—তাঁর লেখার অনেক জায়গায় অনুদারতা প্রকাশ পেয়েছে—তাঁর আঘাত অনেক স্থানে সেই জন্য অশোভন হয়ে উঠেছে। যা অনুদার এবং যা অশোভন— কবি হয়ে তাকে তিনি প্রশ্রয় দিলেন কেমন করে? ..... তিনি আঘাত করেছেন এমনসব স্থানে যেখানে আঘাত দেবার তাঁর ন্যায়-সঙ্গত অধিকারই নেই।.... বিভীষিকা পন্থাকে আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি অতীনের মুখ দিয়ে এমনসব কথা বলেছেন যার মধ্যে সত্যের অপলাপ ঘটেছে।........ চার অধ্যায়ে কবির আঘাত হয়েছে দু'মুখো সাপের মত। তার একটা মুখ কামড়িয়েছে বিভীষিকা-পন্থার গোপন আন্দোলনকে—আর একটা মুখ বিষ উদগীর্ণ করেছে গান্ধী আন্দোলনের উপর।....." সিডিশন কমিটি রিপোর্ট, ১৯১৮ এবং 'টেরোরিজম ইন ইন্ডিয়া, ১৯১৭-১৯৩৬' পড়লে অনুশীলন সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব শপথ নিতে হতো এবং কোন ধরনের মেয়েরা কোন্ উদ্দেশ্যে দলে যোগদান করতো তা জানা যায়। ঐতিহাসিক দিক থেকে বিভিন্ন ক্যাডারভুক্ত চরমপন্থী বিপ্লবীদের, বিশেষ করে ইন্দ্রনাথের মতো 'আত্মম্ভরিতায় আকাশচুম্বী' কোন দলনেতার পরিচয় পাওয়া যায় না। অরবিন্দ পোদ্দার তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, "একটি বিপ্লবী

গোষ্ঠীর অধিনায়ক হিসেবে ইন্দ্রনাথের চরিত্র সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন। তাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে এক ভয়ংকর আত্মকেন্দ্রিক, উচ্চকাঙক্ষায় স্ফীত চিত্ত, বিক্ষোভে অধীর, নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নায়করূপে। .... যে চরিত্র মাহাত্ম্য মানুষকে মাতৃভূমির মুক্তির সন্ধানে আত্মাৎসর্গের পথে টেনে নিয়ে যায় তার কোন স্বাক্ষর এ চরিত্রে নেই। যেমন নেই কোন মানবতার স্বীকৃতি অথবা সামাজিক সম্পর্কের বোধ। ইন্দ্রনাথ ব্যক্তিক ইচ্ছার রূপায়ণে উদ্‌ভ্রান্ত এক পথিক; সমাজ-রূপান্তরের ইতিহাস-নির্দিষ্ট ভাবনা তার চিন্তায় একান্তই অনুপস্থিত।

সুতরাং বাংলার বৈপ্লবিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তার কোনই সামঞ্জস্য নেই। তাঁরা ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া। রাজনৈতিক নেতারূপে বিপ্লবী গোষ্ঠীর অধিনায়কদের কারও কারও প্রত্যাশিত ব্যক্তিত্ব ও দূরবিস্তারী চিন্তামননের অভাব ছিল সম্ভবত, কিন্তু তাঁরা কেউই ইন্দ্রনাথের মত নৈরাশ্যপীড়িত আত্মভাবনায় নিমগ্ন ছিলেন না। পক্ষান্তরে তাঁরা ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদের সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ, তাঁদের অধ্যবসায় ঐকান্তিকতা এবং আত্মত্যাগ তাঁদের শত্রুদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের ইন্দ্রনাথ অজ্ঞানতাপ্রসূত এক প্রগলভ বিকৃতিমাত্র।" আত্মম্ভরিতায় স্ফীত ও আত্মকেন্দ্রিকতায় বিচ্ছিন্ন মানসিকতার অধিকারী এই অধিনায়কের কিছু দর্পিত উক্তি ঃ "প্রকান্ড কর্মের ক্ষেত্রে আমি কর্তা, এইখানেই আমাকে মানায় বলেই আমি আছি,—এখানে হারও বড়ো জিতও বড়ো।....আমার ডাক শুনে কতো মানুষের মত মানুষ মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে চারিদিকে এসে জুটল; সে তো তুমি দেখতে পাচ্ছ কানাই। কেন ? আমি ডাকতে পারি বলেই। সেই কথাটা ভালো করে জেনে এবং জানিয়ে যাব, তারপরে যা হয় হোক।.....ঐতিহাসিক মহাকাব্যের সমাপ্তি হতে পারে পরাজয়ের মহাশ্মশানে। কিন্তু মহাকাব্য তো বটে। গোলামি-চাপা এই খর্ব মনুষ্যত্বের দেশে মরার মতো মরতে পারাও যে একটা সুযোগ।" সীমাহীন এমন আত্মম্ভরিতা একজন দলনায়ককে মানায় না, রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব কল্পনায় এ-বৈশিষ্ট্য ইন্দ্রনাথের উপর আরোপ করেছেন। এহেন দলপতিকে ইতিহাস সমর্থিতও বলা চলে না। এইরকম আত্মকেন্দ্রিক, আত্মম্ভরিতায় স্ফীত, ও প্রগলভ দলনায়ক দ্বারা যদি চরমপন্থীদের বৈপ্লবিক ইতিহাস পরিচালিত হতো তা হলে ১৮৯৭ সালে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় দ্বারা র‍্যান্ড ও আয়ার্স্ট থেকে শুরু করে ১৯৩৫ সালের ১৫ই জুন রোহিনী বড়ুয়া কর্তৃক আসাদ আলী দারোগা হত্যা এবং এর মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে অসংখ্য ইংরেজকে হত্যা করা, বিশেষ করে ঐ অপরাধের জন্য ফাঁসির রজ্জু গলায় তুলে নিতে হবে জেনেও ঐ কাজে ব্রতী হওয়া কখনোই সম্ভব ছিল না। দলনায়কের নেতৃত্ব সর্বদাই নিরঙ্কুশভাবে ত্রুটিমুক্ত ছিল এমন দাবী অবশ্যই করা সমীচীন নয়; কিন্তু তাই বলে ইন্দ্রনাথের মত বাক্যবাগীশ ও আত্মকেন্দ্রিক নেতা শুধু 'নৈরাশ্যপীড়িত আত্মভাবনা'তেই মশগুলই ছিলেন না, ইংরেজদের প্রতিও যাঁর শ্রদ্ধা ছিল অবিচল, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁর মতো মানুষকে দলনায়কের মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারটিকে

স্বকপোলকল্পিতই বলা চলে। ইন্দ্রনাথের ইংরেজ-তোষণের কিছু কিছু বচন পঞ্চম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত করা হয়েছে। ইন্দ্রনাথের ইংরেজ-তোষণের ঐসব বক্তব্য সম্পর্কে অরবিন্দ পোদ্দার মন্তব্য করেছেন, "এক অদ্ভুত বিভ্রান্তিকর বিবৃতি, তাও এমন এক মানুষের মুখ থেকে নির্গত যে একটি বিপ্লবী গোষ্ঠীর নায়ক এবং ইংরেজদেরকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়নের জন্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত। বস্তুত কোন বিপ্লবী অধিনায়ক সংগঠক অথবা কর্মী একটি সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য রাষ্ট্র সম্পর্কে এই ধরনের বস্তুবাদ অন্তরে পোষণ করেনি কখনও, কারণ তা তাঁদের বৈপ্লবিক আদর্শ অস্বীকারেরই নামান্তর। এ অভিমত রবীন্দ্রনাথের একান্ত ব্যক্তিগত অভিমত, যা তিনি চিন্তামননে বিপর্যস্ত ও নৈরাশ্যের বোধ উদ্‌ভ্রান্ত নায়ক ইন্দ্রনাথেরই মস্তিস্কে সঞ্চালিত করেছেন। .... বিপ্লবী নায়করূপে চিত্রিত একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রশংসা করার অর্থ বিপ্লবী আন্দোলনকে তার সংগ্রামশীলতার ঐশ্বর্য ও আত্মত্যাগের মহিমা থেকে বঞ্চিত করা এবং পরোক্ষে, তাঁদের হেয় প্রতিপন্ন করা।" আত্মকর্তৃত্বের অহমিকায় অন্ধ এবং সদম্ভ প্রগলভতায় উচ্চকণ্ঠ ইন্দ্রনাথের ন্যায় বিপ্লবী অধিনায়ক ১৯৩০ সালের পর থেকে ইংরেজ সরকার যে- ভারতবর্ষে নাৎসী জার্মানীর মতো বীভৎস অত্যাচার, অনাচার ও বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে (যার কারণে রাসেলও দারুণভাবে বিচলিত হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন) সে সংবাদটুকুও রাখেন না বা রাখতে চান না, আর সেই কারণেই একমাত্র ইন্দ্রনাথের পক্ষেই নির্দ্বিধায় বলা সহজ হয়-"যত পশ্চিমী জাত আছে তার মধ্যে ওরা সব চেয়ে বড়ো জাত। রিপুর তাড়ায় ওরা যে মারতে পারে না তা নয় কিন্তু পুরোপুরি পারে না-লজ্জা পায়।...... ষোলো আনা মারের চোটে আমাদের মেরুদন্ড ওরা চিরকালের মতো গুঁড়িয়ে দিতে পারত। সেটা ওরা পারলে না। আমি ওদের মনুষ্যত্বকে বাহাদুরি দিই।.... এত বেশি বিদেশের বোঝা আর কোন জাতের ঘাড়ে নেই, এতে ওদের স্বভাব যাচ্ছে নষ্ট হয়ে।" এমন ইংরেজভক্ত বিপ্লবী অধিনায়কের চেলা হিসেবে অন্তু ও এলার পরিণাম অধঃপতনের শেষ সীমানা স্পর্শ করবে এটা তো দুয়ে দুয়ে চারের মতোই সত্য কথা। কাব্যিক সুঘ্রাণ মিশ্রিত ঐন্দ্রজালিক বাণীর বন্যার তোড়ে রবীন্দ্রনাথ সুন্দরী ও সুমার্জিত, বচনে সংযত কিন্তু স্পষ্টভাষী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে পরিপুষ্ট এলার আকর্ষণে দলে আগত অন্তুকে এমনভাবে পতনের শেষ সোপানে নামালেন যা দেখে মনেই হবে না ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ সরকারের মূলোৎপাটনের জন্য চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লচাকী, ভগৎসিং, শুকদেব, বিনয়, বাদল, দীনেশ, রাজগুরু, চন্দ্রশেখর, যতীন সূর্যসেন, সত্যেন, রাজেন প্রমুখ বিপ্লবীরা হাসতে হাসতে ফাঁসির রজ্জু গলায় তুলে নিয়েছিল। বিপ্লবী দলে কঠিন আদর্শের প্রতি যার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ও আনুগত্য নেই ঐতিহাসিক দিক থেকে তার মতো ব্যক্তির পক্ষে একজন প্রধান কর্মী হিসেবে দলে ঠাঁই পাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বিপ্লবী দলের প্রধান কর্মী কি একথা বলতে পারে-"হ্যাঁ, তোমাদের স্বদেশী কর্তব্যের জগন্নাথের রথ। মন্ত্রদাতা বললেন, সকলে মিলে একখানা

মোটা দড়ি কাঁধে নিয়ে টানতে থাকো দুই চক্ষু বুজে — এই একমাত্র কাজ। হাজার হাজার ছেলে কোমর বেঁধে ধরল দড়ি। কত পড়ল চাকার তলায়, কত হল চিরজন্মের মতো পঙ্গু। এমন সময় লাগল মন্ত্র উলটোরথের যাত্রায়। ফিরল পথ। যাদের হাড় ভেঙেছে তাদের হাড় জোড়া লাগবে না। পঙ্গুর দলকে ঝাঁটিয়ে ফেললে পথের ধুলোর গাদায়। আপন শক্তির, "পরে বিশ্বাসকে গোড়াতেই এমনি করে ঘুচিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, সবাই সরকারী পুতুলের ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করতে দিতে স্পর্ধা করেই রাজি হল। সর্দারের দড়ির টানে সবাই যখন একই নাচ নাচতে শুরু করলে, আশ্চর্য হয়ে ভাবলে— একেই বলে শক্তির নাচ। নাচনওয়ালারা যেই একটু আলগা দেয়, বাতিল হয়ে যায় হাজার হাজার মানুষ-পুতুল।" রবীন্দ্রভাবনায় গুপ্ত সমিতিসমূহের সুনির্দিষ্ট শপথবাক্য পাঠ ও মন্ত্রোচ্চারণের হলো এমনই শোচনীয় পরিণাম! অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য ইন্দ্রনাথ ও ইন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য অন্তুর এই পরিণাম সুপরিকল্পিত। তাকে পতনের শেষ সীমায় নামাবার জন্য এ হচ্ছে হেতু প্রদর্শনের গৌরচন্দ্রিকা মাত্র। এরপর অন্তুর তর তর করে একটির পর একটি সোপান পার হয়ে নীচে নেমে যাওয়াকে ঠেকায় কে? কারণ নামিয়ে নেবার জন্য সেখানে আছেন বিপ্লব-বিরোধী-রবীন্দ্রনাথ, আছেন ইংরেজ-স্তাবক-ইন্দ্রনাথ। অতীনের চিন্তায় হতাশার কালো ছায়া কিভাবে তার বিপ্লবী প্রয়াসকে ম্লান করে দিয়েছে–"অতীন চুপ করে বসে রইল। তাকিয়ে দেখতে লাগল অন্তরের দিকে। অকালে এসে পড়ল তার জীবনের শেষ অঙ্ক, যবনিকা আসন্নপতনমুখী, দীপ নিবে এসেছে।....... একদিন হঠাৎ পথের একটা বাঁকের মুখে সৌন্দর্যের যে আশ্চর্য দান নিয়ে ভাগ্যলক্ষ্মী তার সামনে দাঁড়িয়েছিল সে যেন অলৌকিক; তেমন অপরিসীম ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষ হবে ওর জীবনে, সে-কথা এর আগে ও কখনোই সম্ভব বলে ভাবতে পারেনি, কেবল তার কল্পরূপ দেখেছে কাব্যে ইতিহাসে; বারেবারে মনে হয়েছে দান্তে বিয়াত্রিচে নূতন জন্ম নিল ওদের দু'জনের মধ্যে। সেই ঐতিহাসিক প্রেরণা ওর মনের ভিতরে কথা কয়েছে, দান্তের মতোই রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের আবর্তের মধ্যে অতীন পড়েছিল ঝাঁপ দিয়ে, কিন্তু তার সত্য কোথায়, বীর্য কোথায়, গৌরব কোথায়, দেখতে দেখতে অনিবার্য বেগে যে পাঁকের মধ্যে ওকে টেনে নিয়ে এল সেই মুখোশপরা চুরি ডাকাতি-খুনোখুনির অন্ধকারে ইতিহাসের আলোকস্তম্ভ কখনো উঠবে না। আত্মার সর্বনাশ ঘটিয়ে অবশেষে আজ সে দেখছে কোন যথার্থ ফল নেই এতে, নিঃসংশয় পরাভব সামনে। পরাভবেরও মূল্য আছে কিন্তু আত্মার পরাভবের নয় যে-পরাভব টেনে আনল গোপনচারী বীভৎস বিভীষিকায়, যার অর্থ নেই, যার অন্ত নেই।" এমন তিক্ত উপলব্ধির শোচনীয় পরিণাম হিসেবে ইন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য অতীনের মতো নৈরাশ্যপীড়িত কর্মীর মুখ থেকে যখন আমরা শুনতে পাই 'আগাগোড়া কলঙ্কে কালো হয়ে পরাভবের শেষ সীমানায় অখ্যাতির অন্ধকারে মিশিয়ে যাব আমরা'।— তখন অবাক হবার কিছুই থাকে না। রবীন্দ্রনাথ চরমপন্থী বিপ্লবের মাহাত্ম্যকে কালিমালিপ্ত করার জন্য প্রধানভাবে কয়েকটি চরিত্রকে বেছে নিয়েছেন।

ইন্দ্রনাথ ও অন্তু তার মধ্যে প্রধান দুটি চরিত্র যাদের কলঙ্ক-কালিমায় ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক-সংগ্রামের ইতিহাসকে ম্লান করার নগ্ন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এলার অধঃপতনও তার সঙ্গে কতকটা যুক্ত হয়েছে। অবশ্য এলা শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই অধঃপতনের কবল থেকে নিজেকে সগৌরবে রক্ষা করার কৃতিত্বও অনেকখানি অর্জন করেছে।

অপূর্ব সুন্দরী এলা নামের মেয়েটির 'দীপ্তি দেখে' একদিন দেশের ছাত্ররা যাঁকে 'রাজচক্রবর্তীর মতো মানত' যাঁর 'দৃষ্টিতে কঠিন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ঠোঁটে অবিচলিত সংকল্প এবং প্রভুত্বের গৌরব' লক্ষ্য করা যেতো সেই কঠিন-পুরুষ ইন্দ্রনাথও চমকে উঠে বলেছিলেন, "তুমি নবযুগের দূতী, নবযুগের আহবান তোমার মধ্যে!" "সংসারের বন্ধনে কোনদিন বদ্ধ হবে না এই প্রতিজ্ঞা তোমাকে স্বীকার করতে হবে। তুমি সমাজের নও, তুমি দেশের।" এলা ইন্দ্রনাথেকে বলেছিল, "এই প্রতিজ্ঞাই আমার।" কিন্তু প্রথম অধ্যায় শেষ না হতেই বিপ্লবী কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে গেল এলার পথ বিপ্লবের পথ নয়। ইন্দ্রনাথ এলাকে প্রশ্ন করেন–'তুমি অতীনকে ভালোবাস?' এলা এর কোন উত্তর দেয় না। তখন ইন্দ্রনাথ এলাকে বলেন, 'যদি কখনো সে আমাদের সকলকে বিপদে ফেলে, তাকে নিজের হাতে মারতে পার না?' কঠিনতম এহেন প্রশ্নের সরাসরি কোন জবাব না দিয়ে এলা এক পর্যায়ে স্বীকার করে— 'আমি নিশ্চিত বলছি, আপনি আমাকে ভুল করে বেছে নিয়েছেন।' ইন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি নিশ্চিত জানি আমি ভুল করিনি।' এলা প্রত্যুত্তরে বললো, 'মাস্টার মশায় আপনার পায়ে পড়ি, দিন অতীনকে নিষ্কৃতি।' তখন ইন্দ্রনাথ, অধিনায়ক ইন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি নিষ্কৃতি দেবার কে? ও বাঁধা পড়েছে নিজেরই সংকল্পের বন্ধনে। ওর মন থেকে দ্বিধা কোন কালেই মিটবে না, রুচিতে ঘা লাগবে প্রতিমুহূর্তে, তবু ওর আত্মসম্মান ওকে নিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত।' এখানে একটা কথা স্মরণ করা উচিত যে, গুপ্ত সমিতিসমূহে যেসব শপথবাক্য জীবনের বিনিময়ে পাঠ করানো হতো তাতে নরনারীর প্রেম, মায়া-মমতা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রথম পর্যায় থেকে বিপ্লবী আদর্শকে লালন ও অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে এলার চিত্তচাঞ্চল্য ও নড়বড়ে মতিগতি, অন্তুর সঙ্গে প্রবল বন্যার মতো প্রেমের জলোচ্ছ্বাসে অনির্দেশ্যভাবে ভেসে যাওয়ার রোমান্টিক আকৃতি, এর কোন কিছুই গুপ্ত সমিতির আদর্শে দীক্ষাপ্রাপ্ত দৃঢ়চেতা কোন নারী-কর্মীর বিপ্লবী আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়—এ চরিত্রও রবীন্দ্রনাথের স্বকপোলকল্পিত। বিধবার গৃহে ডাকাতির খবর এলা পুলিশী-নির্যাতনে ফাঁস করে দেবে এই অভিশংকায় অধিনায়ক ইন্দ্রনাথের ইঙ্গিতে এলাকে হত্যা করার দায়িত্ব বর্তায় অতীনের উপর। এলার প্রতি এহেন অনাস্থা বৈপ্লবিক ঘটনাধারার বাস্তবতার সমগ্রতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অরবিন্দ পোদ্দার তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থে সেই কারণেই বলেছেন, "বাংলার বিপ্লব সাধনার ইতিহাসের সাক্ষ্য কিন্তু অন্য প্রকার, সেখানে দেখা যায়, চরম বিপদ এবং মৃত্যুর আশঙ্কার মধ্যেও মহিলা কমরেডদের দুঃসাহসিক কর্তব্য সম্পাদনের

দায়িত্বে প্রেরণ করা হয়েছে। কয়েকটি উজ্জ্বল নাম স্মরণ করা যাক–চট্টগ্রামের প্রীতিলতা ওয়াদেদার ও কল্পনা মিত্র, কুমিল্লার শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী যাঁরা জেলা শাসক ষ্টিভেনসকে হত্যা করেছিলেন, বীণা দাস যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তন উৎসবে গভর্নর স্যার ষ্ট্যানলি জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়েছিলেন এবং উজ্জ্বল মজুমদার যিনি লেবং-এ এন্ডারসন হত্যা প্রচেষ্টায় জড়িত ছিলেন। তাঁরা সকলেই স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন, তাঁদের প্রতি কারও আস্থার অভাব ঘটেনি। স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়, বিপ্লবী-মানসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যথার্থ পরিচয় ছিল না; সে জন্যই 'চার অধ্যায়'-এর উপসংহারকে রহস্যে উৎকণ্ঠায় আচ্ছাদিত করার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর কল্পনার উদ্ভাবনী শক্তির উপর নির্ভর করেছেন।"

দলের কর্মী বটু বিধবার গৃহে চুরির অপরাধে অতীনের নাম পুলিশের কাছে ফাঁস করে দিয়েছে। বটুর সেই প্রতারণাশ্রয়ী ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে এলাকে ট্রাজিক পরিণামের দিকে ঠেলে দিলেন তা দেখা যাক ঃ

"অতীন –একটা খবর পেয়েছি আমরা।

এলা– কী খবর ?

অতীন-আজ ভোর রাত্রে পুলিশ আসবে আমাকে ধরতে।

এলা– নিশ্চিত জানতুম একদিন পুলিশ তোমাকে ধরতে আসছে।

অতীন– কেমন করে জানলে ?

এলা–কাল বটুর চিঠি পেয়েছি, সে খবর দিয়েছে পুলিশ আমাকে ধরবে, লিখেছে–সে এখনো আমাকে বাঁচাতে পারে।

অতীন– কী উপায়ে ?

এলা– বলছে, যদি আমি তাকে বিয়ে করি তা হলে সে আমার জামিন হয়ে আমার দায় গ্রহণ করবে।

অন্ধকার হয়ে উঠল অতীনের মুখ, জিজ্ঞাসা করলে, কী জবাব দিলে তুমি ?"

এলা– আমি সেই চিঠির উপর কেবল লিখে দিলুম পিশাচ। আর কিছু নয়।

অতীন– খবর পেয়েছি , সেই বটুই আসবে কাল পুলিশকে নিয়ে। তোমার সম্মতি পেলেই বাঘের সঙ্গে রফা করে তোমাকে কুমিরের গর্তে আশ্রয় দেবার হিতব্রতে সে উঠে–পড়ে লাগবে। তার হৃদয় কোমল।

এলা অতীনের পা জড়িয়ে ধরে বললে, "মারো আমাকে অন্তু নিজের হাতে। তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার কিছু হতে পারে না।" মেঝের থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অতীনকে বার বার চুমো খেয়ে বললে, "মারো এইবার মারো।" ছিঁড়ে ফেললে বুকের জামা।"

উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে বলে একটা কথা আছে, এ কল্প-কাহিনী যেন কতকটা সেই রকমের। দলের অনেক কথা এলার জানা আছে, পুলিশী-পীড়নে যদি তা বেরিয়ে পড়ে তাই প্রতি বছর যে সব দেশ ভাইদের কপালে সে ভাইফোঁটা দিয়েছে তাদেরই

চাপে অধিনায়ক ইন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন যে, পুলিশ পৌঁছানোর আগেই এলাকে অন্য কোথাও নয় একেবারে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। আর দায়িত্বটা দেয়া হয়েছে অতীনের উপর। এলা দলের অন্যায় এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে খুব সঙ্গতভাবেই দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়েছে। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দন্ডপ্রাপ্য ছিল বটুর কিন্তু তা না হয়ে দন্ডিত হলো সবার প্রিয় নিরপরাধ এলা। তাও আবার প্রাণদন্ড! রবীন্দ্রনাথ কি হেমচন্দ্র কানুনগো'র বই থেকে এমনতর হাস্যরস ও অযৌক্তিক ঘটনার নিদর্শন দু'একটা খুঁজে পেয়ে তা যুৎসইভাবে কাজে লাগিয়েছেন?

আসলে অরবিন্দ পোদ্দার যথার্থই বলেছেন 'বিপ্লবী-মানসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যথার্থ পরিচয় ছিল না, আর সেই কারণেই বিপ্লবী আদর্শকে তিনি যতদূর সম্ভব সন্দেহ ও সংশয়ের চোখে দেখেছেন এবং ঐ অজ্ঞতা ও বিশ্বাসহীনতাই তাঁকে বিপ্লবীদের নিয়ে গল্প ফাঁদতে গিয়ে ঐতিহাসিক বাস্তবতার চেয়ে কল্পলোকের দিকে টেনেছিল খুব বেশী করে। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৫ সালের ১২ই এপ্রিল অমিয় চক্রবর্তীকে এক পত্রে লেখেন ঃ "চার অধ্যায়ের যে দিকটা আমাদের পাঠককে ভোলায় সে ওর কবিতার অংশ। ওর ভাষায় লাগিয়েছি যাদু। সেইটের ভিতর দিয়ে তারা যে জিনিসটা পায় সেটা ঠিক খাঁটি গদ্যের বাহন নয়। অন্তু আর এলার ভালোবাসার বৃত্তান্তটা লিরিকের তোড়া রচনা—নবেলের নির্জলা আবহাওয়ায় শুকিয়ে যেতে হয় তো দেরি হবে।.......... তোমার সাহিত্যিক বন্ধুরা নিশ্চয় তর্জমাটা দেখেছেন, বিশুদ্ধ সাহিত্যের তরফ থেকে তাঁরা (অর্থাৎ ইংরেজ সাহিত্যিক বন্ধুরা, আ.জা.) কী বিচার করেন জানতে ইচ্ছা করি। সাহিত্যের বাইরেও এর মধ্যে তাঁদের উৎসুক্যের কারণ আছে সে হচ্ছে আধুনিক বাংলায় বৈপ্লবিক মনস্তত্ত্বের এক টুকরো ছবি। এ ঔৎসুক্য ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। অন্তত কবির তরফে এটাতে আমার নিজের কোন দরদ নেই—আমার দরদ হচ্ছে এলা-অন্তুর ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী। যে ভাষায় তার বেদনা ফুটে উঠেছে সে ভাষা কোনমতেই রূপান্তরিত করা যায় না। সুতরাং বাঙালী পাঠক এর থেকে যা পাবে ইংরেজি পাঠক কোনমতেই তা পেতে পারে না।" বৈপ্লবিক মনস্তত্ত্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথের পক্ষ থেকে কোন দরদ নেই, তাঁর সমস্ত দরদ এলা- অন্তুর ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনীকে ঘিরেই ঘনীভূত হয়েছে। এমন অকপট স্বীকারোক্তির পর চরমপন্থীদের বৈপ্লবিক আদর্শকে তার প্রাপ্য মর্যাদা তিনি দেবেন এটা আশা করাটাই বাতুলতা।

নয়

রবীন্দ্রনাথ আসলে এলা ও অন্তুর প্রীতিময় ও স্মৃতিময় প্রণয়ের দূরন্ত আবেগকে গীতিময় সৌরভে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে এমনভাবে মায়াময় মাধুর্যে বাঙময় করে তুলেছেন যে তার ট্রাজিক পরিণতির পরও প্রাণময় আকুতির একটা রেশ বেশ স্পষ্টভাবেই অনুভূত

হয়। রবীন্দ্রনাথের কোন নায়িকাকে প্রেমের কারণে এমনভাবে বলীয়ান হতে এবং প্রেমাস্পদের সম্মান ও গৌরবকে মহীয়ান করার অত্যুগ্র বাসনায় অকুতোভয়ে নিজের জীবনকে এমনভাবে বলিদান করতে দেখা যায় নি। অন্তুও তার পৌরুষমন্ডিত ও বীর্যবন্ত প্রেমের দ্বারা এলাকে সেইভাবে আকৃষ্ট ও বিমোহিত করতে পেরেছিল যার ফলে এলা তার মরণকে প্রণয়ীর কাছে সঁপে দিতে গিয়ে এতটুকু কাঁপেনি, কোন শংকা, কোন ভীতি তাকে স্পর্শ করেনি। এলার প্রতি অন্তুর প্রেমের প্রগাঢ়তার কথা বলতে গিয়ে বুদ্ধদের বসু তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য' গ্রন্থের 'চার অধ্যায়' নামক প্রবন্ধের এক স্থানে মন্তব্য করেছেন, 'চার অধ্যায়ে'র ইন্দ্রনাথে যখন সন্দীপের আভাস পাই, বা এলা মাঝে মাঝে লাবণ্যের গলায় কথা বলে সেটাকে আমরা স্বাভাবিক বলে, এমনকি অনিবার্য বলেই মেনে নিতে পারি। কিন্তু আমাদের অতৃপ্তি থেকে যায় সেখানে, যেখানে এই সব মানুষ, তাদের স্রষ্টার দ্বারা আরোপিত অসামান্যতার ভার বইতে গিয়ে, ঠিক যেন মানুষ হ'য়ে উঠতে পারে না। এরই মধ্যে অতীন্দ্রকে অনেকটা জীবন্ত বলে চেনা যায়, কেননা তার অসমান্যতাকে প্লাবিত ক'রে দিয়েছে তার তীব্র প্রণয়বাসনা, হতাশার আর্তস্বর। অতীন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভা, বা শিল্পী মন আমাদের কাছে জনশ্রুতি মাত্র, কার্যত তার প্রমাণ দেবার সুযোগ পায়নি সে; কিন্তু সে যে প্রেমিক, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কোন সন্দেহই রাখেননি। পুরুষের মূর্ত কামনারূপেই তাকে আগাগোড়া দেখছি আমরা; আর এখানেই অতীন্দ্রের, আর 'চার অধ্যায়' বইটার শক্তির উৎস। এই প্রেমও 'শেষের কবিতা'র মতোই প্রথমদর্শন-সঞ্জাত, আর গাড়ির দুর্ঘটনার ফলে না হোক, ভ্রমণকালে দৈবক্রমে, এলা-অন্তুরও প্রথম সাক্ষাৎ, কিন্তু অমিতের তুলনায় অতীন্দ্রের প্রেমে প্রকৃষ্ট পৌরুষের তেজ অনেক বেশি, এর কখনো বাল্যবিবাহে অধঃপতিত হবার আশঙ্কা ছিলো না, কোনো সুকুমার এবং কমনীয় সমাপ্তির দিকেও এর গতি নয়, তৃপ্ত একে হতেই হবে, যদি তৃপ্তির নাম মৃত্যুও হয়, তবু।" তাদের দু'জনের প্রেম পরিপূর্ণতার মধ্য দিয়ে মুক্তির পথ খুঁজে পেলো না, তার কারণ ব্যক্ত করেত গিয়ে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, "যে অবস্থার মধ্যে এদের দেখাশোনা আর ভালোবাসা, সেটা শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো একটা অন্ধ গলি; তার মধ্যে মিলন অসম্ভব, তা থেকে বেরোবারও কোনো উপায় নেই। অতএব ভীষণ এবং সুন্দর হ'য়ে মৃত্যু নেমে এলো তাদের উপর, ডেকে আনতে হলো সেই মৃত্যুকে, যা অন্তুর স্বভাব-হত্যারই প্রতীক এবং পরিণতি।" আর অন্তুর এ স্বভাব-হত্যার কারণটি জানতে হলে জঙ্গী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে অন্তুর প্রবল ঘৃণার কথা জানা দরকার। সেই সার কথাটি এলার প্রতি অন্তুর কথাতেই প্রকাশ পেয়েছ ঃ "দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ংকর মিথ্যে কথা পৃথিবীশুদ্ধ ন্যাশালিষ্ট আজকাল পাশবগর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে, তার প্রতিবাদ আমার বুকের মধ্যে অসহ্য আবেগে গুমরে গুমরে উঠছে—এই কথা সত্যভাষায় হয়তো বলতে পারতুম, সুরঙ্গের মধ্যে লুকোচুরি করে দেশউদ্ধার চেষ্টার চেয়ে সেটা

হত চিরকালের বড়ো কথা। কিন্তু এ-জন্মের মতো বলবার সময় হল না। আমার বেদনা তাই আজ এত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে।" ঔপন্যাসিকের এহেন বক্তব্যের রেশ ধরেই হয়তো বুদ্ধদেব বসু বলতে পেরেছেন ঃ "সন্ত্রাসবাদ তাঁর বিষয় নয়, পটভূমি মাত্র; তার নৈতিক বা রাজনৈতিক দিকে তাঁর ততটুকুই কৌতূহল যতটুকু তা অতীনের পক্ষে প্রাসঙ্গিক ; তার বিভীষিকার রক্তরেখা যেখানে-সেখানে ছিটকে পড়েছে, তাও শুধু অতীনের ধ্বংসের পথটিকেই লাল তীরের মতো এঁকে এঁকে দিচ্ছে আমাদের চোখের সামনে। এ-ই যখন উদ্দেশ্য, এলা-অন্তুর মরণান্ত ভালোবাসাই যখন বিষয়, তখন এই কাহিনী ব্রাউনিঙীয় স্বগতোক্তিতে বলা যেতো, 'কচ ও দেবযানী'র মতো কাব্যালাপে বা 'ক্যামেলিয়া'র মতো গদ্য-কবিতায়। বলা যেতো, তা-ই শুধু নয়; ওভাবে বললে অন্তরের সঙ্গে বাইরের মিলন পূর্ণ হতো রচনাটি, এমন অনেক অবান্তর ভার থেকে মুক্ত হতো, যা এখানে প্রবেশ নেহাৎই উপন্যাসের আপতিক রূপটি রক্ষা করবার চেষ্টায়। কেননা 'চার অধ্যায়' বিষয়ে সত্য কথাটা এই যে জিনিসটা কাব্য, 'শেষের কবিতা'র চেয়েও নিবিড় অর্থে তা-ই, কাব্য হিসেবে দেখলেই এর প্রতি বিচার হতে পারে।" "এর আত্মা নাটকের নয়, উপন্যাসেরও নয়, গীতিকবিতার।" বুদ্ধদেব বসুর সমুদয় উদ্ধৃতির মর্মার্থ নিষ্কাশন করলে অরবিন্দ পোদ্দারের সেই অভিযোগের (বিপ্লবী মানসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যথার্থ পরিচয় ছিল না; সে জন্যই 'চার অধ্যায়'-এর উপসংহারকে রহস্যে উৎকণ্ঠায় আচ্ছাদিত করার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর কল্পনার উদ্‌ভাবনী শক্তির উপর নির্ভর করেছেন।) একটা জবাব খুঁজে পাওয়া যায়। কল্পনার উদ্ভাবনী শক্তিকে তিনি গীতিকবিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন। লিরিকের তোড়ের কথাটা রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকার করেছেন, আগেই সে কথা উল্লেখ করেছি।

দশ

রবীন্দ্রনাথ অতীন-এলার প্রেমকে তুঙ্গে তোলার একটা সুযোগ করে নেওয়ার জন্য সন্ত্রাসবাদকে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছেন একথার মধ্যে কিছুটা সত্যতা অবশ্যই আছে কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কৌতূহলকে বুদ্ধদেব বসু যে অর্থে সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছেন সেটা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। রাজনৈতিক দিকটিকে রবীন্দ্রনাথ শুধু অতীনের ও এলার মরণান্ত প্রণয়ের প্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সীমিতভাবে ব্যবহার করেছেন একথা মেনে নেওয়া যায় না, তাছাড়া দলপতি ইন্দ্রনাথের নির্লজ্জ ইংরেজ-তোষণের পাশাপাশি তাঁর সগর্ব আত্মকেন্দ্রিকতা ও উদ্ধত-আত্মম্ভরিতায় বৈপ্লবিক আদর্শের ভাবমূর্তিকে যেভাবে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে তাতে নির্দ্বিধায় একথা বলা চলে যে, রবীন্দ্রনাথ খুব সচেতনভাবেই চরমপন্থী রাজনীতির বিরুদ্ধে তাঁর আদর্শগত অবস্থানটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্য সুপরিকল্পিতভাবেই

উপন্যাসটি রচনা করেছেন। আর তাঁর ঐ বিরোধী অবস্থানটিকে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন শোষণলিপ্সু, অত্যাচারী ইংরেজ সরকারকে। চন্দ ভ্রাতার মাধ্যমে প্রশাসনের সঙ্গে সন্ত্রাস বিরোধী ঐ ধরনের একটি উপন্যাস বা তার নাট্যরূপ দেবার কথাবার্তা তো চূড়ান্ত হয়েই গিয়েছিল—ব্রেনানের প্রতিবেদন থেকে তার প্রমাণ তো আমরা পেয়েছি। এন্ডারসন প্রশাসনের সঙ্গে তাঁর সংযোগের আর একটি অভ্রান্ত তথ্য হচ্ছে, তিনি প্রশাসনের অনুরোধে সত্যি সত্যিই 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন এবং অরবিন্দ পোদ্দারের লেখা থেকে জানা যায় সেটি আজও বিশ্ব ভারতীর রবীন্দ্র ভবনে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। অবশ্য ব্রেনানের প্রত্যাশা অনুযায়ী কেন সে নাটকটি কলকাতার সবচেয়ে বিখ্যাত থিয়েটারে রঙ্গমহল বা নাট্য নিকেতন-এ প্রদর্শিত হয়নি তার কারণ জানা যায়নি।

রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটি প্রথমে ইংরেজীতে প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেন, বিলেতে অবস্থানরত অমিয় চক্রবর্তীর উপর গ্রন্থটির ত্বরিত অনুবাদ ও তা প্রকাশের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রথমে ইংরেজীতে ইংল্যান্ডে ঐ বই প্রকাশে বরীন্দ্রনাথের আগ্রহের কারণ কি? তাঁর সন্ত্রাস-বিরোধী মনোভাবটি ইংরেজ মহলে সাততাড়াতাড়ি জানানোই কি ঐ আগ্রহাতিশয্যের আসল কারণ? নেপাল মজুমদার তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ/ কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ' গ্রন্থের 'চার অধ্যায় ঃ প্রাসঙ্গিক তথ্য' নামক প্রবন্ধে কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'চার অধ্যায়' ইংরেজী তর্জমা প্রকাশের ব্যাপারে কবির অন্যতম সবচেয়ে বড় আগ্রহ ও অভিলাষটি হচ্ছে, সাহিত্য ও শিল্প মূল্যের দিক থেকে 'চার অধ্যায়'-এর যথার্থ অপক্ষপাত বিচার বিলেতের রসজ্ঞ সমাজই করতে সক্ষম হবে বলে।"

যুক্তির দিক থেকে নেপাল বাবুর উক্তি হাস্যকর। আসলে যাদেরকে খুশী করার জন্য 'চার অধ্যায়' উপন্যাস রচিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তারাই সর্বপ্রথম উপন্যাসটির মর্মার্থ অনুধাবন করুক। "আধুনিক বাংলায় বৈপ্লবিক মনস্তত্ত্বের একটুকরো ছবি'র প্রতি বিলেতের রসজ্ঞ সমাজকে আকৃষ্ট করতে পারলে ভারতে ইংরেজী প্রশাসনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মধুর ও সুদৃঢ় হয়। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা ঐ একই চিঠির আর একটা অংশের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 'আমার দরদ হচ্ছে এলা অন্তুর ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী। যে ভাষায় তার বেদনা ফুটে উঠেছে সে ভাষা কোনোমতেই রূপান্তরিত করা যায় না। সুতরাং বাঙালী পাঠক এর থেকে যা পাবে ইংরেজী পাঠক কোনোমতেই তা পেতে পারে না।" এলা-অন্তুর তৃষিত, দৃপ্ত, বেগবান ও বন্য প্রণয়য়ের দিকটা বিলেতের রসজ্ঞ মহল বুঝুক না বুঝুক তাতে যায়-আসে না কিন্তু আধুনিক বাংলায় বৈপ্লবিক ঘটনাধারা যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে সেটা যেন তারা ঠিকভাবে বুঝতে পারে। উল্লেখ্য যে, ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে মূল বাংলা বইটি তিনি বাজারে ছাড়েন। কিন্তু কেন ইংরেজীর জন্য অপেক্ষা করলেন না? এর কারণ যে

সময় রবীন্দ্রনাথ বিলেতে 'চার অধ্যায়' -এর ইংরেজী অনুবাদ সর্বপ্রথম প্রকাশের জন্য ব্যাকুল ও দারুণভাবে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন ঠিক সেই সময় 'বিলেতের বাঙালী-বিদ্বেষী পত্র-পত্রিকা বাংলার বুদ্ধিজীবী, বিশেষ করে মুক্তি পাগল যুবকদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে বেশ কিছুটা মুখর ও সোচ্চার হয়েছিল। এই অবস্থায় বিলেতে চার অধ্যায়-এর ইংরেজী তর্জমাটা প্রকাশিত হলে এইসব সাম্রাজ্যবাদী ও স্বার্থান্বেষী পত্র পত্রিকাগুলি পাছে তার

শিল্পপতিদের মানসপুত্র অহিংস গান্ধীর দেশের স্বাধীনতা আনয়নে পৌনঃপুনিক ব্যর্থতা এবং অন্যদিকে বৃটিশের সংগে তাঁর সুপরিকল্পিত আপোস ও তোষণনীতি ভারতীয় শোষণক্লিষ্ট মানুষের মনে সৃষ্টি করলো তীব্র হতাশা। শেষ পর্যন্ত হতাশাখিন্ন মানুষ শোষণহীন সমাজ লাভের প্রত্যাশায় ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির কার্যকলাপের প্রতি দিনে দিনে আগ্রহী ও আস্থাশীল হতে থাকে। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতি বৃটিশ সরকারের যুগপৎ বিদ্বেষ ও ভীতি প্রকট রূপ ধারণ করে। ১৯১৮ সালের ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক সংস্কার রিপোর্টে মন্টেগু-চেমসফোর্ড স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, "The Revolution in Russia and its beginning was regarded in India as a triumph over despotism .... It has given an impetus to Indian political aspiration." একদিকে সন্ত্রাসবাদীদের ইংরেজ হত্যার দুঃসাহসিক অভিযান অন্যদিকে কমিউনিষ্ট নেতা ও কর্মীদের বৃটিশ সরকার উৎখাতের গোপন ষড়যন্ত্র এবং সর্বোপরি যুদ্ধোত্তর কালের অর্থ-সংকট—সব মিলিয়ে বিংশ শতাব্দীর দুই দশকের প্রারম্ভ কাল থেকে শুরু ক'রে তিন ও চার দশকের মাঝামঝি সময় পর্যন্ত দেশে এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হলো যার ফলে সরকার তার প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায় হিসাবে দমন, পীড়ন ও শোষণের মাত্রাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করাকেই শ্রেয় মনে করেন। বৃটিশ সরকারের চন্ড রাজনীতির হিংস্রতা ও বর্বরতা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছিলো তা ঐ সময়ের ইতিহাস পড়লেই বোঝা যায়।

সাহিত্য যদি হয় সমাজমনের কিংবা ঐসঙ্গে সমাজের আর্থ-রাজনীতিক জীবনের দর্পণ তাহলে একথা বলা অসঙ্গত নয় যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে আস্থাবান সাহিত্যিককে সমকালীন রাজনীতি ও অর্থনীতির তরঙ্গ তাড়নে সৃষ্ট জীবনের সমগ্রতা সন্ধানে ব্যাপৃত হতেই হবে। চরম বেকারত্ব, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য জিনিসের অগ্নিমূল্য, সন্ত্রাসবাদীদের নির্ভীক আত্মাহুতি, নব নব কৌশলে সন্ত্রাসবাদী ও কমিউনিষ্টদের হত্যা ও যাবজ্জীবন কারাদন্ডাদেশ, অবিশ্বাস্য হারে জমির খাজনা বৃদ্ধি, জমিদারী-মহাজনী চক্রান্তে ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি, শ্রেণী-দ্বন্দ্ব ও শ্রমিক আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী এবং সর্বোপরি কংগ্রেস নেতাদের পৌনঃপুনিক শঠতা ও চক্রান্ত—সমকালীন বঙ্গদেশের বাস্তব অবস্থার পরিমন্ডলে উপর্যুক্ত প্রত্যেকটি সমস্যাই ছিলো খুবই গুরুত্ববাহী। তা ছিলো সমসাময়িক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং একথা বলা খুবই সঙ্গত যে সমকালীন বস্তুবাদী লেখকের পক্ষে তার সামগ্রিক তাৎপর্যকে অস্বীকার করা কিংবা এড়িয়ে গিয়ে সাহিত্য রচনা করা ছিল জীবনকে অস্বীকার করারই নামান্তর।

তিন

বস্তুতন্ত্রের মশালচী হয়ে কল্লোল সেদিন তার কেতন উড়িয়ে বাংলা সাহিত্যে নতুন পথের সন্ধান দিতে চেয়েছিলো। বাংলা সাহিত্যের ভ্যাপসা ভাববাদী ভাবধারা ঘুচিয়ে টাট্‌কা

রঙরসে ও প্রাণোজ্জ্বল জীবন সৃষ্টি করার দুর্বার এক অভিলাষ ছিলো কল্লোলের। কামার-কুমার, কৃষক-শ্রমিক, হাড়ি-ডোম, মুচি-মেথর ইত্যাদিকেও কল্লোল সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো তার সৃষ্টিযজ্ঞে। আধ্যাত্মিকতার অলৌকিক মন্ত্রোচ্চারণ, কাল্পনিক জীবনের বর্ণাঢ্য উদ্ভাসন, মিহি সুরের গুঞ্জন—নতুনতর সৃষ্টি সুখের উল্লাসে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গন থেকে কল্লোল এগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে চেয়েছিল। কিন্তু স্থবির সমাজের পচা ভিত্‌কে ধসিয়ে ফেলার সুকঠিন সংকল্প থাকা সত্ত্বেও কল্লোল শেষ পর্যন্ত কি দিয়েছিলো, কি করেছিলো? রাজনীতি ও অর্থনীতির তরঙ্গতাড়ন ও অবক্ষয়ের কারণে মানুষ যখন নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিলো তখন সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রের বান ডাকাতে গিয়ে তাঁরা শেষ পর্যন্ত কিসের নেশায় বিভোর হলেন? কল্লোলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ বললেন, "পলিটিক্স বুঝি না, ধর্ম মানি না, সমাজ জানি না,—মানুষের মনগুলি যদি সাদা থাকে—ব্যস তাহলেই পরমার্থ"। বুদ্ধদেব বসু বললেন, "শিল্প রচনার আর সমাজ রচনার জগৎ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।" তাঁর অভিমত এই যে সাহিত্য বা শিল্পকর্ম দ্বারা সামাজিক লক্ষ্যে যাঁরা পৌছাবার চেষ্টা করেন তাঁরা ভ্রান্ত তাঁরা বিপথগামী। সামাজিক কিংবা সমাজের আর্থ-রাজনীতিক কোনো সমস্যাকে টেনে আনার পক্ষপাতী কল্লোলের অনেকেই ছিলেন না কিন্তু এইটেই কল্লোলের সার্বিক পরিচয় নয়। কারণ আমরা যুবনাশ্বকে দেখেছি কলকাতায় অবস্থিত পটলডাঙ্গার বস্তি ঘুরে ঘুরে নফর, ফকরে, সদি, কুঠে, বুড়ি, গুবরে, খেঁদি পিসি প্রভৃতির মতো নামহীন গোত্রহীন মানুষদের স্বরূপ সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন।

'পলিটিক্স বুঝি না, সমাজ জানি না'— একথা বস্তুতন্ত্রের কোনো মশালচীর কাছ থেকে নিশ্চয় আশা করা যায় না। দীনেশরঞ্জন, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ সাহিত্যিকদের কথার ভঙ্গি দেখে মনে হয় তাঁদের কালের আর্থ-রাজনীতিক কোনো সমস্যাই প্রবহমান জীবনধারাকে কোনো ভাবেই আন্দোলিত করেনি। তাঁরা যেন আর্থ-রাজনীতির সমস্যা বহির্ভূত কোনো জীব। যেন তাঁরা স্বয়ম্ভূ। আসলে তাঁরা বৃটিশ সরকারের রোষ-দৃষ্টি এড়িয়ে চলার জন্যেই সমকালীন রাজনীতি ও অর্থনীতির শুভঙ্করে যে ফাঁকি ছিলো, তার দিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ না করার মধ্যেই সুনিশ্চিত নিরাপত্তা খুঁজে পেয়েছিলেন। বিশ্ব কাঁপানো বিপ্লবের বৈজয়ন্তী-শোভিত রাশিয়ার পানে তাকাতেও তাঁরা শঙ্কিত হতেন।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন নামের পত্র-পত্রিকা ও গোপন প্রকাশ্য ইশতেহারের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযোগিতা প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রকাশিত হতো। স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের উপর্যুপরি ব্যর্থতা এদেশে সমাজতান্ত্রিক চেতনার উত্তরোত্তর বিকাশ ও বিবর্ধনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। সমকালীন জীবনের পরিমন্ডল থেকে আর্থ-রাজনীতির প্রসঙ্গ বিবর্জিত হলে জীবন পাঁশুটে হয়ে যায়, জীবনকে মনে হয় নীরক্ত দেহের মতো। পলায়নবাদী ঐ সমস্ত লেখক সে সম্পর্কে আদৌ সচেতন ছিলেন না।

'প্রবল বিরুদ্ধবাদ' 'বিহবল ভাববিলাস' ও যৌনকামনার উত্তাল তরঙ্গে ভেসে গিয়ে সাহিত্যে নতুন মাত্রা যোজনা করাই ছিলো তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের শোকার্ত হৃদয় অন্বেষণে যাঁরা ব্রতী হলেন তাঁদের মধ্যে যুবনাশ্বের নাম উল্লিখিত হয়েছে। কাব্যক্ষেত্রে তখন নজরুল ইসলাম কর্তৃক বিপ্লবী সমাজবাস্তবতার দিক-নির্দেশ নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এঁদের মধ্যে ত্রুটি যাই থাক, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সূচনা যে এঁদের সাহিত্যে (প্রথম পর্যায়ের প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যেও) সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু কল্লোলীয় কিছু কিছু লেখক তাঁদের যাত্রার সূচনা পর্বে বাংলা সাহিত্যের ঐ ঐতিহ্যকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন। অবশ্য আমরা দেখেছি কল্লোলের প্রায় সমকালে প্রকাশিত কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় কিছু কিছু লেখক বস্তুবাদী ঐ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গল্প ও কবিতা রচনা করেছেন। ঐ সমস্ত পত্রিকার মধ্যে সংহতি, কালি কলম, প্রগতি, উত্তরা, লাঙল, গণবাণী, বিজলী, নবশক্তি, বিচিত্রা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য (প্রকাশের ধারাবাহিক সময় অনুযায়ী সাজানো গেলো না এজন্য ক্ষমাপ্রার্থী)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা সমীচীন যে কল্লোল পত্রিকার কয়েকজন গাল্পিকের মানস প্রবণতার স্বরূপ সন্ধানই আমাদের উদ্দেশ্য। অবশ্য এ কথা স্মর্তব্য যে 'সংহতি', 'কালিকলম', উত্তরা', 'ধূপছায়া' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায়ও কল্লোলীয় ভাবধারার ঢেউ এসে লেগেছিলো এবং সব মিলিয়েই ঐ সময়টাকে বলা হয় কল্লোল যুগ। কল্লোল পত্রিকার লেখকদের মধ্যে অনেকেই কল্লোল ছাড়া ঐ সব পত্রিকা কিংবা অন্যান্য পত্রিকায়ও লিখতেন—তৎসত্ত্বেও তাঁরা কল্লোলীয় লেখক হিসাবেই সুপরিচিত। কল্লোল পত্রিকার এমন কয়েকজন গাল্পিকের প্রসঙ্গ এ প্রবন্ধে উত্থাপন করবো যাঁরা কল্লোল সমকালে কিংবা কল্লোল পরবর্তীকালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গল্প লিখে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁরা হলেন বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মনীশ ঘটক, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের প্রায় প্রত্যেকেই মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁদের সমকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গল্প লিখেছেন এবং তাঁরা সবাই একদা কল্লোলেও গল্প লিখতেন। খুব সংক্ষেপে এঁদের প্রত্যেকের সমস্ত গল্পের পরিবর্তে কিছু কিছু প্রতিনিধিত্বমূলক গল্পের উপর ভিত্তি করেই ঐ কাজে অগ্রসর হয়েছি।

চার

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম গল্প 'রজনী হ'ল উতলা'। হয়তো এক অর্থে অসত্য নয় যে এর বীজ থেকেই উপ্ত হয়েছিলো তাঁর সাহিত্যের বিশাল মহীরুহ। 'রজনী হ'ল উতলা'র কারণে তাঁর ভাগ্যে যেমন অশ্লীলতার দায়ে রাশি রাশি নিন্দা ও ধিক্কার জুটেছিলো তেমনি ঐ গল্পই তাঁর পরিচিতির পরিসরটাকে বৃদ্ধি করেছিলো অবিশ্বাস্যভাবে। বুদ্ধদেব বসু নিজেই স্বীকার করেছেন যে ঐ গল্প যদি সেদিন রক্ষণশীল রসপিপাসুদের মধ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি না করতো তাহলে তিনি হয়তো কোনদিনই গল্পের আসরে নামতেন না। সেদিনের সেই

নিন্দাবাদই তাঁর গল্প লেখার প্রেরণার উৎস হিসাবে স্মরণীয় হয়ে রইলো। উল্লেখ্য যে ঐ সময় বুদ্ধদেব বসুর বয়স ছিল মাত্র সতের বছর। কলেজের ছাত্র তখন।

কিন্তু 'রজনী হ'ল উতলা' কি এমন গল্প যা নিয়ে সেদিন হৈ চৈ দেখা দিয়েছিলো? আসলে এ গল্পে ঘটনা তেমন কিছুই নেই—শুধু কাল্পনিক দেহোপভোগের একটুখানি দুর্ঘটনা ছাড়া। জ্যোৎস্না-পুলকিত এক গভীর রাতে, যখন—"প্রকৃতিও যেন এক নিমেষে সেইরূপ নিঃসাড় হয়ে গেছে। তারাগুলো আর ঝিকিমিকি খেলছে না, গাছের পাতা আর কাঁপচে না, রাতে যে সমস্ত অদ্ভুত, অকারণ শব্দ চারদিক থেকে, আসতে থাকে তা যেন কার ইঙ্গিতে মৌন হয়ে গেছে, নীল আকাশের বুকে জ্যোছনা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে—এমন কি বাতাসও যেন আর চলতে না পেরে ক্লান্ত পশুর মত নিস্পন্দ হয়ে গেছে, অমন সুন্দর, অমন মধুর অমন ভীষণ নীরবতা, অমন উৎকট শান্তি আর আমি দেখিনি। আমি নিজের অজানতে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলুম—কেউ আসবে বুঝি?" এই হচ্ছে 'রজনী হল উতলা' গল্পের সূত্রপাতের অংশবিশেষ। সত্যি সত্যি ঐ রকম এক পরিবেশে এক নারীর আবির্ভাব ঘটলো। যেমন এর পরেই লেখকের বর্ণনায়—"অমনি আমার ঘরের পর্দা সরে গেল। আমার শিয়রের উপর যে একটু চাঁদের আলো পড়েছিল তা যেন একটু নড়ে-চড়ে সহসা নিবে গেল—আমি যেন কিছু দেখছি না, শুনছি না ভাবছি না—এক তীব্র মাদকতার ঢেউ এসে আমাকে ঝড়ের বেগে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তারপর..........

তারপর হঠাৎ আমার মুখের উপর কি কতগুলো খসখসে জিনিস এসে পড়ল—তার গন্ধে আমার সর্বাঙ্গ রিমঝিম করে উঠল। প্রজাপতির ডানার মতো কোমল দুটি গাল, গোলাপের পাপড়ির মত দুটি ঠোঁট, চিবুকটি কি কমনীয় হয়ে নেমে এসেছে, চারুকণ্ঠটি কি মনোরম, অশোকগুচ্ছের মত নমনীয়, স্নিগ্ধ শীতল দুটি বক্ষ, কি সে উত্তেজনা কি সর্বনাশা সেই সুখ............

তারপর ধীরে ধীরে দুখানি বাহু লতার মত আমাকে বেষ্টন করে ধরে যেন নিজেকে পিষে চুর্ণ করে ফেলতে লাগল-আমার সারা দেহ থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগল—মনে হল আমার দেহের প্রতি শিরা বিদীর্ণ করে রক্তের স্রোত বুঝি এখুনি ছুটতে থাকবে!" গল্পের বাকী অংশ আর না বললেও চলে। তবে এটুকু হয়তো বলা দরকার যে একাধিক রজনীতে যে নারীর সঙ্গে দৈহিক মিলনের মধ্য দিয়ে তিনি দেহের প্রবল ক্ষুধা মেটালেন তাকে তিনি চাক্ষুষ করতে পারেন নি। মেয়েটি শুধু বলেছে—"তোমার ইচ্ছা মেটাবার জন্যেই তো আমার সৃষ্টি.......আমি তো তোমার কাছে আমার সমস্ত লজ্জা খুইয়ে দিয়েছি..... অপরিচয়ের আড়ালে এ রহস্যটুকু ঘন হয়ে উঠুক .... নারীর মুখ কি শুধু দেখবার জন্যেই?" এসব উক্তি মেয়েটিই করেছে—করেছে ভিন্ন ভিন্ন কথার পরিপ্রেক্ষিতে। শেষের ঐ জিজ্ঞাসাসূচক প্রশ্নের উত্তরে লেখকের উক্তি-"না তা হবে কেন? তা যে অফুরন্ত সুধার আধার।" কিন্তু পরের দিন লেখক দিনের আলোয় যখন পরিচিতা অনেক মেয়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত হলেন তখন তাদের প্রত্যেকের মুখ গলার স্বর

ইত্যাদির মাধ্যমে পরীক্ষা চালিয়ে গত রাতের স্পর্শসুখকর সেই মেয়েটিকে চিনতে চাইলেন, কিন্তু– "যখন যাকে দেখি মনে হয় এই বুঝি সেই! যখনি যার গলার-স্বর শুনি তখনই মনে হয়, কাল রাত্রিতে ঐ কণ্ঠই না ফিস ফিস করে আমায় কত কি বলেছিল। অথচ কারো মধ্যেই এমন বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখলুম না, যা দেখে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায়। সবাই হাসচে গল্প করছে। কে? কে তা হলে? ...."।

কিন্তু দিনের আলো এক সময় নিবে এলো। এলো রাত। এলো লেখকের দু চোখ ভরে ঘুম। কিন্তু এক সময় ঘুম ভেঙ্গে গেলো। "আবার প্রকৃতির সেই স্থির, প্রতীক্ষমান, নিষ্কম্প অবস্থা দেখতে পেলুম—আবার আমার ঘরের পর্দা সরে গেল—বাতাস সৌরভে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল-জ্যোছনা নিবে গেল—আবার দেহের অণুতে-অণুতে সেই স্পর্শসুখের উন্মাদনা—সেই মধুময় আবেশ—সেই ঠোঁটের উপর ঠোঁট ক্ষইয়ে ফেলা—সেই বুকের উপর বুক ভেঙ্গে দেওয়া। তারপর সেই স্নিগ্ধ অবসাদ—সেই গোপন প্রেমগুঞ্জন—তারপর ভোরবেলায় শূন্য বিছানায় জেগে উঠে প্রভাতের আলোর সাথে দৃষ্টিবিনিময়"। এখানেই 'রজনী হল উতলা' গল্পের সমাপ্তি। ছোট্ট একটি গল্প—আকৃতিতে যেমন একটুখানি বড়ো কবিতার পরিসর লাভ করেছে তেমনি এ গল্পের প্রকৃতিতে আছে রোম্যান্টিক কবিতারই মেজাজ এবং চারিত্র্য। এ গল্পে এমনই এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য আছে যার অল্পবিস্তর অনুবর্তন বুদ্ধদেব বসুর অধিকাংশ গল্পেই লক্ষ্য করা যায়। সতেরো থেকে সাঁইত্রিশ কিংবা সাঁইত্রিশ থেকে সাতান্ন বছর অথবা বলা যায় মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি যে গল্প লিখে গেছেন তাতেও বহুলাংশে ঐ সতেরো বছরের বুদ্ধদেবেরই মানসিকতার ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়। ডি. এইচ. লরেন্সের একটি বাণী তাঁর কাছে আরাধ্য বলে মনে হয়েছিলো। সেটি এই "There is nothing wrong with sexual feeling in themselves, so long as they are straight forward and not sneaking or sly. The right sort of sex stimulas is invaluable to human daily life. Without it the world goes grey."

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধদেব বসু লরেন্সের ভাবশিষ্য হলেও লরেন্সের আদিম যৌনাবেগকে আয়ত্ত করা তাঁর ক্ষমতায় কুলোয় নি। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে সেই প্রচেষ্টার কোনো অন্ত ছিল না। সমালোচক যথার্থই বলেছেন–"তাহলেও sex-স্পৃহা বুদ্ধদেবের দ্বিতীয় স্বভাব,—আত্মগুহায়িত স্বভাবে তিনি যথার্থই কবি। তাই প্রেমের চিত্র রচনায়, নগ্নতার অঙ্গনে তিনি যেমন নির্ভয় তেমনি ঝাঁঝহীনও বটে। বুদ্ধদেব নিজেই স্বীকার করেছেন যে Sexual behaviour-এর বর্ণনা তাঁর ছোট গল্পের ক্ষেত্রে উৎকট হতে পারেনি–পরিপ্লুত কাব্যময়তাকে সেখানে প্রধানভাবে জায়গা করে দিয়েছে। তাঁর কথা সাহিত্যের প্রবল কাব্যময়তাকে বাদ দিয়ে ঘটনা তেমন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুকে লেখা একপত্রে 'বসার ঘর' গ্রন্থটির সমালোচনা প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা তাঁর যে কোনো উপন্যাস প্রসঙ্গে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি ছোট গল্প সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথের উক্তি–"গল্প হিসাবে তোমার এ লেখা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ কবির লেখা গল্প, আখ্যানকে উপেক্ষা করে বাণীর স্রোত বয়ে চলেছে। একটি নারী

সমানভাবে প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথের উক্তি–"গল্প হিসাবে তোমার এ লেখা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ কবির লেখা গল্প, আখ্যানকে উপেক্ষা করে বাণীর স্রোত বয়ে চলেছে। একটি নারী এবং একটি পুরুষ এই দুই তটের 'মাঝখানে' এর আবেগের ধারা। ধারার মধ্যে থেকে থেকে আবর্ত পাক খেয়ে উঠেছে, কিন্তু তার কারণগত আঘাত বাইরের দিক থেকে নয়, গভীর তলার দিক থেকে। কারণ যদি থাকতো বাইরে, তা হলে তার ইতিহাস নিয়ে আখ্যানের উপকরণ জমে উঠতে পারত। তাহলে এর ভিতর থেকে দস্তুর মতো একটি গল্প দেখা দিত। তুমি স্পর্ধা করেই সেটা ঘটতেও দাও নি।... এই যে তোমার গল্প না-বলা গল্পটিকে তুমি যে এমন করে দাঁড় করাতে পেরেছ সে তোমার করিত্বের প্রভাবে।' বুদ্ধদেব বসুর প্রায় প্রত্যেকটি গল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য পূর্ণাঙ্গ বা আংশিকভাবে প্রয়োগ করা চলে। বুদ্ধদেব বসু নিজেই স্বীকার করেছেন —"এমন গল্প আমি কমই লিখেছি যার গল্পাংশ মুখে মুখে বলে দেয়া যায়।" 'রজনী হ'ল উতলা', 'এমিলিয়ার প্রেম', 'চোর! চোর', 'সবিতা দেবী', 'বোন' 'এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে', 'লুসিললিতা', 'প্রথম ও শেষ' প্রভৃতি গল্পের যৌনসর্বস্বতাবাদ কিংবা কবিত্ব অথবা আত্মগত ভাষণের মধ্যে বাস্তব জগতের ঘটনা অংশ বিরল বলাই সংগত। বেশীর ভাগ গল্পেই যৌবনাবেগের ধারা মনের গভীর তলার দিকে সুড়ঙ্গ কেটে কেটে এগিয়ে গেছে— বইয়ের বাস্তব ঘটনা ধারার আলো-বাতাস সেখানে প্রবেশ করতে পারে নি। সেটা তিনি নিজেই চান নি। মগ্ন চৈতন্যের কাল্পনিক সেই পরিবেশ তৈরী না করলে তিনি মালার্মের ফন-এর মতো নারী ধর্ষণের সুখ-স্বপ্নে বিভোর কিভাবে হতেন তাঁর 'রজনী হ'ল উতলা'র মতো গল্পে ? বুদ্ধদেব বসু বাংলা সাহিত্যে যেন আত্মমগ্ন যুবরাজ— তাঁর কাঙ্ক্ষিত সাহিত্য-সাম্রাজ্যে রিরংসা-তাড়িত-পুরুষ ও রমণীদের রমণ-রণের বাধাবন্ধনহীন আয়োজন। কাব্য প্রতিভার সুঘ্রাণ-স্পর্শে ধন্য হয়েছে বুদ্ধদেব বসুর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস। কবিতার কথা তো বলাই বাহুল্য। তাঁর গল্পের পাত্র-পাত্রী অজস্র সমস্যার ভারে ভারাক্রান্ত সমকালীন সমাজের সঙ্গে দারুণভাবে নিঃসম্পর্কিত, বলা সঙ্গত যে তাঁর শিল্প-সাহিত্যের সংগে সমাজ বা সমাজের আর্থ-রাজনীতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তেমন কোনো সম্পর্কই নেই। অথচ বুদ্ধদেব বসু তাঁর এক প্রবন্ধে সমকালীন জীবনের সুকঠিন বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। 'প্রগতি' নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত (পরবর্তীকালে ১৯২৭ সালে 'কল্লোল' পত্রিকায় সংগৃহীত হয়) 'অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন–"অতি আধুনিক সাহিত্যকে Post-war-সাহিত্য বললে ভুল হয় না। আধুনিক লেখকেরা সকলেই Post-war সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিতর দিয়ে বড় হয়ে উঠেছেন। লড়াইয়ের ফলে ইউরোপে যে দুরবস্থা ও মানুষের চিন্তাজগতে যতটা পরিবর্তন এসেছে, আমাদের দেশে তার চেয়ে কম হলেও উনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় আমাদের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ ও মানের ভাবধারার গতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। .... বর্তমানে বাংলাদেশে জীবন সংগ্রামে যে কঠোর প্রতিযোগিতা

চলেছে, তাকে মুখের গ্রাস নিয়ে কাড়াকাড়ি বললে অত্যুক্তি হয় না। দারিদ্র্যের তাণ্ডব নৃত্যের নিষ্ঠুর পদাঘাতে কোথায় উড়ে যাচ্ছে ধর্ম, সমাজ, স্বাস্থ্য, আনন্দ, প্রাণ, আয়ু, ইহকাল, পরকাল–সব। ..... ভগবান, ভূত ও ভালবাসা এই তিনটি জিনিসের উপর আমাদের প্রাক্তন বিশ্বাস হারিয়েছি।" প্রথম মহাযুদ্ধ যে বছর শেষ হয় সে বছরে বুদ্ধদেব বসুর বয়স এগারো এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যে বছরে শেষ হলো তখন তাঁর বয়স সাঁইত্রিশ। দু-দুটো মহাসমরের বিশ্ব কাঁপানো বিভীষিকা ও নিষ্ঠুরতায় পৃথিবীর সাধারণ মানুষের সমুদয় সুখ-স্বপ্ন ও কল্পনার আকাশস্পর্শী সৌধ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। অনুন্নত দেশগুলোর সামাজিক ও আর্থরাজনৈতিক জীবনের গতি-প্রকৃতিও বদলে গেলো আমূলভাবে। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক দেশগুলোর একদিকে যুদ্ধোত্তর কালের ভয়াবহ অর্থনৈতিক অবক্ষয় অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কঠোর দমননীতি ও শোষণ লিপ্সা—এ দুয়ের যাঁতাকলে পড়ে তাদের নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিলো। শুধু তৎকালীন বঙ্গদেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষের জীবনে যুদ্ধোত্তর প্রতিটি কালেই সেই অভিসম্পাত নেমে এসেছিলো। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের ভয়াবহ বিপর্যয়ের চিত্র আমরা বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ থেকেই পেয়েছি। বলা বাহুল্য, তিনি কল্লোল পত্রিকায় যেদিন থেকে গল্প লেখা শুরু করলেন তারপর থেকে প্রতি অর্ধ কিংবা এক যুগের সময়-সীমার মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা লাভের কাল পর্যন্ত সমগ্র দেশের মানুষের জীবনে বৃটিশ রাজশক্তির দংষ্ট্রাঘাত ও নিষ্ঠুর শোষণের ফলে যে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে এসেছিলো তার স্বতঃস্ফূর্ত কোনো প্রতিফলন তাঁর সমগ্র গল্পের তথা উপন্যাসের পরিমণ্ডলের মধ্যে প্রায়-দুর্লক্ষ্য বলা চলে। পরবর্তীকালে তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত রচিত সাহিত্যেও বাস্তবতার সমগ্রতার মধ্য দিয়ে জীবন-চিত্রায়ণের তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। বলা বাহুল্য দ্বান্দ্বিক বাস্তবতা বিষয়ে তাঁর নিস্পৃহতা ও নিরাসক্তি তাঁর বিশ্বাসেরই অঙ্গীভূত। নির্জ্ঞান-মনের সিঁড়ি বেয়ে পথ হাঁটতে ক্লান্তি নেই। অনুপম বাচনিক কলাকৌশলে তিনি যেমন কথার মালা গাঁথতে পটু তেমনি তার মধ্যে এক ধরনের সুর সৃষ্টিতেও তাঁর নৈপুণ্য অসাধারণ। যেসব গল্পে তীক্ষ্ণ-যৌন-বাসনা প্রকাশের ব্যাকুলতায় আবেগ-চঞ্চল, তাদের মধ্যে যেমন এক ধরনের সুর আছে তেমনি প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ মুহূর্তকে কেন্দ্র করে যে-সব গল্প রচিত হয়েছে সেখানেও সৃষ্টি হয়েছে ভিন্নতর সুরের ব্যঞ্জনা। পূর্বেই বলা হয়েছে বুদ্ধদেব বসুর গল্পে প্রায়শই ঘটনা তেমন থাকে না—একটি সাধারণ মুহূর্ত কিংবা অত্যন্ত নাটকীয় একটি মুহূর্তের খন্ডাংশই তাঁর কোনো কোনো গল্পের আসল ঘটনা। জটিল মনস্তত্ত্বের বিসর্পিল গতি-প্রকৃতির তরঙ্গাভিঘাতে তাঁর গল্পের বাস্তব ঘটনার রেশটুকুও এক পর্যায়ে গিয়ে শেষ হয়ে যায়। সমাজ বিচ্ছিন্ন নরনারীর (সচ্ছল ও উচ্চবিত্ত) জাগর স্বপ্নে লালিত জীবনের অনুধ্যানে আত্মনিবিষ্ট বুদ্ধদেব বসু বাস্তবের বিস্মৃতিকেই প্রবলভাবে কামনা করেন। বুদ্ধদেব বসু আত্ম-অভিক্ষেপণের নব নব কৌশলে তাঁর কিছু কিছু গল্পে নতুন এক ধরনের মাত্রা সংযোজন করেছেন। সমস্যা-ভারাক্রান্ত জীবনের

কোনো দ্বন্দ্ব বা জটিলতা তাঁর গল্পের সেই পরিমণ্ডলে উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। কবিতার মতো তিনি বেশ কিছু গল্পকেও প্রতীকবাদের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। প্রতীকাশ্রয়ী সেই বক্তব্য প্রক্ষোভ-তাড়িত-চৈতন্যেরই প্রক্ষেপ মাত্র।

তবে একথা সত্য যে তাঁর বেশ কিছু গল্পে সামাজিক জীবনের অত্যন্ত অগভীর কিছু সমস্যার কথা আছে যে-সমস্যা সমাজ কাঠামোর মূল ধারার সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত নয়, অথচ জীবনের তাৎক্ষণিক কোনো মুহূর্তে মৃদু প্রকম্পন সৃষ্টি করে মাত্র। তার চকিত-বিচ্ছুরিত একটুখানি অংশকে তিনি কাব্য-সুষমায় ভরিয়ে তোলেন। কখনো তার স্বাদ তিক্ত, কখনো মধুর। যেমন 'লজ্জা' নামক একটি গল্পের কথা ধরা যাক। লেক মার্কেটের কাছে ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে পারিজাত তার নতুন-বিয়ে-করা-বৌ মন্দিরাকে নিয়ে বাস করছিলো। তারা দুজনেই চাকুরী করে। ছোট্ট ছোট্ট তিনটি ঘর। পারিজাত মোটামুটি ভালো চাকরীই করে—সেই সংবাদ পেয়েই কলেজ জীবনের বন্ধু ক্ষিতীশ কোনো সংবাদ ছাড়াই সশরীরে বাক্স-বিছানা সমেত সাত সকালে হাজির। সে এসেছে বন্ধুর সৌজন্যে বেকারত্ব মোচনের প্রত্যাশায়। কলেজ জীবনে পড়াশুনায় তেমন ভালো ছিলো না কিন্তু পরোপকারে ওস্তাদ ছিলো ক্ষিতীশ। তার সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে অনেকটা দায়সারা গোছের আলাপ সেরে পারিজাত মন্দিরাকে তার আগমনের কারণ জানালো। এরা দুজনেই এর হুট করে এই আগমনকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারলো না। শুরু হলো প্রবল এক অন্তর্দ্বন্দ্ব। ক্ষিতীশ জানালো যে সে চাকরী হলেই মেসে চলে যাবে—শুধু চাকরী যে কটা দিন না হয় সে কটা দিন পারিজাতের আশ্রয়েই পড়ে থাকবে। মন্দিরা রেগে-মেগে ফেটে পড়লো। পারিজাত অতখানি উগ্র হতে পারলো না। কিন্তু ক্ষিতীশ তার নির্বোধ সরলতার সাহায্যে এদের দুজনের অন্তর্দ্বন্দ্বের মাঝখানে নিজের অবস্থানটিকে ধীরে ধীরে পাকা করে ফেললো। চা বানানো, বাজার করা, রেশন তোলা, কাপড় ইস্ত্রি করা, এমনকি রান্নার কাজ-কর্মও সে সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করে চললো। এইসব করেই সে অচিরেই মন্দিরার মেজাজের উগ্রতা কমিয়ে আনতেও সমর্থ হলো। আর পারিজাতের এক কালের বন্ধুই তো সে, সুতরাং পারিজাত গোড়া থেকেই ক্ষিতীশের প্রতি অল্প বিস্তর সদয় হতে পেরেছিলো। ক্ষিতীশও দিনে দিনে শেষ পর্যন্ত ওদের সঙ্গে এতোই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো যে তাকে তারা নিজেদেরই একজন বলে ধরে নিলো। গল্পের শেষ প্রান্তে এসে দেখা গেল একদিন রাতে মন্দিরা ঘরের দরজাটা লাগাতে ভুলে গেল—দরজাটা লাগাতে হয় কারণ পাশের ঘরে ক্ষিতীশ শোয়। ছোট্ট দুটি ঘর, মাঝখানে দরজা—পারিজাত নতুন বিয়ে করেছে, অতএব দরজাটা লাগাতেই হয়। পারিজাতকে ডেকে কোনো আওয়াজ না পেয়ে মন্দিরা নিজেই দুঘরের মাঝখানের ঐ দরজাটা আটকাত গেলো। তখন মন্দিরা ভাবছে—"ক্ষিতীশ কি ঘুমিয়েছে? ভীষণ ঘুম তার, কিন্তু সত্যি সে কি শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ে, রোজ? একদিনও জেগে থাকে না, একটুও না? হঠাৎ মন্দিরার মনে হলো ঐ ছিটকিনি লাগাবার শব্দটা রোজ রাত্রেই ক্ষিতীশ শুয়ে শুয়ে শোনে।" এ গল্পের আদ্য ও মধ্যভাগে যে সমস্যা

উত্তরোত্তর ঘনীভূত হলো অন্ত্যভাগে এসে তার আকস্মিক পট পরিবর্তন গল্পের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে আদৌ কোনো তাৎপর্য বহন করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। 'অপমান না অভিমান' গল্পে সামাজিক জীবনের কিছু পরিচয় আছে। রাঘববাবু 'বিলীয়মান জমিদারির মরীচিকা' থেকে মুক্ত হয়ে একদিন স্ত্রী হিরন্ময়ীর চাপে গ্রাম থেকে কলিকাতার ভবানীপুরে এসে উঠলেন। তিনি ছুতোরের কাজে দক্ষ ছিলেন। ধীরে ধীরে একদিন তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠলো 'দি ক্যালকাট ফারনিশিং কোম্পানী'। কলিকাতাবাসী অনেকের কাছেই আকর্ষণীয় একটি নাম।

রাঘববাবু মনে করলেন তাঁর পুত্র মাখন আই. এ. পাশ করে দোকানের দায় দায়িত্ব গ্রহণ করুক। কিন্তু সে ছেলে বি. এ. পাশ না দিয়ে ছাড়লো না। হিরন্ময়ী পুত্রের বিয়ের কথা ভাবা শুরু করলেন।

পাশের এক বাড়িতে বাস করেন কোনো এক কলেজের প্রফেসর সুভদ্রবাবু। তাঁর মেয়ে মালতী ম্যাট্রিকে তিনটে তারা পেয়ে এখন কলেজে পড়ছে। বাড়িতে শুধু বই আর বই। হিরন্ময়ীর সাধ জেগেছে মালতীর সঙ্গে মাখনের বিয়ে দিয়ে বংশের মোড় ঘুরিয়ে দেবেন। কিন্তু প্রফেসর-গিন্নী অপর্ণা দেবীর কাছে প্রস্তাব পেড়ে কোনো লাভ হলো না। হিরন্ময়ীর স্বামী জানতো দোকানদারের সংগে প্রফেসর কখনোই তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন না। হিরন্ময়ী ভাবলেন—করে তো প্রফেসরী, কতই বা মাইনে পায় ? তার আবার এত দেমাক!

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ডামাডোলের হিড়িকে মাখনলাল এটা-সেটায় হাত দিয়ে অল্প দিনেই ফুলে ফেঁপে উঠলো। পিতাকে অতিক্রম করে সে নিজের বুদ্ধিবলে অনেক উপরে উঠে গেল। তাল তাল সোনা আর এখানে সেখানে চড়া দামে জমি কিনে রাখলো সে। দিনে দিনে এত সমৃদ্ধি ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও হিরন্ময়ীর মন থেকে অধ্যাপক-তনয়াকে পুত্রবধূ করার সাধ ঘুচলো না। অধ্যাপকের বাড়ির হাঁড়ির খবরও রাখেন তিনি। খবর পেলেন অধ্যাপক নাকি ছয় মাস বেতন পাননি। অবস্থা খুবই করুণ। হিরন্ময়ী মনে মনে তাঁর লাখপতি পুত্রের জন্য গর্বে ফেটে পড়েন। মাখনলাল মায়ের কাছ থেকে ওদের বাড়ির কথা শুনতে শুনতে মালতীর প্রতি ভেতরে ভেতরে বেশ একটু দুর্বল হয়ে পড়ে। গভীর সমবেদনাও জাগে মালতীর প্রতি, মালতীর বাবার প্রতিও। মাখনলাল শুনতে পেলো মালতী বি. এ. পাশ করে চাকরীতে যোগ দিয়েছে। একদিন বিকেল বেলায় মাখনলাল দমদম থেকে ফিরছিলো কি একটা কাজ সেরে। ট্যাক্সিটা লালবাতি দেখে থেমে গেলো একস্থানে। মাখনলাল দেখলো মালতী আর পাঁচটা চাকুরীজীবী মহিলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে বাস-ট্রামের অপেক্ষায়। মাখনলালের ইচ্ছা হলো পাশের সিটে বসিয়ে নিয়ে যায় মালতীকে। কিন্তু মালতীর দৃষ্টি তার দিকে পড়লো না—হয়তো দেখেও দেখলো না।

হিরন্ময়ী মাখনলালকে খবর দিলেন অধ্যাপকের বাড়ি পুলিশ ঘিরে ফেলেছে—মালপত্র বাইরে বের করে ফেলে দিচ্ছে, কারণ কয়েক মাস ধরে ভাড়া বাকী পড়েছে। মাখনলাল

ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে পড়লো। এক সময় সে সোজা চলে গেল মালতীদের বাসার ভেতরে। একটা কিছু প্রতিকার করার জন্যেই সে গেল। কিন্তু অন্য পক্ষে তেমন একটা সাড়া পাওয়া গেল না। তবু মাখনলাল বকেয়া ভাড়া মিটিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই সব ঠিকঠাক করে দিলো। সব কাজই তার ইচ্ছামতো সম্পন্ন হলো। কোন কিছুই আটকালো না—শুধু টাকার জোরে। সেদিন যখন সে রাত দশটার দিকে বাসায় ফিরছিলো তখন অপেক্ষমানা মালতী তাকে দেখে দরজা খুলে ভেতরে আসতে বললো। মালতী মাখনলালকে কোনো ভূমিকা না করেই জিজ্ঞেস করলো, "এ কাজ আপনি কেন করলেন? চুপ করে আছেন কেন? জবাব দিন।" মাখনলাল জবাবে বললো, "কেন করলাম তা তো আমি জানি না। মনে হলো এটা করা দরকার, না করে পারলুম না। আমি কি অন্যায় কিছু করেছি?" মালতীর জবাব—"নিশ্চয়ই! এর পিছনে নিশ্চয়ই আপনার কোনো উদ্দেশ্য আছে।" মালতী আর এক পর্যায়ে এসে মাখনলালকে বললো, "আপনি ভেবেছেন এই করে আমাদের হাতের মুঠোয় এনে প্রতিশোধ নেবেন আমাদের উপর।" মাখনলাল এমন চপেটাঘাতের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলো না। বেচারা ভীষণ-ভাবে ভড়কে গিয়ে কোনো মতে উঠে চলে যাচ্ছিলো। কিন্তু তখনো অপমান আরো একটু বাকী ছিলো। মালতী বললো, "আপনার সমস্ত টাকা আমরা ফিরিয়ে দেবো—আপনি একথা ভাববেন না যে আমরা আপনার কাছে ঋণী—বুঝেছেন?........ আপনি কক্ষনো আর আসবেন না এ বাড়িতে ব্যাপারটা জানাজানি হবে নিশ্চয়ই— তারপর আপনি যদি যাওয়া আসা করেন আমাদের মান-সম্মান সব যাবে—" কিন্তু গল্প এখানেই শেষ হয় না। মালতীদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল মাখনলাল এবং তারপর— "বাড়ির দরজায় এসে থামলো না সে, বাড়ি ছাড়িয়ে চলে গেলো; ব্লাক আউটের অন্ধকার রাস্তায় তার প্রকাণ্ড অশোভন শরীরের অসুন্দর চলন মিলিয়ে গেলো আস্তে আস্তে—চোখে তার লেগে রইলো একটি কঠিন নিষ্ঠুর সুন্দর মুখ, কানে তার বার-বার বাজতে লাগলো একটি স্পষ্ট নিষ্ঠুর মধুর কণ্ঠস্বর—জানলো না, একতলার আলোনেবা জানালায় দুটি স্তব্ধ চোখ তাকিয়ে আছে সেই পথের দিকে, যে-পথ দিয়ে এইমাত্র সে তার বাড়ি ছাড়িয়ে চলে গেলো। জানলো না, ভাবতে পারলো না।" এ ধরনের গল্পের প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র যেমন আছে তেমনি মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয়ও নিখুঁত। গল্পের পরিসমাপ্তিতে তাঁর একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। সংশয়ের ক্ষণ-মাধুর্যে সমগ্র গল্পটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এ গল্পে মালতীর রূঢ় আচরণ অপমানেরই উদ্দেশ্যে অপমান নাকি অনুরাগের কারণে অভিমান তা সংশয়ের মধ্যেই রয়ে গেলো। বাস্তবধর্মী গল্পগুলোর পরিসমাপ্তিতে সুতীব্র চমক সৃষ্টি যে বুদ্ধদেব বসুর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তা তাঁর অন্যান্য গল্পের মধ্যে 'মধুর সমাপ্তি' 'অবিনাশবাবু' প্রভৃতি গল্পে লক্ষ্য করা যায়।

পাঞ্জাবের ছোটো একটা নেটিভ রাজ্যের রেওয়াত নামক স্থানে রাজার একটি কালেজে ভূপতি অধ্যাপনা করেন। হঠাৎ কলকাতার ট্রামে কলেজ জীবনের বন্ধু শঙ্খনাথের সংগে দ্যাখা। শঙ্খনাথ ফিল্ম তৈরী করে-'প্রথম প্রভাত' ছবি বেশ নাম

করেছে। এ সব খবর সে ভূপতিকে দেয়। একটা রেষ্টুরেন্টে বসে বসে তারা দুজনে গল্প করছিলো। শঙ্খনাথ ফিল্ম লাইনে এসে কত নামী-দামী হয়েছে তার অতিরঞ্জিত একটা ছবি খাড়া করলো ভূপতির সামনে, যাতে করে কলেজের সামান্য বেতনের একজন অধ্যাপক হাঁ হয়ে যায়। 'প্রথম প্রভাত-'এর নায়িকা অচিরার কথাটাও শঙ্খনাথ তুললো। খুব ব্যস্ত নায়িকা। রূপসীও। লোকজন তাকে দ্যাখার জন্য ভিড় করে কিভাবে—পুলিশ দিয়ে কিভাবে ভিড় ঠেকাতে হয় শঙ্খনাথ সে সব কথা বলে বেশ গর্ব অনুভব করলো। সে নিজেও দর্শকদের জ্বালায় কিভাবে বিপদে পড়ে তার কথাও জানাতে ভুললো না। ভূপতি অচিরা সম্পর্কে দুচারটে কথা নিরাসক্তভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করলো। অচিরার কোনো ছবি ভূপতি দেখে নি বলে শঙ্খনাথ ভূপতিকে যেন কিছুটা করুণা করলো। শঙ্খনাথ বুঝলো যে অচিরার মতো ট্যালেন্ট বাঙ্গালী অভিনেত্রীদের মধ্যে নেই। সে একটা উজ্জ্বল রত্ন। এমন সময় সেই অচিরাই আকস্মিকভাবে এক জমকালো ভদ্রলোকের সঙ্গে সেখানে প্রবেশ করলো। পুরো আবহাওয়টা ঝলমল করে উঠলো। শঙ্খনাথ ভূপতির সঙ্গে অচিরার পরিচয় করিয়ে দিলো—অচিরার জন্য শঙ্খনাথের গর্ব আর ধরে না। কিন্তু ভূপতি ও অচিরার মধ্যে চোখাচোখি হতেই কি যেন হয়ে গেল। কথায় কথায় শঙ্খনাথ যখন জানালো যে অচিরা ভূপতিরই পরিত্যক্ত স্ত্রী তখন ফোলানো বেলুনে যেন সুঁচ ঢুকলো। শঙ্খনাথ চুপসে গেল। যেমন গল্পের শেষ প্রান্তে এসে শঙ্খনাথের জিজ্ঞাসা—'তুমি আগে ওকে দেখেছিলে নাকি কোথাও .... কোথায় দেখেছিলে ? অত্যন্ত জড়ো-সড়োভাবে আমতা-আমতা করে ভূপতি বললে,'মানে–হয়েছিলো কী---ওকে আমি বিয়ে করেছিলাম।' একথা শুনে শঙ্খনাথের প্রতিক্রিয়া–'বিয়ে!' নিমেষে শঙ্খনাথের মুখটা ছোট হয়ে গেলো, রং হলো পোড়া কয়লার মতো, গাল ভেঙ্গে গিয়ে চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে উঠলো, ঠোঁট গেলো অনেকটা ফাঁক হয়ে, থুৎনি পড়লো ঝুলে।...." গল্পের সমস্ত অংশ ঝাঁকুনি খেলো শেষের ঐ নাটকীয় পরিসমাপ্তির কারণে।

এই নাটকীয়তা বুদ্ধদেব বসুর গল্পের প্রাণ। 'অবিনাশবাবু' গল্পের কথা ধরা যাক। মন্মথ মেসে থাকে। বি. এসসি পাশ করে ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল কোম্পানির অ্যাপ্রেনটিস নিযুক্ত হয়েছে। পাশের বাড়িতে রমাকে সে রোজ দেখে। দেখতে দেখতে তার প্রেমে পড়ে যায়। অফিসের বস্ অবিনাশ বাবু মন্মথকে ভালোবাসেন। ধাপে ধাপে তার মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে তিনি মন্মথের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। মন্মথ ভাবে বেতন বেশী না হলে রমাকে বিয়ে করার কথা মুখেও আনতে পারবে না। কিন্তু রমাকে বিয়ে করা চাই-ই। যে কোনো মূল্যে অফিস থেকে মেসে জলদি জলদি ফেরার তাগাদা অনুভব করে সে। কারণ সে রমাকে দেখতে পাবে।

মন্মথ একদিন অবিনাশবাবুর কাছে বলেই বসলো যে সে কলকাতারই একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। নাম ধাম সবই জানালো অবিনাশবাবুকে। অবিনাশ বাবু কেমন যেন একটু বদলে গেলেন মেয়েটির ঠিকানার কথা শুনে। কিন্তু তিনি মন্মথকে

উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'উঠে পড়ে লেগে যাও'। তিনি মন্মথকে আর একটি প্রোমোশন দিলেন। মন্মথ মুগ্ধ হয়ে গেল অবিনাশবাবুর ব্যবহারে। যখন তখন পকেট থেকে টাকা বের করে দেন, লাঞ্চ খাওয়ান। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেন রমার সঙ্গে কতদূর এগোলো? মন্মথ জানালো রমার বাপ তাকে বাড়ি ঢুকতে বারণ করে দিয়েছেন। অবশ্য রমা যে তাকে অনেক বাধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে একটা চিঠি লিখেছে সে কথা সে জানালো অবিনাশবাবুকে। রমার বাবা রমাকে জোর করে পাঠিয়েছেন কার্সিয়াংএ। মন্মথের তাই মন খুব খারাপ। কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে সে গেল ঢাকায় মায়ের কাছে।

ঢাকা থেকে ফিরে মন্মথ শুনলো অবিনাশবাবু বিয়ে করেছেন। বুড়ো বয়সে অবিনাশবাবুর বিয়ে! মন্মথ অবাক হলো। অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা হতেই তিনি মন্মথকে জানালেন যে সে জুনিয়ার অফিসারের প্রোমোশন পেয়েছে—বেতন আড়াইশো থেকে সাড়ে চারশো। মন্মথ মনে মনে ভাবলো অবিনাশবাবু সাক্ষাৎ দেবতা! অবিনাশবাবু তাকে তাঁর বাসায় চায়ের নেমন্তন্ন করলেন— উদ্দেশ্য নতুন বৌয়ের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

বেশ সেজেগুজে গেল মন্মথ—গেলো একটা টি-সেট হাতে করে। গল্পের শেষে গিয়ে অবিনাশবাবু তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মন্মথের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন—'এই হচ্ছে মন্মথ' অবিদা বললেন, 'আমাদের আফিশের উজ্জলতম রত্ন এটি। তোমার বাবার বাড়ির ঠিক পাশেই এর মেস..... আহা লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে গেছে বেচারা—উপহারটা ওর হাত থেকে নাও, রমা।'....... গল্পটি এখানেই শেষ হয়ে গেছে।

বুদ্ধদেব বসুর কয়েকটি তথাকথিত বাস্তবধর্মী গল্পের নমুনা তুলে ধরা হলো। এ ছাড়াও তাঁর এমন অনেক গল্প আছে যার মধ্যে তিনি চলমান জীবনের তরঙ্গ থেকে দু'একটি বুড়বুড়ি সঞ্চয় করে মনস্তত্ত্বের সুড়ঙ্গ কেটে কেটে অননুকরণীয় এক কৌশলে তাকে নিয়ে এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হন যেখানে উৎকট ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদপুষ্ট-আত্মরতি ছাড়া উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি যে সব গল্পে পরিচিত জীবনের ছবি ফুটে উঠে সেখানেও ঘটনা ও পরিবেশ শেষ পর্যন্ত কাব্যিক সুঘ্রাণে এমনভাবে সুরভিত হয় যে বস্তুতান্ত্রিক জীবনের সঙ্গে ব্যাপকতর অর্থে তার কোনো তাৎপর্য অনুসন্ধান অর্থহীন হয়ে পড়ে। যদি প্রশ্ন করা যায় বুদ্ধদেব বসুর নায়ক-নায়িকা কিংবা পার্শ্ব চরিত্রসমূহ কোন সমাজ থেকে এসেছে তাহলে তার উত্তরে বলতে হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় তারা ধনিক না হয় যথেষ্ট সচ্ছল শ্রেণীরই অন্তর্গত। নিম্নবিত্তের কিছু কিছু মানুষও তাঁর গল্পে আছে—কিন্তু দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের ব্যবধানও দূরতিক্রম্য। বুদ্ধদেব বসুর গল্পের নায়ক-নায়িকার দুঃখ-কষ্ট নিপীড়ন প্রধানত প্রেমের ব্যর্থতার কারণেই। প্রেম যেখানে সার্থক হয়েছে সেখানে দেহ-সম্ভোগের চিত্র বহুলাংশে নির্বারিত—কখনো কল্পনায়, কখনো বাস্তবে। প্রেম ও দেহ-সম্ভোগের বিষয় ব্যতিরেকে বুদ্ধদেব বসু পাংশু-প্রায়। স্মর্তব্য যে, প্রেম জীবন-বহির্ভূত কোনো ঘটনা নয়—প্রেমাবেগ তথা যৌনাবেগ মানুষের

জীবনে প্রধানতম আবেগেরই অন্তর্গত। কিন্তু প্রেম-বিরহ, হাসি-কান্না, দুঃখ-দারিদ্র্য প্রভৃতি যে কোনো বিষয়কে লেখক তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য করুন না কেন, তার সংগে যত অধিক সংখ্যক পাঠক একাত্ম হবেন লেখক হিসাবে সার্থকতা ও সাফল্য তত বেশী অর্জিত হবে। এভাবে সংযোগ স্থাপনের দায়ভাগ এড়িয়ে চলার অর্থই বৃহত্তর জীবনকে অস্বীকার করা।

সেই অস্বীকৃতির আস্ফালন বুদ্ধদেব বসুর প্রায় সব গল্প ও উপন্যাসেই কম বেশী লক্ষ্য করা যায়। দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনের চেয়ে কাল্পনিকতায় সমৃদ্ধ সুখময়, স্বপ্নময় ও মোহময় জীবন চিত্রণে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। কঠোর বাস্তবতাকে অবলম্বন করে গল্প লিখতে গিয়েও তিনি সেই কারণেই অনিবার্যভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ তাঁর 'অসমাপ্ত' 'প্রশ্ন' 'হতাশা' প্রভৃতি গল্প। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খ্যাতিমান চিত্র শিল্পীদের অঙ্কিত নগ্ন নারীমূর্তির তিল তিল অপ্রতিম সৌন্দর্যকে ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান তত্ত্বের কাঠামোয় ফেলে তার মাধ্যমে তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন স্বপ্নময় এক একটি তিলোত্তমা। তাদেরকে তিনি ধারণ ও লালন করেছেন অবচেতন মনের-আলো-ছায়ায়—বাস্তবের আলো বাতাস তাদের কাছে যেমন অপরিচিত, তেমনি অসহনীয়ও বটে।

পাঁচ

কল্লোলের সর্বাধিক খ্যাতিমান গাল্পিক প্রেমেন্দ্র মিত্র। তিনি একজন প্রথিতযশা কবিও। প্রথম মহাযুদ্ধের অন্তিম লগ্নে তাঁর বয়স ছিলো চৌদ্দ বছর। ঐ সময় থেকে তিনি তাঁর 'পাঁক' উপন্যাসটি লেখা শুরু করেন। তখনও তিনি স্কুলের ছাত্র। বছর কয়েক পর উপন্যাসটির রচনার কাজ শেষ হলে ১৯২৪ সালে তা প্রকাশিত হয়। 'পাঁক' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে গাল্পিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের মানস প্রবণতার স্বরূপ কিছুটা ধরা পড়ে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীর এম. এ. ডিগ্রীপ্রাপ্ত অশান্ত কর্মকার সেখানকার লেকচারারের পদ প্রত্যাখ্যান করে নিজের দেশে ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ান হয়ে বস্তিতে বসবাস করছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো দেশের সবচেয়ে ঘৃণ্য অবহেলিত মানুষদের দুর্দশা ও দারিদ্র্য খুব কাছের থেকে দেখা। অশান্ত কর্মকার এক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন—"আমি তো পৃথিবীতে আজ দেখছি দেশ নেই—জাতি নেই শুধু আছে দুটো বিরাট দল, একটা হচ্ছে যারা অবিচার অন্যায় করে, আর একটা যারা পৃথিবী জুড়ে এই পরগাছাদের রসদ যোগায় আপনাদের কলজের রক্ত দিয়ে......। দেশ দেশ করে চেঁচালে দেশের উন্নতি হয় না। আর যদি বা দেশ এই চিৎকারেই হঠাৎ স্বাধীন হয়ে পড়ে তাতে কি লাভ? মজুরের মুখের ভাতে পুষ্টিকর উপকরণ কতটুকু বাড়বে? চাষার ভাঙ্গা চালায় ক'টা ছিদ্র দিয়ে বৃষ্টির জল আর শীতের হাওয়া নিবারণ হবে? কুলির কদর্য, নোংরা মানুষের বাস করার অযোগ্য বস্তির কতটুকু শ্রী ফিরবে? আজকের এই উপবাসী অতিশ্রমক্লিষ্ট জীর্ণদেহ ভগ্ন-স্বাস্থ্য উৎপীড়িতদের অন্ধকার জীবনে কতটুকু আলো আসবে!

নোংরা ছোটলোকদের ঝেঁটিয়ে দূর করে দিয়ে তেমনি অক্ষম ধনীর প্রাসাদ উঠবে তাদের জীর্ণ কুঁড়েকে ব্যঙ্গ করে, তেমনি চলবে দেশ জুড়ে অত্যাচারিতের মুমূর্ষ বুকের ওপর প্রবলের বিলাস নৃত্য। কি মূল্য স্বাধীনতার ?"

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে 'পাঁক'-এর প্রকাশকাল ১৯২৪ সাল। সমকালীন বঙ্গ-দেশের আর্থ-রাজনীতিক প্রেক্ষাপটে 'পাঁক'-এর বক্তব্য খুবই বাস্তবোচিত এবং তাৎপর্যপূর্ণ। উপন্যাসটি শিল্প-শোভন-ঐশ্বর্যে কতখানি সমৃদ্ধ হয়েছে তা ভিন্নতর একটি প্রসঙ্গ—উপন্যাসের মৌল বক্তব্যের সঙ্গে সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো প্রতিফলন ঘটেছে কিনা সেটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেদিক থেকে বলা যায় যে প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯২৪ সালে প্রকাশিত এই লেখার মধ্য দিয়ে শ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের যে সমস্যাটি তুলে ধরেছেন তা যথার্থ হলেও শেষ পর্যন্ত অশান্ত কর্মকার সমাধানের কোনো ইঙ্গিত দিতে পারেন নি। পরিশেষে অশান্ত কর্মকার আশাহত হয়ে বলেছেন–'পথ জানা নেই'। কিন্তু শ্রেণী সচেতন লেখকের উক্তি কখনোই এমনটি হতে পারে না।

'পাঁক'-এর মধ্য দিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র যতখানি শ্রেণীদ্বন্দ্বের পরিচয় তুলে ধরেছেন ততখানি তাঁর অন্যান্য উপন্যাসে কিংবা ছোটগল্পে বিধৃত হয়নি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রায় গল্পেই সুস্থ সমাজ লাভের তিগ্ম অভিলাষ প্রবল হতাশার মোড়কে জমাট বেঁধে আছে। কোনো কোনো গল্প তাঁর জমাট অশ্রুর মতো—'পাঁক' উপন্যাসে যে স্বপ্ন একদিন তিনি দেখেছিলেন তাকে বাস্তবে পরিণত করার পথ তিনি খুঁজে পাননি। তাই সর্বহারা মানুষের জন্য পীড়ন ও দুঃখ অনুভব করেছেন সারাজীবন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের অধিকাংশ গল্প স্বপ্নভঙ্গের ইতিবৃত্ত মাত্র। সমাজ বড় নির্দয়, বড় নিষ্ঠুর। ধন বন্টনের অসম অবস্থার কারণে অনেক ভালো ভালো এবং সৎ মানুষের জীবনে কি অভিশাপই না নেমে আসে! তাদেরকে মরতে হয় অকালে। এ কি নিয়তির লীলার কারণে নাকি সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে ? প্রেমেন্দ্র মিত্রের কিছু কিছু গল্পে এ ধরনের শোকাবহ পরিণাম লক্ষ্য করা যায়। যেমন ধরা যাক তাঁর 'বেনামী বন্দর' গল্প গ্রন্থের 'শুধু কেরানী' নামক গল্পটির কথা। এ গল্পে এক যুবক ও তার কিশোরী 'সলজ্জ সহিষ্ণু মমতাময়ী' স্ত্রীর স্বপ্নময় জীবনের খন্ডাংশ তুলে ধরা হয়েছে। মার্চেন্ট অফিসের একজন সাধারণ কেরানী হিসাবে যুবকটির বেতন ছিলো খুবই অল্প কিন্তু তাদের দুজনের হৃদয়ে ভালোবাসা ছিলো অফুরন্ত। তাদের দুটি প্রজাপতি-মন অভাবের মধ্যে থেকেও সর্বক্ষণ রঙ্গীন পাখা মেলে উড়ে বেড়াতো। দুটি মনের স্বপ্নময় কামনা থেকে একদিন এক নতুন অতিথির আবির্ভাব ঘটলো তাদের ছোট্ট সংসারে। কপোত-কপোতীর মতো ঐ দুটি মন খুশিতে আর হাসিতে কানায় কানায় ভরে উঠলো। নবজাতকের স্পর্শ-ধন্য বাবা ও মা উভয়েই যেন মর্তলোকের ছোট্ট ঘরটিতে স্বর্গ সুখ অনুভব করলো। কিন্তু এতো সুখ তাদের সইলো না। মেয়েটি হঠাৎ করে সূতিকা রোগে আক্রান্ত হলো। যুবকটি চিন্তায় ও শঙ্কায় দিশেহারা হয়ে গেলো। দুর্ভাবনা ছাড়া আর তার আছেই বা কি! সে তার সাধ্য অনুসারে মেয়েটির চিকিৎসা করালো কিন্তু অবস্থার

ক্রমাবনতি তাকে শঙ্কিত করে তুললো। যুবকটি ভাবলো, "যদি সে এমন গরীব না হত, আরো ভালো করে ডাক্তার দেখিয়ে আর একটু চেষ্টা করে দেখত।" সত্যিই উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে মেয়েটি মারা গেল। মেয়েটি মরার আগে বলে গেল—"আমি মরতে চাইনি—ভগবানের কাছে রাতদিন কেঁদে জীবন ভিক্ষা চেয়েছি কিন্তু—" গল্পটিকে এখানেই শেষ করতে গিয়ে লেখক আরো একটি বাক্য জুড়ে দিয়েছেন—"তখন কাল বৈশাখীর উন্মত্ত মসীবরণ আকাশে নীড় ভাঙ্গার মহোৎসব লেগেছে।" এই হচ্ছে গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের রোমান্টিক মানস প্রবণতা। কঠিন বাস্তবতার নিদারুণ চাপকে গল্পের কোনো এক পর্যায়ে তিনি জ্যাবদ্ধ ধনুকের মতো টানটান করে তুলে ধরেন—কিন্তু শর নিক্ষেপের দায়িত্ব তিনি পাঠকের হাতেই ছেড়ে দেন। অবশ্য কোনো কোনো গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র স্বকীয় ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী আমাদের বাস্তব জীবনের প্রভূত সমস্যার সঠিক কারণ নির্ণয়েও ব্রতী হয়েছেন। 'পুন্নাম' গল্পটির কথাই ধরা যাক। তাঁর বিশ্বাস হিংসা, দ্বেষ ও লোভের উদগ্র অভীপ্সা থেকেই আমাদের সমাজ জীবনে এত নোংরামি, এত অবিচার ঘটছে। ললিত ডকের মাল তোলা ও নামানোর একজন সামান্য সরকার। আয়-রোজগার খুবই কম। স্ত্রী ছবি ও পাঁচ বছরের একটি ছেলেকে নিয়ে তাদের ছোট্ট সংসার। রোগাক্রান্ত ছেলেটি সর্বদাই জেদ করে, কেঁদে কেঁদে পাড়া মাথায় করে । ডাক্তার বলেছেন চেঞ্জে নিয়ে যেতে—নতুবা ছেলেটি মারা যাবে। ললিত ও ছবির মনের মধ্যে তাদের মানস সন্তানটিকে নিয়ে কতোই না উচ্চাশা! ঐ ছেলেই মানুষের মতো মানুষ হবে একদিন। অতএব শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর অগোচরে ললিত অপিসের একটা মোটা অঙ্কের টাকা আত্মসাৎ ক'রে স্ত্রী ও পুত্রকে চেঞ্জে নিয়ে গেল। চেঞ্জে গিয়ে সত্যি সত্যি অল্প কিছুদিনের মধ্যে ছেলেটির স্বাস্থ্যের আশাতীত উন্নতি হলো। পার্শ্ববর্তী দরিদ্র প্রতিবেশীর টুনু নামের এক ছেলের সঙ্গে এর মধ্যেই এদের মানসপুত্রটির বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। তারা দুজনে খেলা করে প্রায় সময়। দুজনে একসংগে খেতেও বসে কোনো কোনো সময়। ললিত দেখতে পেলো খেলার সময় তাদের সন্তানটি টুনুর উপর অনুচিত আধিপত্য ও প্রভুত্ব বিস্তার করে। টুনুকে কিছু খেতে দিলে থাবা মেরে তাদের সন্তান বলপূর্বক তা কেড়ে নেয়। প্রভুত্বকামী ও বলদর্পী ঐ ছেলের মনের হিংসা-দ্বেষ ললিতের সমস্ত আশাকে গুঁড়িয়ে দিলো।

হঠাৎ অসুখের কারণে টুনু নামের ছেলেটি মারা গেল। মারা গেল আসলে অচিকিৎসা ও অপুষ্টির কারণে। ঐ সংবাদে ললিতের বুক অসহনীয় যন্ত্রণায় কেঁপে কেঁপে উঠলো। ছবিকে বল্লো, "আমরা অনেক ত্যাগ করেছি, অনেক সয়েছি, আমাদের ছেলে বাঁচবেই যে ছবি! আমাদের ছেলের মতো আরো কোটি কোটি ছেলে বাঁচবে, বড় হবে, রেষারেষি, মারামারি, কাটাকাটি করে পৃথিবীকে সরগরম করে রাখবে; নইলে আমাদের এত চেষ্টা, এত কষ্ট স্বীকার যে বৃথা ছবি"! প্রেমেন্দ্র মিত্র হিংসান্মোত্ত পৃথিবীর ঘরে ঘরে অবস্থিত প্রভুত্বকামী ও বিদ্বেষ-বিষাক্ত শিশুদের পানে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করাতে চেয়েছেন। এরাই বড় হয়ে টুনুর মতো দুর্বল লোকদের পাদনত ক'রে পৃথিবীটাকে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর অধিকাংশ গল্পেই সমাজ জীবনের অবক্ষয়ের কোনো না কোনো দিককে তাঁর অননুকরণীয় কাব্যিক ষ্টাইলে তুলে ধরেছেন। গাল্পিক প্রেমেন্দ্র মিত্র শ্রেণীদ্বন্দ্ব কিংবা শ্রেণী-সংঘর্ষের রূপকার নন—নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের দারিদ্র্য কবলিত জীবনে হঠাৎ দুর্মোচ্য অভিশাপের মতো বিপদ নেমে এসে কিভাবে জীবনটাকে দুমড়ে মুচড়ে দেয়, কিভাবে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেয় তার চিত্রায়ণেই তিনি সিদ্ধহস্ত। সমকালীন জীবন-যন্ত্রণার এক বিষাদগ্রস্ত কথক তিনি। কিন্তু এই বিষাদময়তা তাঁকে সমসাময়িক আর পাঁচজন গাল্পিকের মতো মিথুনাসক্ত করে তোলেনি। যৌন সর্বস্বতাবাদের উন্মাতাল তরঙ্গে তিনি গা ভাসিয়ে দেন নি—সেটা তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিলো না কারণ তাঁর মানস কাঠামোটি ছিলো ভিন্ন প্রকৃতির। চোখের জলে ক্লেদাক্ত সমাজের অভিশাপ থেকে তিনি মুক্ত হতে চেয়েছিলেন—বিধাতার অশ্রু-প্লাবনে একদিন মানুষের লোভ ও হিংসা সমূলে উৎপাটিত হবে এবং সমাজে তখন অনাবিল শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এমন বিশ্বাসও প্রেমেন্দ্র মিত্রের মনে বদ্ধমূল ছিলো। আসলে তিনি আমাদের 'কুৎসিত, জঘন্য, ভয়ঙ্কর, পঙ্কমাখা, শীর্ণ, হিংসাশ্রিত, বিক্ষত, কদকার ও লালসাজর্জর' সমাজটিকে বদলাতেই চেয়েছিলেন কিন্তু পথ তাঁর জানা ছিলো না বলেই তিনি তাঁর নিজস্ব রোমান্টিক রীতিতে ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ও তার মানুষের জীবনের অসঙ্গতিগুলো আভাসে-ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিতেই সবিশেষ আগ্রহী ছিলেন। এই কারণে দেখা যায় তাঁর ছোটগল্পে বাস্তব জীবনের প্রভূত সমস্যা আছে কিন্তু সমাধানের কোনো ইঙ্গিত নেই। গল্পগুলি প্রায়শই অর্থনীতির তরঙ্গ-তাড়নের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট হলেও তার অধিকাংশই সুগভীর হতাশ্বাসে ভরা করুণ ক্রন্দনের মতো অন্তর্ভেদী হয়ে উঠেছে। তবু একথা স্বীকার্য যে কল্লোলের সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজন গাল্পিকের মধ্যে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় একজন।

ছয়

আগেই বলা হয়েছে কল্লোলের প্রাণধর্মের প্রধান লক্ষণ ছিলো প্রবল বিরুদ্ধবাদ ও যৌনসর্বস্বতাবাদ। সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত মানুষের প্রতি সহমর্মিতাবোধই কারও কারও গল্পের অঙ্গীভূত হয়েছিলো। কিন্তু পূর্বের প্রচলিত সামাজিক নীতি ও আদর্শকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কল্লোলীয় অধিকাংশ লেখকই নিজস্ব খেয়াল ও মর্জি অনুযায়ী বাধাবন্ধনহীন সাহিত্যচর্চায় রত হয়েছিলেন। সমকালীন রাজনীতি ও অর্থনীতির সামগ্রিক কাঠামোটিতে যখন চরম নৈরাজ্য, ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিলো এবং কংগ্রেস তার পৌনঃপুনিক প্রচেষ্টায় সেই ভাঙ্গন ও অবক্ষয়কে প্রতিরোধ করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলো তখন এক শ্রেণীর লেখক বাধাবন্ধনহীন যৌনসম্ভোগের মধ্য দিয়েই প্রবল হতাশার বিস্মৃতি কামনা করলেন। সমাজ বিচ্ছিন্ন মানসিকতায় পরিতৃপ্ত ও আত্মকুণ্ডয়নে পরিতুষ্ট বুদ্ধদেব বসু সেই কারণে এসকেপিষ্ট হওয়াটাকেই শ্রেয় মনে করেছেন এবং তিনি নিজেকেই বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্নরূপে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে।

পাশাপাশি সময়েরই খ্যাতিমান সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অবিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মানসিকতা ছিলো কিছুটা স্বতন্ত্র ধরনের। তাঁকে এক অর্থে সমাজবিচ্ছিন্ন লেখক বলা যায়—কিন্তু কোনো এক পর্যায়ে গিয়ে তাঁর সম্পর্কে ঐ উক্তি ঢালাওভাবে একবাক্যে করা চলে না। অচিন্ত্যকুমারের আত্মনিষ্ঠতা বুদ্ধদেব বসুর মতো আত্মরতিসর্বস্ব বা পাতালচারী নয়। প্রেমই তাঁর সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। এ প্রেম স্বর্গীয় মাধুর্যে উদ্ভাসিত হয় না—এ-প্রেম বাধা বন্ধনহীন যাযাবর প্রেম। ঐতিহ্যলালিত প্রেমের পবিত্রতাকে তিনি অস্বীকার করেছেন। তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় এক ধরনের কাব্যিক সৌরভ আছে—গল্প ও উপন্যাসের আঙ্গিকেও আছে আশ্চর্য এক মনোহরণকারী অভিনবত্ব। তাঁর উপন্যাস 'বেদে' প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্প 'গুমোট'—১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়।

কন্টিনেন্টাল সাহিত্যে খ্যাতিমান অনেকের মধ্যে হ্যামসুন তাঁকে প্রথম জীবনে বেশী নাড়া দিয়েছিলো। ১৯৩০ সালে তিনি হ্যামসুনের 'প্যান' বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। শুধু হ্যামসুন নয়, লরেন্স, যোহান বোয়ার প্রভৃতি লেখকও তাঁকে প্রভাবিত করেছিলো। প্রভাবিত করেছিলো আরো অনেকে। এমনকি ভিন্ন মেরুর গোর্কিও। বিশ্বের অনেক খ্যাতিমান লেখকের মধ্যে নিজেদেরকে পরিব্যাপ্ত করার এষণা তখন কল্লোলীয় বহু লেখককেই দারুণভাবে পেয়ে বসেছিলো। অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'কল্লোলযুগ' নামক গ্রন্থের একস্থানে বলেছেন, "যেহেতু আমরা সাহিত্যিক সেহেতু সমগ্র বিশ্বজনের আত্মজন এমন একটা গর্ব ছিলো মনে-মনে। সমস্ত রসপিপাসু মনের আমরা প্রতিবেশী। আমাদের জন্যে দেশের ব্যবধান নেই, ভাষার অন্তরায় নেই। আমাদের গতিবিধি পরিধিহীন।" প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯২৬ সালের কোনো এক সময়ে এক পত্রে লিখেছিলেন, "জীবনকে দেখবার পাঠ নিতে যদি হ্যামসুন গোর্কির পাঠশালায় গিয়ে থাকি তাতে দোষ কি......"। বলা সঙ্গত যে গোর্কি ও হ্যামসুনকে মেলাতে চাওয়া অপরাধ না হলেও অসম্ভব তো বটেই, কিন্তু কল্লোলীয় লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে তোলার চেষ্টাই করেছিলেন। এর মধ্যে যে অসঙ্গতি ও ফাঁক রয়ে গেছে সেটি যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্র ধরতে পারেননি তেমনি ধরতে পারেননি অচিন্ত্যকুমারও। সেই কারণেই অচিন্ত্যকুমার যেমন তাঁর প্রথম পর্যায়ে 'বেদে'র মতো উপন্যাস লিখতে পারেন তেমনি আবার মধ্যপর্যায়ে গিয়ে লিখতে পারেন 'যতন-বিবি', 'চাষা-ভূষা', 'হাড়ি-মুচি-ডোম', ইত্যাদির মতো গল্প এবং প্রায় শেষ পর্যায়ে গিয়ে 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'-এর মতো চরম অধ্যাত্মবাদী জীবন কাহিনী রচনা করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়।

অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে' উৎকট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Intensified Individualism) ও সমাজ-বন্ধনহীন যাযাবরী মানসিকতারই ফসল। যাযাবরী মানসিকতায় যৌন-জিজ্ঞাসা ও যৌন সম্ভোগের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে পৃথিবীর বরেণ্য সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা যাযাবরী মানসিকতাকে লালন করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্যের

কোনো না কোনো অংশে যৌন সম্ভোগের বিষয়টি সগৌরবে প্রাধান্য দিয়েছেন। হ্যামসুন তাঁদের মধ্যে একজন। অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'বেদে' উপন্যাসের মধ্যে যে নির্বারিত যৌনচর্চায় লিপ্ত হয়েছেন তার প্রেরণা মুখ্যত হ্যামসুন থেকেই এসেছে। জোয়ারের জলে ভেসে আসা কাঞ্চনের যাযাবরী জীবনে নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্যই নেই। দৈহিক ক্ষুধার তাড়নায় কাঞ্চন তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আহলাদি, আসমানী, বাতাসী, মুক্তা, বন জ্যোৎস্না ও মৈত্রেয়ী–এই ছয়জন নারীর নিবিড় সংস্পর্শে এসেছে। কাঞ্চন, কারও সঙ্গেই একনিষ্ঠ প্রেমের গভীর সম্বন্ধে আবদ্ধ হতে চায়নি—তার উন্মুল বাসনা তাকে নিরন্তর এক নারী থেকে অন্য নারীর কাছে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, "(কাঞ্চন) বিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলে মাত্র। বিবাহের বন্ধন, অন্ধ সংস্কার আর একঘেয়ে জীবনযাত্রার নিষ্পেষণে প্রেম মরে যায়। বিবাহিত দম্পতির পক্ষে ভালোবাসাটা একটা সংস্কার মাত্র।" কল্লোল পত্রিকার প্রকাশকাল থেকেই (১৯২৩) গোকুলচন্দ্র নাগের 'পথিক' নামক একটি উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে। ঐ গ্রন্থের নায়ক বিকাশ একস্থানে বলছে, "গতানুগতিক কথা অনুসারে বিয়ে বা স্ত্রী পুরুষের শারীরিক একটা সম্বন্ধের বন্ধনই সব নয় মানুষের পক্ষে। ওর ভিতর দিয়ে জীবনের বিকাশ হয় না।" শরৎচন্দ্রও গোকুলচন্দ্রের পূর্বে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্যে সমাজ ও সামাজিক বিবাহকে গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও হৃদয়ের প্রসারতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছেন। শরৎচন্দ্র অবশ্য শেষদিকে, বিশেষ করে 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে বুদ্ধিবাদী কমলের মুখ দিয়ে স্পষ্টই বলেছেন, "বিবাহের স্থায়িত্ব আছে, নেই তার আনন্দ।" এঁদের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী ও বক্তব্য অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে অবশ্যই কিছুটা প্রভাবিত করেছে। তবে তাঁর উপর দেশীয় লেখকের চেয়ে বৈদেশিক লেখকের প্রভাব অনেক বেশী ছিলো বলে মনে হয়। উল্লেখ্য বিষয় এই যে গোকুলচন্দ্র কিংবা শরৎচন্দ্রকেও তাঁদের বোহেমীয় মানসিকতা অর্জনের ব্যাপারে বিদেশী সাহিত্যের দ্বারস্থ হতে হয়েছিলো। অচিন্ত্যকুমার তাঁর আত্যন্তিক- রোমান্টিকতার ঝাঁঝালো বৈশিষ্ট্যের কারণে যৌন চেতনার উল্লাসকে নির্বারিত করে তুলেছেন। মাত্রাহীন, পরিধিহীন সেই উল্লাসের কারণেই প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে 'কাক জ্যোৎস্না' উপন্যাসের বিধবা নমিতা অজয়কে বলছে, "চরিত্র আমি মানি না। মানি আমার মনকে। সেই আমার মণি, সেই আমার সব।" 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' উপন্যাসের নায়ক প্রভাত তার প্রেমিকা অশ্রুকে বলছে, "মানুষের যতো কিছু বৃহত্তর উপলব্ধি সব এই Sex-এর সাহায্যেই ঘটছে। ধরো প্রেম। প্রেম ত' Sex ছাড়া কিছুই নয়।" মনোবিকলনের স্পর্ধিত উল্লাসে উপন্যাসের মধ্যেই তাঁর প্রথম পর্যায়ের গল্পের মধ্যেও ফ্রয়েড ও এলিসের সাড়ম্বর উপস্থিতি লক্ষণীয়। তবে সেখানে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ-নৈপুণ্য পাঠকের কাছে ভিন্নতর একটি আকর্ষণ। তাঁর ভাব ও ভাষার রোমান্টিকতা এমন এক ধরনের পরিমন্ডল সৃষ্টি করে যার ছোঁয়া লেগে সংসারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাগুলোও সহজেই কাব্যিক সুঘ্রাণে ভরে ওঠে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ'গ্রন্থের এক

স্থানে ভাষা প্রসঙ্গে বলেছেন, "কল্লোল'কে নিয়ে যে প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস এসেছিল তা শুধু ভাবের দেউলে নয়, ভাষারও নাট মন্দিরে। অর্থাৎ 'কল্লোলের' বিরুদ্ধতা শুধু বিষয়ের ক্ষেত্রেই ছিল না, ছিল বর্ণনার ক্ষেত্রেও। ভঙ্গি ও আঙ্গিকের চেহারায়। রীতি ও পদ্ধতির প্রকৃতিতে। ভাষাকে গতি ও ভাবকে দ্যুতি দেবার জন্যে ছিল শব্দ সৃজনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। রচনাশৈলীর বিচিত্রতা।" অচিন্ত্যকুমারের প্রায় প্রত্যেকটি গল্প ও উপন্যাসের ভঙ্গি ও আঙ্গিকের অভিনবত্বের মধ্যে তাঁর উপর্যুক্ত বক্তব্যেরই সমর্থন পাওয়া যায়। সমকালীন সমাজ ও তার হতাশা কবলিত পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে অচিন্ত্যকুমার সযত্ন-প্রয়াসে প্রথম পর্যায়ের গল্পগুলিতে মিথুন প্রবৃত্তির প্রগাঢ় চর্চায় মেতে উঠেছেন। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত 'টুটা-ফুটা' গল্প গ্রন্থের গল্পগুলো পড়লেই এ কথার সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। ভাবগত দিক থেকে গল্পগুলোকে 'বেদের'ই অনুসৃতি বলা চলে। 'বেদে'র এক পর্যায়ে আছে যাযাবরী প্রেম, কিন্তু অন্য পর্যায়ে আছে শহরের ভাসমান কতগুলি নিপীড়িত মানুষের মুখচ্ছবি। শ্বাসরোধকারী বস্তিতে বসবাসকারী বিকাশ, বিনোদ, সৌম্য ও বন জ্যোৎস্নার ব্যর্থ জীবনও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। দ্বিতীয় মহাসমরোত্তর কালে রচিত 'কাঠ খড় কেরোসিন', 'যতন বিবি'. 'সারেঙ', 'হাড়ি মুচি ডোম', 'চাষাভূষা' ইত্যাদিতে এদেরই সম্প্রসারিত রূপ লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য তা একটু ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন ভঙ্গিতে। চাকুরীর কারণে বঙ্গদেশের বিভিন্ন মফঃস্বল অঞ্চলে তাঁকে যেতে হয়েছে—সেই সুযোগে তিনি সমাজের প্রত্যন্ত এলাকার অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে অভিজ্ঞতার তুলনায় কল্পনাই ছিলো তাঁর প্রধান অবলম্বন—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে রচিত উপর্যুক্ত গল্প সংগ্রহ সমূহের গল্প পড়লেই তার সত্যতা অনুধাবন করা যায়। এ সমস্ত গল্পে সমকালীন আর্থ-রাজনীতির পরিমণ্ডল ও প্রতিবেশের প্রতিফলন ঘটলেও সামগ্রিক অর্থে বাস্তবতার তাৎপর্য দুর্লক্ষ্য-প্রায়। পূর্ববঙ্গের চাষীদের তে-ভাগা-আন্দোলন-কেন্দ্রিক জীবন নিয়ে গল্প লিখে একদা অচিন্ত্যকুমার বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী জীবনের আশা-নিরাশা এবং তাদের দাম্পত্য জীবনের সুমধুর ছন্দ ও দ্বন্দ্বাভিঘাত সফল কলানৈপুণ্যে তাঁর গল্পে চিত্রায়িত হয়েছে। কিন্তু সেখানে তিনি যেমন এক অর্থে সমাজ বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সমাজের সামগ্রিক ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে ঐ জীবনের যেমন প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই, তেমনি চাষী কিংবা সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের চিত্রাঙ্কনেও অচিন্ত্যকুমার শিকড়-স্পর্শী অভিজ্ঞতার পরিচয় তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। চাষী-মজুরদের নিয়ে তাঁর গল্প বলার ভঙ্গি অপরূপ, অনবদ্য। কিন্তু তবুও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যকে সমর্থন করেই বলতে হয়— "অচিন্ত্যকুমার ভালো গল্প লিখতেন,... সমাজ ভাঙা জর্জর বাংলার চাষীজীবনের আসল বাস্তবতা কোথায় তাঁর সাহিত্যে? কোথায় বাঁচার সংগ্রাম, যা তাদের হাসি-কান্না আনন্দ বেদনা প্রেম বিরহ নীতি দুর্নীতি কলহ বিবাদ একতা প্রতিরোধ—জীবনের সমস্ত অভিব্যক্তিকে প্রভাবান্বিত করেছে"?

অচিন্ত্যকুমার সাধারণ মানুষের কাছাকাছি এসে গল্প লেখার জন্য যত্নবান হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু তিনি তাদের বেঁচে থাকার সংগ্রামের প্রকৃত স্বরূপটিকে ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। তাছাড়া তাঁর কবি-কল্পনা এবং বাচনিক কাব্যময়তা তাঁর উপন্যাস ও গল্পের প্রতিটি শব্দকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছে যে তাতে ভাববাদের পাশাপাশি ভাষাও অধিক প্রাধান্য বিস্তার করেছে। শব্দ নিয়ে খেলতে খেলতে তিনি বারংবার কাহিনীর মূল লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন এবং তাঁর শব্দপ্রেমের একনিষ্ঠতা ও তন্ময়তা তাঁকে প্রায়শই প্যাসিভ রোমান্টিসিজমের মোহ গর্তে নিপেক্ষ করেছে। একজন সমালোচক তাঁর মন্বন্তর ও দ্বিতীয় মহাসমরোত্তর গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন, "সাধারণ মানুষের কাহিনী সাধারণ মানুষের ভাষায় তিনি প্রকাশ করলেন বটে; কিন্তু সে অসাধারণ মানুষেরা অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সুযোগ নিয়ে যে-বিপর্যয় টেনে আনল এবং সেই আসাধারণ মানুষদের বিরুদ্ধে অজ্ঞ অচেতন মানুষেরাও যে নিরন্তর সংগ্রাম করে গেল, অচিন্ত্যকুমার যে সবের খবর জানতেন না। ফলে তাঁর গল্পগুলো পুরোপুরি রক্তমাংসের গল্প হল না, হল গল্পের কাঠামো। তাদের মধ্যে পাঠকের মনে খানিকটা সহানুভূতি সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোন গভীরতর আবেদন, কোন সম্পূর্ণতার জীবন বোধ প্রকাশ পেল না। এরা যেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের বন্যার্তদের সাহায্যকল্পে অভিযানের জন্য রচনা করা ছড়া।" শেষ বাক্যের তীব্র-তিক্ত শ্লেষটুকু তাঁর ভাববাদী গ্রন্থ ' পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ', প্রণয়নের জন্য যথার্থভাবেই প্রাপ্য।

'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার বলেছিলেন—"রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল'। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।" অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্য যারা খোলার বস্তিতে কিংবা ফুটপাতে বাস করে তাদেরকে গল্পাঙ্গনে প্রথম ঠাঁই করে দিয়েছিলেন মনীশ ঘটক—যাঁর ছদ্মনাম যুবনাশ্ব। কয়লাকুঠির জগৎ যিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম আবিষ্কার করলেন তিনি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তাঁর সম্পর্কে আলোচনায় পরে আসছি। মনীশ ঘটককে অচিন্ত্যকুমার কল্লোলের প্রথম মশালচী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অচিন্ত্যকুমার বলেছেন, "এ একেবারে একটা নতুন সংসার, অধন্য ও অকৃতার্থের এলাকা। কানা খোঁড়া ভিক্ষুক গুণ্ডা চোর আর পকেটমারের রাজপাট। যত বিকৃত জীবনের কারখানা। বলতে গেলে মনীশই "কল্লোলের" প্রথম মশালচী। সাহিত্যের নিত্যক্ষেত্রে এমন সব অভাজনকে সে ডেকে আনল যা একেবারে অভূতপূর্ব। তাদের একমাত্র পরিচয় তারাও মানুষ, জীবনের দরবারে একই সই-মোহর-মারা একই সনদের অধিকারী। মানুষ ? না, মানুষের অপচ্ছায়া ? যে জীবন ভগ্ন, রুগ্ন, পর্যুদস্ত, তাদেরকে সে সরাসরি ডাক দিলে, জায়গা দিলে প্রথম পংক্তিতে। তাদের নিজেদের ভাষায় বললে তাদের যত দগদগে অভিযোগ, জীবনের এই খলতা এই পঙ্গুতার বিরুদ্ধে

কষায়িত তিরস্কার। দেখালে তাদের ঘা, তাদের পাপ, তাদের নির্লজ্জতা। সমস্ত কিছুর পিছনে দয়াহীন দারিদ্র্য।" অচিন্ত্যকুমার পাশাপাশি এও স্বীকার করেছেন—"ঐ সব গল্পে হয়তো আধুনিক অর্থে কোনো সক্রিয় সমাজচেতনা ছিল না, কিন্তু জীবন সম্বন্ধে ছিল একটা সহজ বিশালতাবোধ।" মনীশ ঘটকের সাহিত্য প্রেরণার মূল উৎস রুশ সাহিত্য—ম্যাক্সিম গোর্কির সাহিত্যের শোষিত ও বঞ্চিত মানুষই তাঁকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছে। কলকাতা মাহনগরে অবস্থিত পটলডাঙ্গায় বস্তি এলাকাসমূহ ঘুরে ঘুরে মনীশ ঘটক নরক আবিষ্কার করেছেন। লোলুপতায়-নিষ্ঠুরতায়, হাস্যে-লাস্যে সম্ভোগে-সঞ্চয়ে উন্মাতাল রূপনগর কলকাতাতেই অবস্থিত পটলডাঙ্গা নামক একটি নরক থেকে নফর, ফকরে, কুঠে বুড়ি, সদি, গুবরে, নুলো, খেঁদি পিসি প্রভৃতির মতো মীনুষ্য কীটসমূহেকে আমাদের মতো তথাকথিত সভ্য মানুষের সম্মুখে তুলে ধরে তিনি তাঁর মানবতাবাদী মনেরই পরিচয় দিয়েছেন। মনীশ ঘটক বস্তির নারকীয় জীবনের বীভৎস চিত্র আঁকতে গিয়ে তাঁর পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বাধা বন্ধনহীন যৌন চর্চার প্রশ্রয় দিয়েছেন। পঙ্কিল জীবনের আবর্তে সমাজ-শাসিত যৌন জীবনের নীতিমালা ভেসে যায়—তখন কোনো মতে বেঁচে থাকার প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠে। 'কালনেমি' গল্পের ময়নার স্বামী ডাকুর রেলে পা কেটে যাওয়ায় সে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। তারা আশ্রয় নেয় পটলডাঙ্গায়। খেঁদি পিসি তাদের আশ্রয়দাত্রী। ময়না সেখানে রতন এবং অপরাপর বস্তিবাসী যুবকদের লালসার শিকার হলো। শোকাহত ময়নাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে খেঁদি পিসি বলছে, "পেট চালাবার জন্যে পতেই বেরুতে হচ্ছে যকন, তকন কি আর সোয়ামী ইস্তিরী ওসব ভড়ং চলে ? ভদ্দর লোকি করতে হ'লে তার ঠাঁই আলাদা।" পঙ্গু ও অকর্মণ্য ডাকু তাঁদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কারণেই শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর বেশ্যাবৃত্তিতে নিজেই উদ্যোগী হলো। কুৎসিত জীবনের তমসাচ্ছন্ন দিকগুলো মনীশ ঘটক তাঁর সহানুভূতিশীল মন নিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন। 'রাতাবিরেতে', 'মৃত্যুঞ্জয়', 'মন্ত্রশেষ' 'ভূখা ভগবান' ইত্যাদি গল্পে তিনি যাদেরকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন তারা সবাই শুধু কদর্য পঙ্কিল জীবনের সঙ্গেই পরিচিত—অন্ধকার সেই প্রদেশে সভ্যতার আলো প্রবেশ করতে যেন ভয় পায়। কিন্তু তমসাচ্ছন্ন সেই প্রতিবেশেও মনীশ ঘটক মনুষ্যত্বের সূক্ষ্ম ও সুতীক্ষ্ণ আলোক রেখাটিকে চিনে নিতে ভুল করেননি। 'মৃত্যুঞ্জয়' গল্পের নায়ক চঞ্চু একজন ত্রাস সৃষ্টিকারী গুণ্ডা। একদিন এক বোবা মেয়েকে সে তার আখড়ায় ধরে নিয়ে এলো। মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে চঞ্চুর মনে এক আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো। মেয়েটিকে সে বোন হিসেবে গ্রহণ করলো। দলের অন্যান্য গুণ্ডারা তাদের দলপতিকে অবিলম্বে মেয়েটিকে বিদায় করে দেওয়ার জন্যে অনুরোধ জানালো। কিন্তু চঞ্চু মেয়েটিকে এমন নিবিড়ভাবে ভ্রাতৃস্নেহে জড়িয়ে ফেলেছিলো যে তাকে পরিত্যাগ করার কথা চিন্তাই করতে পারলো না। একদিন সবার অলক্ষ্যে চঞ্চু মেয়েটিকে নিয়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলো। স্নেহ ও ভালবাসা মনুষ্যত্বেরই অঙ্গ—তার অনির্বাণ শিখাটি মানবেতর জীবন যাপনের মধ্য

দিয়েও চকিত কোনো এক মুহূর্তে দৃষ্টিগোচর হলেও হতে পারে। আসলে প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরে মনুষ্যত্বের কিছু গুণাবলী বর্তমান থাকে, শুধু বাইরের অবস্থার চাপে তা প্রকাশ পায় না। চঞ্চু নিষ্ঠুর প্রকৃতির একজন গুণ্ডা—মানুষ খুন করে টাকা আত্মসাৎ করাটাই তার পেশা। কিন্তু মনুষ্যত্বের চরম অবমাননার কাছে লিপ্ত থেকেও সে তার নিরন্ধ্র অন্ধকারে আবৃত অন্তরতলে আলোকোজ্জ্বল এক টুকরো মানিকের মতো মমতাশ্রয়ী-মনুষ্যত্বকে লালন করেছিলো। তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সে নিজেই কোনোদিন সচেতন ছিলো না। বোবা মেয়েটির সংস্পর্শে আসার পরই অন্ধকার ভেদ করে সেই আলো বিচ্ছুরিত হলো।

মনীশ ঘটকের গল্পগুলি পাঠ করলে সমাজের সবচেয়ে ঘৃণিত ও কদর্য মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় ঠিকই কিন্তু কেন তাদের ঐ অবস্থা, ঐ দুর্দশার জন্য দায়ী কারা, সেইসব দায়ী ব্যক্তিদের সঙ্গে এদের শ্রেণীগত দ্বন্দ্বের স্বরূপ কি—এ সমস্ত বিষয়ে কোনো উল্লেখই নেই তাঁর গল্পে। পটলডাঙ্গার বস্তিতে যারা নর্দমার কীটের মতো তাদের অস্তিত্বকে কোনোমতো টিকিয়ে রেখেছে তারা সমাজের বাইরের বিচ্ছিন্ন কোনো প্রাণী নয়—গোটা সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার চাকায় তাদের জীবন বাঁধা রয়েছে। দেশের সামগ্রিক আর্থ-রাজনীতির চক্রে তারাও আবর্তিত হচ্ছে। মনীশ ঘটক বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পে সর্বপ্রথম অপজাত অবজ্ঞাত মানুষদের অর্থাৎ যারা ভিক্ষুক, গুণ্ডা, চোর, পকেটমার, কানা-খোঁড়া, রুগ্ন ও পর্যুদস্ত তাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন এবং সে জন্য তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য, তবু বলা সঙ্গত যে তিনি তাঁর বাস্তবতাকে সমগ্রতার সেতুবন্ধনে আবদ্ধ করতে পারেননি। এছাড়া শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে মনীশ ঘটকের সীমাবদ্ধতার কথাটিও স্মরণ রাখা দরকার।

সাত

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও মনীশ ঘটকের মতোই তাঁর ছোট গল্পে এনেছেন অপজাত ও অবজ্ঞাত লোকদের। তিনি তাঁর কয়লাকুঠির রাজ্যে এমন সব লোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন যাদেরকে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে এর আগে দেখা যায়নি। তারা সাঁওতাল, কুলি মজুর। প্রথম মহাসমরোত্তর কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের সংস্পর্শে আসার পর থেকে বঙ্গদেশের কিছুসংখ্যক সাহিত্যিক সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে নতুন দিক দর্শন খুঁজে পেয়েছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরার জন্য তাঁরা মেতে উঠেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু পরিবর্তন আনলেন একভাবে, প্রেমেন্দ্র মিত্র আনলেন আর একভাবে, অচিন্ত্যকুমার এনেছেন ভিন্নতর কৌশলে। মনীশ ঘটকের ক্ষেত্রেও দেখা গেল তিনিও বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পে সমাজের সবচেয়ে ঘৃণিত ও কদর্য মানুষদের টেনে আনলেন। শৈলজানন্দও তাঁর গল্পের ক্ষেত্রে এক নতুন স্বাদ, নতুন আমেজ তৈরী করলেন। এঁদের সবার চোখে তখন নতুন স্বপ্ন। নতুন নতুন দিগন্ত আবিষ্কারের নেশায়

তাঁরা দিশেহারা। জীবন ও জীবনের বাস্তবতা অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা সচেতনভাবে রোম্যান্টিসিজমের রঙ্গীন চশমা ব্যবহার করলেন—ফলে আমরা তাঁদের কাছ থেকে অল্প বিস্তর প্যাসিভ রোম্যান্টিসিজমের মোহ মাখানো মানুষদেরকেই পেলাম। রোম্যান্টিক রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে বাস্তববাদী হতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁদের অনেকেই রোম্যান্টিসিজমকেই আরো গভীরভাবে লালন করলেন। এদিক থেকে একমাত্র মনীশ ঘটকই কিছুটা ব্যতিক্রমী গাল্পিক বলা যায়। কিন্তু তাঁর সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গটিও অবশ্য স্মরণীয়। শৈলজানন্দ তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরুতেই মনীশ ঘটক কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতোই অপজাত ও অবজ্ঞাত মানুষের সন্ধানে বের হয়ে ছিলেন। মনীশ ঘটক গেলেন কলকাতার পটলডাঙ্গায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র গেলেন (প্রথম উপন্যাসে) ঐ মহানগরেরই মুচি পাড়ায় এবং শৈলজানন্দ কলকাতা ছাড়িয়ে চলে গেলেন রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলে। কলকাতা থেকে রাণীগঞ্জের ভৌগোলিক দূরত্ব অনেক হলেও বিশেষ এক পর্যায়ে ঐ তিনজন লেখকের মানসিক চিন্তা ও চেতনার ব্যবধান প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। তিনজন লেখকই প্রায় একই সমাজের সবচেয়ে ঘৃণিত ও অবহেলিত মানুষের জীবন নিয়ে কাহিনী রচনা করেছেন। অবশ্য তাঁদের আত্মপ্রকাশ ঘটলো ভিন্ন ভিন্ন পত্র-পত্রিকায়—প্রেমেন্দ্র তাঁর 'পাঁক'-এর জন্য গেলেন প্রথমে 'সংহতি'তে পরে 'বিজলী'-তে, মনীশ ঘটক তাঁর 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী'-র জন্য গেলেন 'কল্লোল'-এ এবং শৈলজানন্দ তাঁর 'কয়লাকুঠি'র জন্য হাজির হলেন মাসিক 'বসুমতী'তে। কল্লোলের 'সৃষ্টির কল্লোল, স্বপ্নের কল্লোল, প্রাণের কল্লোল' সবাইকে একই মানসতীর্থে একত্র করেছিলো। প্রেমেন্দ্র মিত্র পরে 'পাঁক'-এর থেকে সরে গিয়ে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয় ও হতাশার চিত্রাংকনে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন—সে চিত্র প্রায় সর্বত্রই করুণ ও বিষাদময়।

শৈলজানন্দ এক সময় কল্লোল পত্রিকার লেখক ছিলেন কিন্তু তাঁর মানসিকর্তায় কল্লোলের বিহ্বল ভাব-বিলাসিতা ও প্রবল বিরুদ্ধবাদ অনুপস্থিত ছিলো। রাণীগঞ্জ-ধানবাদের কয়লাখনি অঞ্চলের পরিবেশে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার প্রথম উন্মেষ ঘটেছে। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে তাঁর প্রথম গল্প 'কয়লাকুঠি'। মাসিক 'বসুমতী'তে ১৯২২ সালে গল্পটি প্রকাশিত হয়। তার সাঁইত্রিশ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৮৫ সালে ফরাসী লেখক এমিল জোলা প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'জারমির্নাল'। খনির খাদে অবস্থিত অত্যন্ত সাধারণ শ্রমিকের বাস্তব জীবন কাহিনী নিয়ে ঐ উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। এঁতিয়ে-ভিনসেন্ট-ক্যাথারিন-চ্যাভেল প্রভৃতি শ্রমিকের শ্রেণীচেতনা ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব-মথিত ও আদিম কামনায় জর্জরিত জীবনকে উপজীব্য করে জোলা রচনা করেছেন তাঁর এই অমর উপন্যাস। শৈলজানন্দ তাঁর 'কয়লাকুঠি' গল্প রচনা করতে গিয়ে জোলার 'জারমিনাল' উপন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা লেখকের পক্ষ থেকে যদিও তার কোনো স্বীকারোক্তি নেই তবুও এ গ্রন্থ যে তাঁকে কয়লাখনি বিষয়ক গল্প লেখার প্রেরণা যুগিয়েছে এমন ধারণা অমূলকও নাও হতে পারে। কল্লোলীয় লেখকেরা তখন বিষয়-বৈচিত্র্যে তাঁদের সাহিত্যকে ভরিয়ে তোলার জন্যে কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার

দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন — হয়তো সেইভাবেই রাণীগঞ্জের কয়লা খনির সন্নিকটে বসবাসকারী শৈলজানন্দ জোলার ঐ উপন্যাস দ্বারা প্রভাবিত হয়েই কয়লাকুঠি গল্পটি রচনা করেছেন। অবশ্য বক্তব্যের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। নানকু-বিলাসী-মাইনু-রমণা — এদের প্রেম, বিবাহ, প্রেমজনিত দ্বন্দ্ব ও মৃত্যুর প্রসঙ্গ নিয়ে ঐ গল্পটি গড়ে উঠেছে সাদামাটা রোমান্টিক কাহিনীর মতোই। কয়লাখনি ও খাদের পরিবেশের মধ্যদিয়ে ঐসব সাঁওতাল শ্রমিকের উপস্থিতি বাংলা ছোটগল্পে নতুন এক মাত্রা সৃষ্টি করলো। অবশ্য জোলার 'জারমিনাল' গ্রন্থে শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রেণী-সংগ্রামের যে রূপটি আমরা প্রত্যক্ষ করি, শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠি' গল্পে তার কোন পরিচয় বা প্রসঙ্গই নেই। খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তা দেখানোর সুযোগকে তিনি সচেতনভাবে পরিহার করেছেন বলা চলে। অবশ্য শৈলজানন্দের পক্ষে সেইটিই স্বাভাবিক ছিলো। কারণ তিনি তাঁর ছোটগল্প কিংবা উপন্যাসে সমাজের নির্যাতিত ও শোষিত শ্রেণীর মানুষ চিত্রিত করেছেন ঠিকই কিন্তু শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফলে উদ্ভূত শ্রেণী-সংগ্রামের জরুরী প্রসঙ্গের উপর গরুত্ব আরোপ করার মতো বিশ্বাস ও মানসিকতা তাঁর ছিলো না। তাঁর কয়লাখনি-কেন্দ্রিক গল্পগুলো বহুলাংশে বাস্তব কিন্তু দ্বন্দ্ব ও সংঘাতময় বাস্তবতার সঙ্গে তার ব্যবধান দুস্তর। তাঁর 'কয়লাকুঠি'; 'রেজিং রিপোর্ট, 'নারীর মন', 'নারীমেধ', 'বধূবরণ' ইত্যাদি গল্প উল্লেখযোগ্য হলেও এবং গল্পগুলিতে বাস্তব জীবন-চিত্র থাকলেও, প্রকৃত অর্থে সেখানে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের কোনো পরিচয় নেই। এ ধরনের গল্পের পটভূমিতে খনির প্রসঙ্গ থাকলেও গল্পের পাত্র-পাত্রীর জীবনের সঙ্গে খনি অচ্ছেদ্য কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেনি। বিশ্ব-অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের দারুণ অবক্ষয়ের ফলে সমাজতন্ত্রের অনিবার্য-অভ্যুদয় কল-কারখানার মালিক-শ্রমিকের মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণী সংগ্রামকে যেমন অনিবার্য করে তুলেছিলো তেমনি তার সংঘাতময় তরঙ্গ সমকালীন বিশ্বের যে-কোনো দেশের কয়লাখনির শ্রমিককেও অল্প-বিস্তর আন্দোলিত না করে পারেনি। রাণীগঞ্জ-ধানবাদ-ঝরিয়া প্রভৃতি এলাকার কয়লাখনিতে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের বাস্তব দিকসমূহকে রূপায়িত করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি তা তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশে সাঁওতাল পুরুষ ও রমণীদের ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব, প্রেম, বিরহ, স্নেহ-মায়া-মমতা, কদাচার, কুসংস্কার ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে যে জীবনধারা বয়ে চলেছে তাকে তিনি বর্ধমান ও বীরভূমের প্রকৃতি ও মানুষের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি অক্ষুণ্ন রেখেই বিধাতার মতো নিস্পৃহ ও নিরাসক্ত ভঙ্গিতে চিত্রিত করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন ঠিকই বলেছেন, "স্থান-কাল-ভাষা-পরিবেশের সৌষ্ঠব, যাহাকে ইংরেজীতে বলে 'লোকাল কালার' তাহা শৈলজানন্দের গল্পে পরিপূর্ণভাবে দেখা গেল।" শৈলজানন্দের গল্প ও উপন্যাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের আর একটি দিক নারীর প্রতি তাঁর হার্দিক আকর্ষণ ও শ্রদ্ধাবোধ। এটি তিনি সম্ভবত অর্জন করেছেন শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে। নারী নির্যাতনের মতো সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে সচেতন প্রতিবাদ তাঁর কিছু কিছু গল্প ও উপন্যাসে খুবই স্পষ্ট। অবশ্য সে ধরনের গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর যে নিস্পৃহতা ও নিরাসক্তি লক্ষ্য করা যায় তার পরিচয় মোপাসাঁর (তুলনা বুদ্ধদেব বসুর) অনেক গল্পে

সুস্পষ্ট। বুদ্ধদেব বসু তাঁর এই নিরাসক্তি ও নিস্পৃহতা প্রসঙ্গে 'An Acre of Green Grass' গ্রন্থে একস্থানে বলেছেন,

"The most detached writer ever to be born in Bengal, he, like Maupasant, tells his strory with minimum description and comment, and without divagations, whether delectable or distressing. In a particular sense, the writer is throughout absent in his work, for he never utters a word to predispose us; the characters move, talk and act, revealing themselves and the story, and producing in our minds the aprropriate emotional and moral reactions."

তাঁর কথা সাহিত্যের চরিত্রিসমূহের স্বতঃস্ফূর্ত, সরল ও সহজ বিকাশের পক্ষে ছোট ছোট বাক্যের দ্বারা গঠিত অনাড়ম্বর ভাষা যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। আশ্চর্য এই যে, শৈলজানন্দ তাঁর এই চরম নিরাসক্তি ও নিস্পৃহতার ভাবকে নিষ্ঠুর হত্যালীলার নিখুঁত বর্ণনার মধ্যেও আশ্চর্যভাবে লালন করেছেন। ধরা যাক তাঁর 'নারীমেধ' গল্পের কথা। নয়নতারার রিরংসাতাড়িত ভাই পঞ্চু বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তার ঐ বোনের ছবি নামক সুন্দরী এক দাসীকে বলপূর্বক ধর্ষণ করে। মেয়েটি গর্ভবর্তী হয়ে পড়ে। একদিন মেয়েটিকে দেশে নিয়ে যাবার অছিলায় পঞ্চু সরাসরি তাকে জনশূন্য এক কয়লাখাদের কাছে নিয়ে যায়। সেখানে পঞ্চু বল প্রয়োগে ছবির গর্ভপাত ঘটায় এবং তাকে ফেলে রেখে চলে যায়। সেখানে ছবির মৃত্যু ঘটে। পঞ্চু এবং তাঁর চেলা চামুণ্ডারা এসে পাথরের উপর দিয়ে ছবির মৃতদেহটি হেঁচড়ে টেনে এনে অবশেষে খাদের মধ্যে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিছুক্ষণ পর গ্রামের ডাক্তার এসে ছবির মৃতদেহ দেখে। তখনকার বর্ণনা এরূপ— "যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে উপুড় হইয়াই হয়ত সে মরিয়াছিল। তেমনি করিয়াই অতখানা পথ ঘষিয়া তাহাকে টানিয়া আনিতে গিয়া মুখ হইতে বুক পর্যন্ত ধারালো পাথরের কুচিতে মৃতদেহটাকে কাটিয়া ছিঁড়িয়া একাকার করিয়া দিয়াছে।" এই নিস্পৃহতা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু যথার্থই মন্তব্য করেছেন—"his description of a murder as unconcerned as that of a mother suckling her child."

শৈলজানন্দ গ্রাম-জীবনের ছবি এঁকেছেন তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসে। গ্রামীণ জীবনের দারিদ্র্য, কদাচার কুসংস্কার ইত্যাদির বর্ণনায় তিনি কল্লোলীয় ধারা অনুসরণ করেননি। আশ্চর্য নিরাসক্ত ভঙ্গিতে তিনি গ্রাম ও গ্রামীণ জীবনের ছবি এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন,"....তাঁর গ্রামের যেসব চিত্র দেখেছি তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেছেন বলেই ঠিক কথা বলার কারি-পাউডারি ভঙ্গিটা তাঁর মধ্যে দেখা দেয়নি।" শুধু তাই নয়, শৈলজানন্দের 'দরিদ্র জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা' লক্ষ্য করেও রবীন্দ্রনাথ খুব প্রীত হয়েছিলেন। সহজে ঠিক কথাটি বলতে পারা এবং দরিদ্র জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতার কথাটি ঠিকভাবে বলতে পারা নিঃসন্দেহে লেখক হিসাবে কৃতিত্বের ব্যাপার। কিন্তু প্রশ্ন, শৈলজানন্দ কি সত্যই ঠিকভাবে দরিদ্র জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে পেরেছেন ? তিনি দু-দুটো মহাসমরের পরের বঙ্গদেশ তথা সারা বিশ্বের

আর্থ-রাজনীতির চরম অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করেছেন। তার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া বঙ্গদেশের বৃহত্তর জনজীবনকে কতখানি ধ্বংস ও অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছিলো সে ঘটনা ইতিহাসবিশ্রুত। শৈলজানন্দের গল্প কিংবা উপন্যাসে সমরোত্তর সেই ভাঙ্গনের সুস্পষ্ট কোনো প্রতিফলন কি ঘটেছে? হয়তো সেই কারণেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন, "শৈলজানন্দের গ্রাম্য জীবন ও কয়লাখনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ—কিন্তু শুধু ছবিই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এর বাস্তব সংঘাত আসেনি।" তবুও একথা স্বীকার করতেই হয় যে, তিনি কল্লোলীয় মিথুন প্রবৃত্তির প্রাবল্য ও প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কবল থেকে তাঁর সাহিত্যকে বহুলাংশে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। আধুনিক অর্থে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার পরিপোষকতা বা অনুসৃতি তাঁর গল্প-উপন্যাসে দুর্লক্ষ্য। তিনি নিজে যেমনটি দেখেছেন অনাড়ম্বর ও সহজ-সরল স্টাইলে তেমনটিই বর্ণনা করেছেন। বর্ণনার ভঙ্গি তাঁর নিজস্ব। কিন্তু তিনি গ্রামকে নিয়ে গ্রামের মানুষের দ্বান্দ্বিক জীবনের গভীরে প্রবেশ করতে পারেননি। সেই কারণে তাঁর কথাসাহিত্যে গ্রামের মানুষের দারিদ্র্য শুধুই দারিদ্র্য—দারিদ্র্যের পশ্চাতে কিংবা সম্মুখে কোনো সংঘাত নেই, নেই কোনো দ্বান্দ্বিক ইতিকথা।

আট

কিন্তু কিছুটা তাঁরই গল্পাদর্শে অনুপ্রাণিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রাম ও গ্রামের মানুষকে দেখালেন তাঁর থেকে স্বতন্ত্র ধারায়। আঞ্চলিকতাকে অক্ষুন্ন রেখে গল্প লেখা যায়—এ প্রেরণা তিনি নিতান্ত আকস্মিকভাবে শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প পাঠ করেই পেয়েছিলেন একথা সত্য হলেও তারাশঙ্করের আঞ্চলিকতার রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ শৈলজানন্দ কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে পৃথক। আঞ্চলিক অর্থে পল্লীগ্রাম তারাশঙ্করের বিশ্বাস ও ভাবনা-প্রতিভার সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিলো। অর্থাৎ তারাশঙ্কর যখন গ্রামের চিত্র অঙ্কন করেছেন তখন তার মধ্যে বীরভূম জেলার গ্রাম-জীবনের কোমল-কঠোর দিকটিও বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্করই সর্বপ্রথম তাঁর কথাসাহিত্যে গ্রামের রূপ, রং ও তার প্রাণশক্তিকে ব্যাপকতর ও দৃঢ়তর ভঙ্গিতে আবিষ্কার করেছেন। বলা চলে, তিনি তাঁর কথাসাহিত্যে যে-গ্রামকে এনেছেন বাংলা সাহিত্যে তা সম্পূর্ণ নতুন (স্মর্তব্য যে, বিভূতিভূষণও গ্রামকে এনেছেন কিন্তু তাঁর গ্রামের রূপ রং প্রকৃতি স্বতন্ত্র কিংবা এবং তার ব্যঞ্জনাও ভিন্নধর্মী)। বঙ্গদেশের আলোতে, বাতাসে, শব্দে, গন্ধে—এক কথায় প্রকৃতি ও মানুষে যেমন আছে কোমলতার সুর তেমনি তার মধ্যেই আছে কাঠিন্যের বা ভীষণতার সুর। একটি বৈষ্ণবীয় অপরটি তান্ত্রিক। তারাশঙ্কর তাঁর পারিবারিক জীবনের উত্তরাধিকারসূত্রে জীবনের এই দ্বৈত রূপ খুব কাছ থেকেই দেখেছিলেন। বঙ্গদেশের, বিশেষ করে বীরভূমের মানুষ ও প্রকৃতিকে দেখতে গিয়ে তিনি কখনো তাকে

বৈষ্ণবীয় লীলারহস্যের অন্তহীন রসানুভূতির আলোকে দেখেছেন আবার কখনো দেখেছেন, ভীষণতম ক্রূরতার মধ্য দিয়ে। তারাশঙ্কর বঙ্কিমের কোনো কোনো উপন্যাসের একজন অনুরক্ত পাঠক ছিলেন। আদিম প্রবৃত্তির দ্বান্দ্বিক সংঘাত যা জীবনে নিয়তির রূপ ধরে এসে মানুষের সমগ্র চৈতন্যকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে এবং কখনো কখনো তাকে বিনাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে টেনে নিয়ে যায়—বঙ্কিম সাহিত্যের সেই দিকটি তারাশঙ্কর তাঁর কথাসাহিত্যের কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। এ-আদিম প্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটে কখনো আত্মরক্ষার প্রবল এষণার মধ্যে দিয়ে, কখনো ঘটে উৎকট ইন্দ্রিয়-তাড়নার মধ্য দিয়ে, আবার কখনো ঘটে প্রেম ও মায়া-মমতার প্রাবল্যের কারণে। তারাশঙ্কর সমকালীন কল্লোলীয় গল্পকারদের মতোই গল্পের বিষয়ের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যাভিলাষী ছিলেন। তাঁর আবেগময় অনুভূতি যেমন তাঁকে গ্রামের দিকে টেনে নিয়ে গেছে তেমনি মানুষের জীবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে গিয়ে তিনি তার আদিম চৈতন্যের উপর সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। 'তারিণী মাঝি' নামক একটি গল্পে আত্মরক্ষার মতো একটি আদিম প্রবৃত্তিকেই প্রেমের ঊর্ধ্বে উঠিয়ে তাকে মহীয়ান ও গরীয়ান করে তুলতে চেয়েছেন। প্রেমের তরণী ভাসিয়ে তারিণী ও সখী তাদের সংসারের বহতা নদীর সুখ-দুঃখের তরঙ্গের মধ্য দিয়ে ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিলো কিন্তু ময়ুরাক্ষীর প্রবল বন্যা তাদেরকে সহসা এমন এক জায়গায় নিক্ষেপ করলো যেখানে রসঘন প্রেম-প্রীতির বদলে আত্মরক্ষার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বড়ো হয়ে উঠলো। কঠিন এক অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রেমকেও যেমন তারাশঙ্কর যাচাই করেছেন তেমনি সখীকে সচেতনভাবে নিজের হাতে হত্যা করে তারিণীর নিজের জীবন রক্ষা করার প্রচেষ্টাকে তিনি ছোট করে দেখেননি। সেখানে প্রেম পরাভূত হলো এও যেমন সত্য তেমনি আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা জয়ী হলো এও চরম সত্য। কিন্তু কোন্‌টার চেয়ে কোন্‌টা বড় তার জবাব লেখক দেননি–দেননি বলেই এ গল্প এতো নাড়া দেয়।

তারাশঙ্কর 'কল্লোল' পত্রিকায় ১৯২৭ সালে 'রসকলি' নামক একটি গল্প লেখেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'রাইকমল'। প্রথম গল্প ও প্রথম উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় বৈষ্ণব প্রেমের স্বপ্ন ও সৌন্দর্য্য চেতনা। এ দুটি উপাখ্যানেই বৈষ্ণব সমাজে স্বীকৃত জৈব কামনার উল্লেখ আছে কিন্তু লেখকের সচেতন শুভবুদ্ধি সে কামনাকে কোথাও ক্লেদাক্ত করেনি। কল্যাণ ধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগের কারণে তারাশঙ্কর তাঁর এ ধরনের প্রায় প্রত্যেকটি গল্পের সমগ্র শরীরে আশ্চর্য কৌশলে আধ্যাত্মিকতার এমন সূক্ষ্ম মেজাজ তৈরী করেছেন যে শেষ পর্যন্ত পঙ্কে নিমজ্জিত হবার পূর্বেই পাত্র-পাত্রী নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে সমর্থ হয়েছে। 'রসকলি' গল্পের কথাই ধরা যাক। সেখানে মঞ্জরী ও পুলিনকে রাত্রির নির্জনতার মধ্যে একান্ত কাছাকাছি এনেও এবং দেহোপভোগের সুবর্ণ সুযোগ তৈরী করে দিয়েও আবেগময় নিটোল সেই মুহূর্তে মঞ্জরীকে লেখক সরিয়ে নিলেন ঢেঁকিশালে—পুলিনকে

ঘরে শুতে দিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে রেখে মঞ্জরী ঢেঁকিশালেই রাত কাটালো। পুলিনের স্ত্রী গোপিনীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার প্রবৃত্তি তার ছিলো না। পুলিনকে সে ভালোবাসতো কিন্তু অবৈধ দেহোপভোগের দ্বারা সে ভালোবাসা কলুষিত হবে ভেবেই মঞ্জরী নিজের ইন্দ্রিয়কে দমন করলো। সবশেষে সে তার ভালোবাসার পাত্রকে গোপিনীর কাছে রেখে বৃন্দাবনের পথে পাড়ি জমালো। তারাশঙ্করের এ ধরনের কিছু কিছু গল্পে নায়িকারা প্রেমের কলঙ্ক-হার গলায় পরেও শেষ পর্যন্ত দেহের শুচিতাকে রক্ষা করে প্রেমের পবিত্রতা ও গভীরতাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। আসক্তি এবং নিরাসক্তি, ভোগ এবং ত্যাগ, আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ প্রভৃতির দ্বন্দ্ব-দোলায় তারাশঙ্করের গল্পের নায়ক-নায়িকা এমন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে যা রোমান্টিকতার দিক থেকে অভূতপূর্ব ও অনবদ্য হলেও বাস্তবতার দিক থেকে তাদের অস্তিত্ব আমাদেরকে সংশয়াকুল করে তোলে। এ-আদর্শের উৎসমূল অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ সাহিত্যের দ্বারস্থ হতেই হবে। অবশ্য মূল উপাদান ঐসব লেখকদের কাছ থেকে সংগৃহীত হলেও তারাশঙ্কর অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে তাঁর বৈষ্ণবীয় লীলা-সমৃদ্ধ গল্পগুলোতে এক ধরনের নতুন মাত্রা (dimension) সৃষ্টি করেছেন। আদর্শ বহুলাংশে এক হলেও তারাশঙ্করের এ ধরনের গল্পে কিংবা উপন্যাসের সামগ্রিক পরিমণ্ডলে রং ও রসের ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। তিনি তাত্ত্বিক দিক থেকে বৈষ্ণবীয় লীলাকে দেখেননি—কিন্তু তার ভাবের স্বপ্ন-মধুর রোমান্টিকতা তাঁকে আবিষ্ট করেছিলো বলেই তার মধ্যে আত্মনিমজ্জন সম্ভব হয়েছে। সৃষ্টি রাজ্যের রহস্যলীলার কোমল, মধুর, প্রশান্ত ও অনাবিল দিকটিকে তিনি ধরতে চেয়েছেন আউল-বাউল-বৈষ্ণব বেদে-বেদেনি ইত্যাদির সহজিয়া জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে। এদের হাস্যে-লাস্যে ভরা প্রাণতরঙ্গের মধ্যে বন্ধন-বিমুক্ত মনটিকে বড় করে দেখার প্রবণতা তাঁর কথাসাহিত্যে খুবই সক্রিয়। এ প্রবণতার মধ্যে এক ধরনের নাটকীয়তা যেমন আছে তেমনি আছে জমজমাট কাব্যরস। বলা বাহুল্য, যাদের মন মানসিকতাকে তিনি অনেক উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন সামাজিক জীবনের পরিচয়ের দিক থেকে তাদেরকে নামগোত্রহীনই বলা চলে। এ-প্রভাব কতকটা শরৎচন্দ্রীয় এবং কতকটা কল্লোলীয়। কল্লোল তখন কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের প্রভাবে নামগোত্রহীন মানুষদেরকে হৃদয়ের ঔদার্য ও ঐশ্বর্যে অনেক উর্ধ্বে স্থান দিতে ব্যগ্র-ব্যাকুল। যাযাবরী এই মানসিকতার সাহায্যেই সমাজের ছিন্নমূল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি তাঁর সহনশীলতা ও সহমর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে। জগদীশ ভট্টাচার্য 'তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' নামক সংকলন গ্রন্থের ভূমিকা অংশের একস্থানে বলেছেন, "সকল জীবনের মধ্যেই তিনি (তারাশঙ্কর) একই দুর্জ্ঞেয় শক্তির রহস্যলীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রবৃত্তিরূপে প্রকাশিত মানুষের জীবনে এই জীবনীশক্তিকেই তিনি পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই স্বীকৃতি ভাল-মন্দ, শুচি-অশুচি, সুন্দর-অসুন্দরের সমস্ত খণ্ডিত চেতনার উর্ধ্বে। যাকে সুন্দর বলি তাও যেমন এই শক্তির লীলা, যাকে বীভৎস বলি তার মধ্যেও এই একই শক্তির প্রকাশ। মধুরে ও মনোহরে যেমন এই শক্তি, ভীষণে

CS CamScanner

ভয়ানকে এই একই শক্তি। সর্বঘটে এই শক্তির লীলাকে স্বীকার করে নিলে জীবনে বর্জনীয় আর কিছুই থাকে না। তারাশঙ্করের সাহিত্যে এই অখণ্ড মানবজীবনই স্বমহিমায় প্রকাশিত"। জগদীশ ভট্টাচার্যের বক্তব্যের দৃষ্টিকোণ থেকে তারাশঙ্করের বেশ কিছু গল্পের তাৎপর্য অনুসন্ধান করা সহজ হয়। একই শক্তির লীলারহস্যে 'বেদেনী'র রাধিকা যেমন কামনার আগুনে পুড়ে পুড়ে একের পর এক পুরুষের জীবনসঙ্গিনী হয়ে দেহের ক্ষুধা মিটায়, অপরদিকে তেমনি সেই লীলারহস্যের কারণেই 'রসকলি' গল্পের মঞ্জরী ভোগের পাত্র সামনে পেয়েও তা দুহাতে সরিয়ে অবলীলাক্রমে বৈরাগ্য পীড়িত ধূসর জীবনের পথেই পা বাড়িয়ে দেয়। সেই একই রহস্যলীলার কারণে 'ডাইনী' গল্পে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার ব্যাকুলতায় যে মেয়েটি মানুষের কাছ থেকে একটুখানি সহানুভূতি প্রত্যাশা করলো সেই মেয়েটিকে শেষ পর্যন্ত মানুষেরই তাড়া খেয়ে ছাতিফাটার গণগণে আগুনে ঝলসানো মাঠের ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে কি শোচনীয়ভাবেই না প্রাণ হারাতে হলো! মানুষের মাঝে ডাইনী হয়ে নয়—মানুষ হয়েই সে বাঁচতে চেয়েছিলো কিন্তু কি তার মর্মান্তিক পরিণতি! দুর্জ্ঞেয় শক্তির অদৃশ্য রহস্য একদিন নৃশংস ও দুর্ধর্ষ ডাকাত কালী বাগ্দীর উপর কি চরম প্রতিশোধই না গ্রহণ করলো। 'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পের কালী নামক লোকটি রাতের আঁধারে মানুষের ঘাড় মটকিয়ে সর্বস্ব অপহরণ করে। চার পুরুষ ধরে তারা এ পেশায় নিয়োজিত। কিন্তু অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! কালী ভুল করে বৃষ্টিঝরা এক রাতে একমাত্র পুত্র তারাচরণকেই হত্যা করে বসলো। দীর্ঘকাল কারাভোগের পর কালী সোজা ফিরে এসেছিলো আখড়াইয়ের সেই দীঘিতে, যেখানে সে তারাচণকে পুঁতে রেখেছিলো। অবশেষে নির্মম নিয়তি ঠিক সেই জায়গাটিতেই তারও জীবনাবসান ঘটালো। 'অগ্রদানী' গল্পে উদরসর্বস্ব ব্রাক্ষণ পূর্ণ চক্রবর্তীর ভাগ্যের নির্মম পরিহাসকেও কতকটা সেই দুর্জ্ঞেয় শক্তির লীলা হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। পর্যাপ্ত বিত্তের লোভে সে চালাকি করে তার নিজের জীবন্ত শিশুর বদলে মৃত শিশু নিয়েছে। তার বদলে সে শ্যাম দাসের কাছ থেকে যা পেলো তাতে সন্তুষ্ট না হতে পেরে শ্যামদাসের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে অগ্রদানী সেজে নিজের সন্তানের হাত থেকেই পিণ্ড গ্রহণ করলো। কিন্তু খাদ্য ও সম্পত্তিলোলুপ পূর্ণ চক্রবর্তীর নিয়তির লীলারহস্য তাকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল অধঃপতনের শেষ সীমানায়। তার নিজের শিশুর শ্রাদ্ধে অগ্রদানী সেজে পিণ্ড গ্রহণের ডাক এলো। পূর্ণ চক্রবর্তী এড়াতে পারেনি সে আহ্বানকে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস!

তারাশঙ্করের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে তান্ত্রিক ধর্মের প্রচলন ছিলো। তাঁর কোনো কোনো গল্পে এবং উপন্যাসে তান্ত্রিক ক্রূরতা ও ভীষণতার ছাপ সহজলভ্য। অবশ্য তত্ত্বগতভাবে তিনি তান্ত্রিকতাকে ব্যবহার করেননি—ব্যবহার করেছেন রসগত দিক থেকে। 'ছলনাময়ী', 'ডাইনী', 'রায়বাড়ি' প্রভৃতি গল্প তান্ত্রিকতার বীভৎস উপাদানে গঠিত হলেও তন্ত্রের কোনো নামগন্ধও নেই এসবের মধ্যে—কল্পনার সঙ্গে বীভৎস ভাবের সম্মিলন ঘটানোর কৃতিত্বের কারণেই গল্পগুলো ভয়ঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

CamScanner

তারাশঙ্করের মানবপ্রেম পশুর অনুচ্চারিত অনুভূতিকেও ভাষা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রই প্রথম 'মহেশ' গল্পে মহেশ নামক গরুটিকে গফুরের দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে দিয়েছিলেন। এ-একাত্মতা এমনই গভীরতাশ্রয়ী যে মহেশ নামক গরুটিই যেন গফুরের মহেশ নামক এক সমব্যথী অঙ্গজতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় হাতিকে কেন্দ্র করে 'আদরিণী' গল্প লিখেছেন। শৈলজানন্দ দুটি কুক্কুরীকে নায়িকা করে 'জনি ও টনি' নামক একটি গল্প লিখেছেন। তারাশঙ্কর একদা এই গল্পটি পড়ে অভিভূত হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র ও শৈলজানন্দের গল্প থেকে প্রেরণা লাভ করেই হয়তো তিনি তাঁর অবিস্মরণীয় গল্প 'কালাপাহাড়' রচনা করেন। 'কালাপাহাড়' গল্পের দুটি মহিষকে কেন্দ্র করেই একটি ঘন-নিটোল ট্র্যাজিক কাহিনী গড়ে উঠেছে। মহিষ বঙ্গদেশের যে কোনো কৃষকের জীবনে আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত—কৃষিক্ষেত্রে গরুর মতোই মহিষের অবদানও অপরিহার্য। রংলাল মোটামুটিভাবে সঙ্গিতসম্পন্ন একজন কৃষক। সে বড়ো বড়ো দুটি বলদ কিনে গোহালঘর আলোকিত করার স্বপ্নে বহুদিন থেকেই বিভোর ছিলো। যে গরু দুটো ছিলো তাতে কৃষিকাজ কোনোমতে চলছিলো ঠিকই কিন্তু রংলালের তাতে মন ওঠে না। নব্য শিক্ষিত পুত্র যশোদার নিষেধ উপেক্ষা করে রংলাল পাচুন্দীর হাটে গিয়ে গরু কেনার বদলে ঝোঁকের মাথায় কিনে বসলো বিশাল এক জোড়া মহিষ। রংলালের স্ত্রী মহিষ দুটোর বিরাট আকৃতি দেখে মনে মনে কিছুটা পুলকিত হলেও শিক্ষিত পুত্র যশোদা জন্তু দুটির বিশাল পেটের দিকে পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বুঝিয়ে দিলো যে, শেষ পর্যন্ত ঘরের চালের সমস্ত খড়ও তারা খেয়ে শেষ করবে। রংলাল সে কথায় কিছুটা বিব্রত বোধ করলেও তার তখন খুশীর কোনো সীমা-পরিসীমা ছিলো না। তার স্ত্রী মহিষ দুটোর নাম ঠিক করে দিলো—একজন কালাপাহাড় অন্যজন কুম্ভকর্ণ। রংলাল মহিষ দুটোকে নিয়ে বাচ্চা মানুষের মতো মেতে উঠলো। তারা যে পশু আর সে যে মানুষ—এ ব্যবধানকেও সে আস্তে আস্তে ঘুচিয়ে ফেললো। সারাদিন ধরে দুজনকে নিয়ে সে মাঠে মাঠে চরিয়ে বেড়ায়—মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে কথা বলে, আদর করে। কুম্ভকর্ণ তার প্রভুকে চিতাবাঘের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারালো। কালাপাহাড় কিছুতেই তার সঙ্গী হারানোর বেদনা ভুলতে পারলো না। পৃথিবীতে সে দুজনকেই একান্ত আপনজন বলে মনে করেছিলো—একজন কুম্ভকর্ণ এবং অন্যজন রংলাল। এছাড়া আর কাউকেই সে সহ্য করতে পারেনি। কুম্ভকর্ণের আকস্মিক মৃত্যুতে কালাপাহাড়ের যখন মাথা গরম হয়ে উঠলো তখন রংলাল পৌনঃপুনিক প্রচেষ্টায় তাঁকে পাইকারীর কাছে বিক্রী করা সত্ত্বেও কালাপাহাড় বারেবারেই রংলালের কাছে ফিরে ফিরে এসেছে। কিন্তু শেষবারের বেলায় কালাপাহাড় রাস্তা ভুল করে উন্মত্তের মতো ছুটতে ছুটতে এক শহরের রাস্তায় গিয়ে পড়লো। অজানা-অচেনা পরিবেশে যতই রংলালের স্মৃতি তাকে পাগল করেছে ততই তার দাপাদাপি ও ছোটাছুটির উন্মত্ততা বেড়েছে। শহরে তোলপাড় সৃষ্টি হলো—পুলিশ পাগলা মহিষের খবর পেয়ে মটরে চড়ে

তার সন্ধানে বের হলো। মটরটা যতই তার সামনের দিকে এগিয়ে আসছিলো ততই কালাপাহাড়ের মনে হচ্ছিলো কুম্ভকর্ণের হন্তারক হিংস্র কোনো জানোয়ার বুঝি তার দিকে ছুটে আসছে। কালাপাহাড় অমিতবিক্রমে তার সঙ্গে লড়বার জন্য তৈরী হলো— কিন্তু তার আগেই পুলিশের গুলী তার বিশাল দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। কালাপাহাড় অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কালাপাহাড়ের মৃত্যু হলো— মৃত্যু হলো মর্মান্তিকভাবে।

মনে হয় মহিষকে নিয়ে কোনো একজন কৃষকের জীবনের স্বপ্ন, আশা ও আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ এমনভাবে বিশ্বের কোনো ছোটগল্পে আর কখনো ঘটেনি। বাংলা সাহিত্যে 'মহেশ' গল্পটিও নিঃসন্দেহে এক অনন্য কীর্তি। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, ঐ গল্পের প্রেক্ষিত এবং জীবনের উপাদান একরকম এবং তারাশঙ্করের কালাপাহাড়ে তা অন্যরকম। সাযুজ্যও আছে কিছুটা। গফুর মহেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে, তাই সে মহেশের উদ্দেশে বলেছে, "মহেশ, তুই আমার ছেলে...... তুই তো জানিস আমি তোকে কত ভালবাসি।" তার হৃদয়ের ভাষা গফুর বুঝতে পারতো এবং অপরপক্ষে মহেশও গফুরের নিঃস্ব, বঞ্চিত ও রিক্ত জীবনের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসার উষ্ণতাকে মর্মে মর্মে অনুভব করতে পেরেছিলো। কিন্তু সেই মহেশকেই শেষ পর্যন্ত তার প্রাণপ্রিয় প্রভুর নির্মম প্রহারের আঘাতে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণের মৃত্যু এসেছে অন্যভাবে। রংলালের প্রতি তাদের দুজনেরও দুর্বার আকর্ষণ গড়ে উঠেছিলো অকৃত্রিম মমতার কারণেই। কিন্তু তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে আর একটি নতুন মাত্রা যোজনা করেছেন। পশুকে প্রেম দিলে পশু তার জন্য জীবনও দিতে পারে। রংলালকে চিতাবাঘের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে কুম্ভকর্ণ তার জীবনটাই উৎসর্গ করে দিয়েছিলো, অপরদিকে কালাপাহাড় রংলালের স্মৃতির ভারে এমনই দিশেহারা হলো যে শেষ পর্যন্ত তার জন্য তাকেও প্রাণটাই হারাতে হলো। রংলালের আদর-যত্ন-সোহাগে অত্যধিক প্রীতি ছিলো বলেই তারা মৃত্যুর পর্যায়ে যেতে পেরেছে। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে নিজেকে কখনো কখনো অভুক্ত রেখে গফুর তার মহেশকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালিয়েছে— 'মহেশ' গল্পের এ-প্রেক্ষিত অনন্য, তুলনাহীন। তারাশঙ্করের 'কালাপাহাড়' গল্পের প্রেক্ষাপট স্বতন্ত্র, বক্তব্যের ব্যঞ্জনা ও ব্যাপ্তি ভিন্নধর্মী— কিন্তু এ গল্পও অনন্য, অতুলনীয়।

নারী ও নাগিনী' গল্পে সাপুড়ে খোঁড়া শেখের সঙ্গে নতুন এক সর্পিনীর একাত্মতা স্থাপনের প্রচেষ্টা থাকলেও এবং সেখানে তার স্ত্রী জোবেদার সঙ্গে সতীন সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও ঐ গল্পের সাফল্য কালাপাহাড়ের মতো নয়। নাগিনীর সঙ্গে খোঁড়া শেখের প্রেম শেষ পর্যন্ত কাল্পনিক পরিণয়ে পরিণত হলেও ভাব গভীরতার দিক থেকে তার বিন্যাস খুব দুর্বল বলেই তা তেমন আকৃষ্ট করে না। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে রিরংসাতাড়িত ও ধর্মত্যাগী শাহজীর সর্পাসক্তি সে তুলনায় অনেক বেশী ভাব-গাম্ভীর্যময়।

নয়

তাহলে এ পর্যন্ত তারাশঙ্করের গল্পের আলোচনার মধ্য দিয়ে যা পাওয়া গেল তাকে বহুমাত্রিক রোম্যান্টিসিজমেরই প্রকারভেদ বলা চলে। আউল-বাউল-বৈষ্ণবদের বন্ধন-বিমুক্ত জীবন-যাপন একদিকে, অন্যদিকে অন্ধ-প্রবৃত্তির প্রবল দ্বন্দ্ব কিংবা নিয়তিতাড়িত জীবনের লীলা-খেলা এবং পশু-প্রাণীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ—এর সমস্ত কিছুকেই রোম্যান্টিসিজমেরই বিচিত্র প্রকাশ হিসাবে ধরা যায়।

কিন্তু এছাড়াও তারাশঙ্করের গল্প ও উপন্যাস বর্ণিত জীবনের ক্ষেত্রে আলাদা আর একটি জগৎ আছে— আর্থ-রাজনীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠা সমাজ সচেতনতার সেই অংশে তারাশঙ্কর নিজেকে কখনো গান্ধীবাদী, কখনো মার্কসবাদী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। আমরা জানি অসহযোগ আন্দোলনের সময় তারাশঙ্কর সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এক পর্যায়ে গান্ধী ও সুভাষ বসুর প্রতি তাঁর আত্যন্তিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং আর এক পর্যায়ে সমাজতন্ত্রের দিকে তাঁর ঝোঁকের কথা সুবিদিত। গান্ধীর ভাবমূর্তির প্রতিফলনও তাঁর কোনো কোনো উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের মধ্যে অনায়াস-লক্ষ্য। তারাশঙ্কর আন্তরিকভাবে দারিদ্র্যের অভিশাপে ক্লিষ্ট এদেশের মানুষের জন্য একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ ব্যবস্থা কামনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সাহিত্যে এ ব্যাপারে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেননি।

তারাশঙ্কর নিজে একজন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের সন্তান ছিলেন। সেই কারণে সামন্ততান্ত্রিকতার পুরো চেহারাটা—অর্থাৎ তার সমৃদ্ধি ও অবক্ষয়ের পরিপূর্ণ চেহারা খুব কাছের থেকেই দেখবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। পূর্ণাঙ্গ সমৃদ্ধি তাঁর সময়ে ছিলো না কিন্তু পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহের অপরিমেয় প্রাচুর্যের ইতিহাস তাঁর অজানা ছিলো না। পাশাপাশি তিনি পাঁচ টাকা মাইনের কয়লাখনির দরিদ্র চাকুরীজীবীকে কয়লাখনির মালিক হতেও দেখেছেন। তিনি সচেতনভাবে লক্ষ্য করেছেন সামন্ততান্ত্রিক জমিদারেরা কিভাবে অবক্ষয়ের করাল গ্রাসে পতিত হচ্ছে এবং পাশাপাশি সমাজের দরিদ্র ব্যক্তি কিভাবে হঠাৎ অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল ধন সম্পত্তির অধিকারী হচ্ছে। তারাশঙ্কর তাঁর জন্মভূমি লাভপুরের অন্যান্য জমিদারদের ক্রমায়ত-অবক্ষয়ের চিত্রও নিজের চোখে দেখেছিলেন। যুগাঘাতের অমোঘ নিয়মে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী—একথা যুক্তির দিক থেকে তিনি মেনে নিলেও, হৃদয়ানুভূতির দিক থেকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি। প্রচ্ছন্ন-বেদনাবোধকে সম্পূর্ণ আড়াল করে রাখা তাঁর পক্ষে সেই কারণে সহজ ছিলো না। 'জলসা ঘর' গল্প-গ্রন্থের 'জলসা ঘর' নামক গল্পটির কথাই ধরা যাক। সাত পুরুষের জমিদারির রঙ্গমঞ্চ—বিশ্বম্ভর রায় দাঁড়িয়ে আছেন ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের পাদপ্রদীপের ম্যাড়মেড়ে আলোর সামনে। অতীতের গৌরবময় স্মৃতি বক্ষে ধারণ করে তিনি তাঁর বর্তমানের ক্ষয়িষ্ণু জীবনের ভারে আজ দারুণভাবে ম্রিয়মাণ। হাতিশালে সেদিন বলীয়ান ও

বিশালাকৃতির কত হাতি ছিলো, ঘোড়াশালে ছিলো বায়ুবেগে ধাবমানক্ষম কত সব অতিকায় ও দর্শন-লোভন ঘোড়া, আর জলসা ঘরে ছিলো লক্ষ্ণৌয়ের জোহরা, দিল্লীর চন্দ্র প্রভৃতির মতো অনুপম সৌন্দর্যের অধিকারিণী, নৃত্যপটিয়সী সব বাইজী। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী জমিদার রাবণেশ্বরের ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ছিলো বিশাল-বিপুল। তাঁর সগর্ব পদক্ষেপ ও উদাত্ত কণ্ঠস্বরে ছিলো মহামহিম সম্রাটের ভাবগাম্ভীর্য, যা দেখলে মানুষের ভয় ও বিস্ময়ের কোনো সীমা-পরিসীমা থাকতো না। বিশ্বম্ভর ঝাপসা সেই সব স্মৃতি বুকে নিয়ে কোনোমতে টিকে আছেন। আর ওদিকে ভুঁইফোড় ধনপতি মহিম গাঙ্গুলী বিশ্বম্ভরের চোখের সামনে অর্থদম্ভে আজ কি-না করে বেড়াচ্ছে। বাইজীদের এনেছে সে, কিন্তু মহিম গাঙ্গুলীর মতো উঠতি ধনীর কি নেই রসোপলব্ধি আছে ? বানরের গলায় মুক্তার মালা কি শোভা পায় ? শুধু ধন থাকলেই কি হয়— পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত রুচি ও রসবোধ ছাড়াই কি এর মাহত্ম্য বুঝা যায় ? তবু তাঁকে যেতে হয়েছে মহিম গাঙ্গুলীর জলসা ঘরে— কিন্তু ভালো লাগেনি, সহ্য হয়নি, তাই বিশ্বম্ভর রায় চলে এসেছেন। সুরাসক্ত ও বাইজী-আসক্ত বিশ্বম্ভর রায় শেষ পর্যন্ত নিজের জলসা ঘরেই বাইজীদের নাচ-গানের আসর বসাবার অনুমতি প্রদান করলেন— ঐ সঙ্গে নায়েবের হাতে তুলে দিয়েছেন রায় বংশের শেষ মাঙ্গলিক সিঁথিখানি। ঐ শেষ সম্বলটুকু না ঘোচালে মহিম গাঙ্গুলীর সঙ্গে টেক্কা দেওয়া সম্ভব ছিলো না। এ হেন বাহ্যিক ঠাট ও অহঙ্কৃত-ঐতিহ্য বজায় রাখার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় যখন একদিকে বিশ্বম্ভর রায় ব্যাপৃত, তখন অন্যদিকে রায় বংশের এককালের খ্যাতির প্রতীক সেই তুফানের মতো অশ্ব ও ছোট গিন্নীর মতো হস্তী খাদ্যাভাবে শীর্ণকায়! সারারাত বাইজীর নাচ আর গানের পর শেষরাতে হতাশা ও অবসাদের ভারে ম্রিয়মাণ বিশ্বম্ভর রায় সওয়ার হলেন তুফানের পিঠে, তারপর লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে তুফান তাঁকে হাজির করলো তাঁরই হারানো লাট কীর্তিহাটের কাছে। বিশ্বম্ভর অব্যক্ত বেদনায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে তুফানের পিঠে সজোরে চাবুক হেনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। রজনীর রেশটুকু তখনো শেষ হয়নি— তিনি দ্রুত দোতলায় উঠে গেলেন। জলসা ঘর তখনো খোলা ছিলো। তারপর লেখকের বর্ণনা— "উকি মারিয়া দেখিলেন, ঘর শূন্য, অভিসারিকা চলিয়া গিয়াছে। সুরার শূন্য বোতল আসরে গড়াগড়ি যাইতেছে। ঝাড়— দেওয়াল-গিরির বাতি তখনও শেষ হয় নাই। তখনো আলো জ্বলিতেছে। দেওয়ালের গায়ে দৃপ্ত রায় বংশধরগণ, মুখে মত্ত হাসি। সভয়ে রায় পিছাইয়া আসিলেন। সহসা মনে হইল, দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতেছেন— মোহ! কেবল তাঁহার নহে, সাত রায়ের মোহ ঐ ঘরে জমিয়া আছে।" এই মোহ সাত রায়ের তো বটেই— এই মোহ কিছুটা তারাশঙ্করেরও। 'জলসা ঘর' গল্প গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৩৭ সালে কিন্তু 'জলসা ঘর' নামক গল্পটি রচিত হয় তার বেশ কিছু আগে। রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯২৯ সালে। সেখানে রবীন্দ্রনাথও মোহমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছেন চাটুজ্যেদের ভোগের, ত্যাগের, দম্ভের আর অসহিষ্ণুতার দাপট। বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে দেখেছেন ভাঙ্গনের

মুখোমুখি দাঁড়িয়েও বিপ্রদাস চাটুজ্যে কিভাবে সঙ্গীত-শিল্প-সাহিত্যের প্রতি তাঁর রসবোধ ও রুচিবোধকে আঁকড়ে ধরেছেন প্রবল প্লাবনের তরঙ্গ-তাড়নে প্রায়-নিমজ্জিত ব্যক্তির হস্তধৃত কাষ্ঠখণ্ডটির মতো। মধুসূদন একজন ভুঁইফোড় ধনপতি-- সে একাধারে বিপ্রদাস চাটুজ্যের উত্তমর্ণ অন্যধারে তার ভগ্নিপতি, কিন্তু বিপ্রদাস চাটুজ্যে ও কুমু তার মুখে শুধু থুথু ছিটিয়ে দিতেই বাকী রেখেছিলেন। মধুসূদন তার টাকার পাহাড়টাকে দুহাতের বেষ্টনে সর্বদাই আগলে রাখা ছাড়া জীবনে কোনো রসবোধ ও রুচিবোধের চর্চা করেনি। মধুসূদনের ধনগরিমার ইতরতার জবাবে দয়া-দাক্ষিণ্যে-উদার বিপ্রদাস ও কুমু তার প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি। কারণ শেষ পর্যন্ত কুমুকে তাঁর সন্তানের কারণে হোক কিংবা মধুসূদনের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতার দাপটে হোক, মাথা নত করে মির্জাপুরের মধুপ্রাসাদে যেতেই হয়েছে। 'জলসা ঘর' গল্পটির সঙ্গে 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কোনো কোনো অংশে মিলও যেমন আছে তেমনি গরমিলও আছে। বিশ্বম্ভর রায়ের সঙ্গে বিপ্রদাস চাটুজ্যের কিংবা মহিম গাঙ্গুলীর মধুসূদনের শ্রেণীগত সাযুজ্য যেমন সহজলক্ষ্য তেমনি উভয়ের মানস প্রবণতার মধ্যেও বেশ কিছুটা সামঞ্জস্য রয়েছে বৈকি। বিলীয়মান সামন্ততান্ত্রিকতার বর্ণচ্ছটার প্রতি 'যোগাযোগ'-এর রবীন্দ্রনাথের সমর্থন সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি শেষ পর্যন্ত বুকের রক্ত ঝরিয়ে কুমুকে উঠতি পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিভূ হৃদয়হীন-মধুসূদনের ঘরে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। অর্থাৎ প্রতীক অর্থে এটাই স্পষ্ট যে ঐতিহাসিক প্রবাহের নিজস্ব নিয়মানুযায়ী ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজ যেখানে নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে বা ফেলছে সেখানে সে টিকে থাকবে কিসের জোরে? মধুসূদনের মতো উঠতি ধনপতির কাছ থেকে অসময়ে প্রাপ্ত এগারো লাখ টাকার ঋণ ছাড়া হয়তো জমিদার বিপ্রদাস চাটুজ্যেকে শেষ পর্যন্ত পথেই দাঁড়াতে হতো। অতএব রবীন্দ্রনাথ একথা শেষ অবধি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে পুঁজিবাদ মানুষকে যতই অর্থগৃধ্নু করুক, তার প্রবল দাপটকে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিকতা আর ঠেকাতে পারবে না। সেই কারণেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও কুমুকে মধুসূদনের সন্তানের জননীও হতে হয় এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে মধুসূদনের মধুপ্রাসাদে বাকী জীবনও কাটাতে হয়। তারাশঙ্কর তাঁর ছোট গল্পে (কখনো কখনো উপন্যাসের মধ্যেও) যে কয়টি ভুঁইফোড় ধনপতি কিংবা মহাজন এঁকেছেন তাদেরকে তিনি মোটেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুপ্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারেননি। জলসা ঘরের মহিম গাঙ্গুলির কথা আগেই বলেছি। 'পৌষ-লক্ষ্মী'র মতো অসাধারণ গল্পের 'শ্রীকৃষ্ণ ওরফে চেকেষ্টা তথা চেকা-র মতো উঠতি মহাজনকে' কৃষক-মুকুন্দ পাল মোটেই সহ্য করতে পারেনি। তারাশঙ্কর নিজেই এক অর্থে পঞ্চগ্রামের দেবু পণ্ডিতের মতো কিংবা পৌষলক্ষ্মীর মুকুন্দ পালের মতো। কিন্তু একথা তো অস্বীকার করা যায় না যে মহিম গাঙ্গুলী কিংবা চেকার মতো ছোট বড়ো মহাজনেরাই পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার আগমনী ঘন্টা বাজিয়ে থাকে, ওই ব্যবস্থার নীচের কাঠামোতে আসল নকিবি তারাই করে। একজন সমাজ-সচেতন লেখক যখন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের নিয়ে

ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেন, তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব প্রদর্শন করেন তখন বুঝতে হবে তাদের অস্তিত্বকে হয় তিনি অস্বীকার করতে চান কিংবা তাদের অস্তিত্ব প্রতি পদে পদেই তাঁর কাছে অসহনীয় মনে হয়।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যেমন একদিকে মধুসূদনকে সর্বতোভাবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন তেমনি অন্যদিকে নিজস্ব শ্রেণীশক্তির জোরে তাকে বেড়ে উঠারও জায়গা করে দিয়েছেন—সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার মধুসূদন করেছিলো বলেই বিপ্রদাস কিংবা কুমুর চেয়ে তাকে অনেক ক্ষেত্রে রক্ত মাংসের মানুষ বলে মনে হয়। তারাশঙ্কর উঠতি মহাজন কিংবা ধনপতিদেরকে বেড়ে উঠার এমন সুযোগ গল্পে প্রায় দেননি বলা চলে (কোনো কোনো উপন্যাসে যৎসামান্য সহনশীলতার পরিচয় আছে যদিও) এবং না দেওয়ার কারণ তাদের প্রতি তাঁর পূর্বাপর সন্দেহ, সংশয় এবং ঘৃণা। দ্বিতীয় মহাসমরের প্রারম্ভ কাল থেকে গান্ধীবাদে বিশ্বাসী তারাশঙ্করের সমাজ-ভাবনায় কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়—মার্কসবাদের প্রতি আগ্রহও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

যুগের ঘন্টা শুনে তারাশঙ্কর হয়তো কিছুটা বুঝতে চেষ্টা করেছেন যে সামন্ততান্ত্রিক জমিদারের বিশাল ঐশ্বর্যের মহিমা, নির্ভীক-ব্যয়বাহুল্য, বেহিসাবী দয়া-দাক্ষিণ্য, অপরিমিত শক্তির দম্ভ ইত্যাদির মনোজ্ঞ কাহিনী তৈরি করে ইতিহাসের গতিময় ধারাকে ঠেকানো যাবে না। 'ধাত্রী দেবতা' উপন্যাসে সেই কারণে শিবনাথের পিসী, যিনি শিবনাথের বিষয়-সম্পত্তি ও জমিদারি রক্ষার ব্যাপারে (তাঁর মতবাদ ছিলো 'বিষয় বাপের নয়, বিষয়-দাপের') অনেকের কাছে মূর্তিমান ত্রাস হিসেবে সুপরিচিতা—তাঁর সেই স্নেহাস্পদ শিবনাথই এক সময় অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে গেল এবং তার আগেই পিসীমার প্রবল-দাপে-রক্ষা-পাওয়া-জমিদারি সে গোঁসাইবাবার হাতে তুলে দিয়েছে। 'কালিন্দী' উপন্যাসে চিনি কলের মালিক বিমল বাবু নতুন নগর পত্তন করেছেন এবং ইন্দ্ররায় ও চক্রবর্তীদের সঙ্গে তাঁর মামলা-মোকদ্দমায় জমিদারদের পরাজয়কে তারাশঙ্কর মেনে নিয়েছেন। জমিদার পরিবারের সন্তান হয়েও সোমেশ্বর সাঁওতাল বিদ্রোহের পক্ষ নিয়ে ইংরেজদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন এবং তাঁরই নাতি অহী বিদ্রোহী সাঁওতালদের বন্ধু হয়েছেন এবং এক পর্যায়ে তিনি সামন্ততান্ত্রিক জীবন ধারার বাঁধা-ধরা বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগদান করেছেন। পুলিশের হাতে তিনি ধরাও পড়েছেন। এ সমস্ত চরিত্রের ক্রমবিকাশ এবং তাদের অন্তর্মূলীয় দ্বন্দ্ব যদিও দুর্বল এবং যুক্তি-ন্যায়ের মানদণ্ডে অনেকাংশই পারম্পর্যহীন তবু একথা স্বীকার করতেই হয় যে তারাশঙ্কর সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে পুঁজিবাদের সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্বকে শেষপর্যন্ত সম্পূর্ণ এড়াতে পারেননি। এ-দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে বস্তুতান্ত্রিক।

তারাশঙ্কর অত্যন্ত আবেগবান একজন লেখক—তাঁর সেই আবেগের সঙ্গে মিশে ছিলো একজন নাট্যকার, কবি ও ধর্মপ্রাণ মানুষের তিগ্ম অনুভূতি। অবশ্য তাঁর ধর্মীয় চেতনা ধর্মধ্বজী পাণ্ডাদের কাছ থেকে পাওয়া কোনো বিষয় ছিলো না। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-

গান্ধী-শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে পাওয়া মানবতার আদর্শের উপর ভিত্তি করে তাঁর ধর্মীয় চেতনা গড়ে উঠেছিলো। ধর্মীয় চৈতন্যের বর্ণচ্ছটায় তারাশঙ্কর তাঁর মানবতাবাদী ধারণাকে রাঙিয়ে নিয়েছিলেন। তারাশঙ্করের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ বিভ্রান্তিকর কিছু বক্তব্য এরূপঃ "গান্ধীজীর সেই উনিশ শ' একুশের আন্দোলন নিজের চোখে দেখেছি! রুশ বিপ্লবের কথাও ভেবেছি। রুশ-বিপ্লবের ধারণা থেকেই আমাদের দেশে গণবিপ্লবের সম্ভাবনা সম্বন্ধে মনে চিন্তা জেগেছিল। কিন্তু পরে বুঝেছি যে, জাতির জীবনে 'সুখ' এক সুদূরপ্রসারী সাধনার ফল। মর‍্যালিটি ছাড়া সুখ হয় না।...সৎ এবং অসতের দ্বন্দ্ব এ সংসারে চিরকালের জিনিস। সৎকে কোথায় পাবে? ঈশ্বর সাধনার মধ্য দিয়েই সে অবস্থায় পৌছানো যায়। জীবনে যে জায়গাটাতে মানুষকে দাঁড়াতে হয়,—যে উৎস বা যে 'সোর্স' থেকে সত্যিকার প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়, সেটা কখনোই অসৎ হতে পারে না। ঈশ্বর সাধনা তো জীবন-সান্নিধ্য পরিত্যাগ করতে বলে না।" (ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের 'তারাশঙ্কর' নামক গ্রন্থ দ্রঃ) এ বক্তব্য তারাশঙ্করের মানসপ্রবণতা বিচারে অত্যন্ত সহায়ক। এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থের এক স্থানে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আছে—"মানুষের বিশেষ করে এই দেশের মানুষের যাদের আমি জানতে চেষ্টা করেছি—আমি নিজেই যাদের একজন, তাদের আত্মার তৃষ্ণা থেকে, রুচি থেকে বুঝতে পেরেছি সামাজিক সাম্যই সব নয়—এর পরও আছে পরম কাম্য, সেই পরম কাম্য অর্থনৈতিক সাম্য হলেই পাওয়া যাবে না। অন্তরের পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতার মধ্যেই আছে সেই পরম কাম্য, সেই পরম কাম্য অর্থনৈতিক সাম্য হলেই পাওয়া যাবে না।" সাম্যবাদ সম্পর্কে তারাশঙ্করের শেষ কথা "গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেখানকার সামাজিক উত্থান পতনের ইতিহাস সংগ্রহ করে মিলিয়ে দেখে উপলব্ধি করেছিলাম এই তত্ত্বকে। কিন্তু তার বস্তুবাদ সর্বস্বতাকে মানতে পারিনি।" তারাশঙ্করের প্রবন্ধ বা আত্মকথায় ধর্মনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কে যেমন পরস্পর-বিরোধী নানা বক্তব্য আছে তেমনি তাঁর সমগ্র কথা সাহিত্যের কোনো না কোনো ক্ষেত্রে ঐ পরস্পর-বিরোধিতা বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের মধ্য দিয়েই উঠে এসেছে। আধুনিক কালের বা তাঁর সমকালীন জীবন প্রবাহের অনেক উপাদানই তাঁর সাহিত্যে ঠাঁই পেলেও একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় যে তিনি ধর্ম-বোধকে বা ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার সুঘ্রাণকেই অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। এ আদর্শের অনুপ্রেরণা এসেছে মুখ্যত তাঁর বাবা-মা'র ধর্মীয় জীবনাদর্শ থেকে। আগেই বলা হয়েছে সে প্রেরণা কিছুটা এসেছে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী-শরৎচন্দ্রের ধর্মীয় চিন্তাদর্শ থেকে। এ বিষয়ে বিদেশী কোনো কোনো সাহিত্যিকের কাছেও তাঁর প্রচুর ঋণের কথা স্বীকার করতেই হয়। টলস্টয়ের বাইবেলীয় জীবনাদর্শ সম্ভবত সেদিক থেকে তাঁকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছিলো। অবশ্য সমাজ বাস্তবতা সম্পর্কে টলস্টয়ের মতো বিচারশক্তি ও দূরদৃষ্টির গভীরতা তারাশঙ্করে অনুপস্থিত। এ কথা সত্য যে কল্লোলীয় জীবনাদর্শের পটভূমিতে ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার মূলোৎপাটন করা হয়েছিলো।

রবীন্দ্রনাথ ধর্মীয় চিন্তাকে রোমান্টিকতার মোড়কে আবৃত করে আমাদের উপহার দিয়েছিলেন—কল্লোলীয় লেখকদের কাছে সেটাও অসহ্য মনে হয়েছিলো। গল্প, উপন্যাস ও কবিতার ভাব ও বিষয়ের ক্ষেত্রে তাঁরা এমন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চাইলেন যে তাতে অনিবার্যভাবে ধর্ম ও জীবনের ক্ষেত্রে পুরানো সমস্ত মূল্যবোধ হুমকির সম্মুখীন হলো। কিন্তু ধর্ম ও জীবনের পুরানো মূল্যবোধকে তারাশঙ্কর আঁকড়ে ধরে থাকাটাকেই শ্রেয় মনে করেছেন। তারাশঙ্কর স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে সাহিত্য যদি সমাজমনের দর্পণ হয় তাহলে দেশের মানুষ ও মাটির সঙ্গে যুগযুগান্তরের সাধনায় যে ধর্মবিশ্বাস অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে তাকে বাদ দিয়ে সাহিত্য রচনা করলে কালান্তরে গিয়ে তা টিকবে না। তাঁর ধারণা ছিলো আজ মত্ততার জোয়ারে ভেসে গিয়ে কল্লোলীয় লেখকেরা বিদেশের সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে যা-সব আমদানি করছেন তার আবেদন ক্ষণস্থায়ী—কারণ দেশের আবহমানকালের ধারায় গড়ে উঠা নীতি-নৈতিকতার সঙ্গে তার কোনো আত্মিক সম্পর্ক নেই। তাই ধর্মের সনাতন ধ্যান-ধারণাকে সাহিত্যের উপাদান হিসাবে ব্যবহার না করার অর্থই হচ্ছে ভারতীয় জীবনের শাশ্বত মূল্যবোধকে অস্বীকার করা। তারাশঙ্কর সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে ধর্মীয় চেতনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সোপান বলে মনে করেন। এই কারণে তিনি কল্লোলের হয়েও কল্লোলের নন। কল্লোলের নির্বারিত-যৌনোল্লাস, বিহ্বল-ভাববিলাস, অবারণ-অকারণ ভেসে চলার দুরন্ত আবেগ—এ সমস্তকে তারাশঙ্কর যে অন্তর থেকে স্বাগত জানাতে পারেননি তার কারণ তাঁর ঐ ধর্মীয় চেতনার মধ্যেই লুকিয়ে আছে। অবাধ যৌনচর্চা তাঁর কিছু কিছু গল্প ও উপন্যাসে অবশ্যই আছে কিন্তু ঐসব কাহিনীর গতি-প্রকৃতি ও সমাপ্তি ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

তারাশঙ্কর এক স্থানে লিখেছেন— "এ দেশের সমাজ ব্রাহ্মণেই গঠন করেছে—সমাজকে, সংস্কৃতিকে, বহু বিপ্লব, বহু দুর্যোগ ও বহু বিবর্তন, বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিয়ে এসেছে; বিংশ শতাব্দীর ভাববিপ্লবেও এদেশের নেতৃত্ব করেছে ব্রাহ্মণ। রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। অন্যদিকে গ্রাম্য সমাজে এখনও এই ব্রাহ্মণ বর্তমান রয়েছেন।...জন্মগত জাতিপ্রধান বর্ণাশ্রম ধর্ম উঠে গেলেও কর্মগতব্রাহ্মণ প্রাধান্য থাকবেই। এই ন্যায়রত্ন চরিত্র এই কারণেই পরবর্তীকালে আমার বহু বৃহৎ রচনার কেন্দ্রে প্রায় প্রাণশক্তির মত আবির্ভূত হয়েছে।" কর্মগত ব্রাহ্মণের প্রাধান্যের ব্যাপারে তারাশঙ্কর যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং ঈশ্বর সাধনার মধ্য দিয়ে সৎকে লাভ করার যে মতামত তিনি ব্যক্ত করেছেন তাতে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে কর্মকুশলী ব্রাহ্মণকে সততা ও নিষ্ঠা বজায় রাখতে হলে তার পক্ষে ঈশ্বর সাধনা অপরিহার্য। অবশ্য তারাশঙ্করের এই ঈশ্বর সাধনা মানুষের জীবনকে নিয়েই। 'ডাকহরকরা' গল্পের দীনু ডোম কিংবা 'শেষ কথা' গল্পের লালমোহন জন্মগত দিক থেকে ব্রাহ্মণ নয় কিন্তু তারা তাদের দুঃসহদারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনে অর্থের লোভকে যেভাবে দমন করেছে তাতে সেই বিশেষ অবস্থায় তাদের ভাবমূর্তি অসাধারণ একটি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে— মনে হয় তারা যেন সংকটময় সেই

মুহূর্তে বিস্ময়কর সংযমের মধ্য দিয়েধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও ছাড়িয়ে গেছে। কর্মগত দিক থেকে তারাশঙ্কর এদেরকে ব্রাহ্মণ বলতে চান কিনা জানি না--তবে পাপ-পুণ্য ও ধর্মাধর্মের প্রশ্নেই যে তাদের বিবেকের জাগরণ ঘটেছিলো তা বলাই বাহুল্য। তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যে মর‍্যালিটির এই প্রসঙ্গটি আমাদের দেশের অশিক্ষিত মানুষের মধ্যেও যে কত তীব্র হতে পারে তা দেখিয়েছেন।

কিন্তু প্রশ্ন, যে-লেখক এককালে রুশ-বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমাজতন্ত্রবাদের দিকে ঝুঁকলেন তাঁর পক্ষে ঈশ্বর-সাধনার মধ্য দিয়ে এহেন প্রক্রিয়ায় ধর্ম চর্চা কি আদৌ সঙ্গত এবং সমীচীন? যে-লেখক বলেন ঈশ্বর-সাধানার মধ্য দিয়েই সৎ জীবনকে পাওয়া যায় অথবা বলেন সামাজিক বা অর্থনৈতিক সাম্যই সব কথা নয়, বড় কথা নয়, পরম কাম্যকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে পাওয়াই আসল কথা— সেই লেখক কখনো কি সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী হতে পারেন? তারাশঙ্করের জীবনের সবচেয়ে বড় স্ববিরোধিতা এইখানেই। আসলে সমাজতন্ত্রবাদের উপর তাঁর ধারণা কিংবা বিশ্বাস ছিলো একান্তই ভাসাভাসা ধরনের। তারাশঙ্কর বলেছেন— "অন্তরের পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতার মধ্যেই আছে সেই পরম কাম্য, সেই পরম কাম্য অর্থনৈতিক সাম্য হলেই পাওয়া যাবে না।" এর পাশাপাশি 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসের তারাশঙ্কর তাঁর নিজের স্বপ্ন-কল্পনাকে দেবু পন্ডিতের প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে কিভাবে ব্যক্ত করেছেন তা লক্ষ্য করা যাক— "শুধু তাহাদেরই নয়— পঞ্চগ্রামের প্রতিটি সংসার ন্যায়ের সংসার, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা, অভাব নাই, অন্যায় নাই, অন্ন-বস্ত্র, ঔষধ-পথ্য, আরোগ্য, স্বাস্থ্য, শক্তি, সাহস, অভয় দিয়া পরিপূর্ণ উজ্জ্বল। আনন্দে মুখর, শান্তিতে স্নিগ্ধ। দেশে নিরন্ন কেহ থাকিবে না, আহার্যের শক্তিতে,— ঔষধের আরোগ্যে নীরোগ হইবে, পঞ্চগ্রাম ; মানুষ হইবে বলশালী, পরিপুষ্ট, সবল-দেহ— আকারে তাহারা বৃদ্ধিলাভ করিবে, বুকের পাটা হইবে এতখানি, অদম্য সাহসে নির্ভয়ে তাহারা চলাফেরা করিবে।" তারাশঙ্করের 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। প্রথম মহাসমর প্রায় ছাব্বিশ বছর আগে শেষ হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় মহাসমর তখনও চলছে। দু-দুটো মহাসমরের ভয়াল বিভীষিকার মধ্য দিয়ে তখন বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের কাছে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে পুঁজিবাদের আয়ু শেষ হয়ে আসছে—পুঁজিবাদ অবক্ষয়ের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তখন চরম অবক্ষয় বিরাজমান। তাহলে প্রশ্ন ক্ষয়িষ্ণু, জরাজীর্ণ ও লোলাঙ্গী মানুষের এই দেশে তারাশঙ্কর 'বলশালী, পরিপুষ্ট, সবল-দেহ' মানুষ লাভের স্বপ্ন কোন্ সমাজের উপর দাঁড়িয়ে দেখতে চাচ্ছেন ? তাঁর স্বপ্ন-লালিত সেই মানুষ কি সমকালীন ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী সমাজের মধ্য থেকেই জন্ম নেবে ? নাকি সমাজতান্ত্রিক কোনো রাষ্ট্রের মধ্য থেকেই এরা জন্ম নেবে ? আসলে এ বিষয়ে তারাশঙ্করের নিজেরই স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিলো না। তিনি দারিদ্র্যমুক্ত ও 'আনন্দেমুখর, শান্তিতে স্নিগ্ধ' একটি সমাজ প্রত্যাশা করেছিলেন কিন্তু কোন্ অবস্থার মধ্য দিয়ে তা লাভ করা যাবে সে সম্পর্কে তাঁর সঠিক কোন পরিকল্পনা বা ধারণাই

ছিলো না। ঈশ্বর-সাধনার মধ্য দিয়ে সৎকে, পরম কাম্যকে পাওয়ার এষণা তাঁর মর্মমূলে বাসা বেঁধেছিলো—সেই কারণে তাঁর সাহিত্যে আর্থ রাজনীতির প্রশ্নে সমাজতান্ত্রিক ভাবনার পরিণত ও প্রত্যয়গ্রাহ্য রূপরেখা অনুপস্থিত। তারাশঙ্কর নিজে একদা সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছিলেন বলে যে-দাবি করা হয় তা অসঙ্গত ও অর্থহীন এই কারণে যে ঐ মতবাদ সম্পর্কে তাঁর পরিপূর্ণ স্বচ্ছ কোনো ধারণাই ছিলো না। অর্থনৈতিক সাম্য ও পরমকাম্য সম্পর্কে তাঁর অযৌক্তিক ও সঙ্গতিহীন বক্তব্যই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মানুষের পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ অন্তর তাঁর কাম্য কিন্তু শোষণদীর্ণ ও হতাশাখিন্ন সমাজে তা কি এতই সুলভ ? একথা অস্বীকার করার কোনোই উপায় নেই যে বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্করই (নানারকম অসঙ্গতি ও স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও) প্রথম আত্মিক ও আর্থ-রাজনৈতিক প্রশ্নে ব্যাপক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টি করেছেন কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত ধর্মানুসরণের মধ্য দিয়ে মানুষের আত্মার সাধনাকেই বড়ো করে দেখতে গিয়ে ভাববাদের আবর্তে পতিত হয়েছেন। এ পর্যন্ত যে কজন গল্পকারের কথা আলোচিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর নিঃসন্দেহে একজন শক্তিমান লেখক কিন্তু ধর্মীয় চেতনা প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছে। এটা নিঃসন্দেহে তাঁর রিঅ্যাক্‌শনারি মনোভঙ্গীরই পরিচায়ক। তারাশঙ্করের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব সম্পর্কে সমালোচনা করতে গিয়ে নারায়ণ চৌধুরী তাঁর 'উত্তর-শরৎ ও বাংলা উপন্যাস' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, "রাজনীতিতে অগ্রসর কামনা আর রক্ষণশীল পশ্চাৎ-টানের দ্বারা সতত আন্দোলিত হয়েছে তাঁর চিত্ত। প্রথম জীবনে প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, পরে সেখান থেকে সরে গিয়ে কায়েমী স্বার্থবাদীদের সঙ্গে হাত মেলান, এই ক্ষেত্র পরিবর্তনকে সুবিধাবাদ ছাড়া আর অন্য কোন নামেই বোধ করি অভিহিত করা যায় না।" প্রগতি-বিরুদ্ধতার এই ভাবটিকে তারাশঙ্কর কখনো কখনো ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা যে করেননি তা নয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরমপুরুষের উদগ্র চেতনা তাঁকে সিন্দাবাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসে থাকা সেই বৃদ্ধ ও কুঁজো লোকটার মতো যেন আরো জোরেসোরেই জাপটিয়ে ধরেছে। তাঁর কথাসাহিত্যের দুর্বলতার মূলীভূত কারণ বুদ্ধদেব বসুর একটি উক্তির মধ্যে সুন্দরভাবে পাওয়া যায়—"......... he (তারাশঙ্কর) is well stocked in facts, but rather in the manner of Juliet's nurse ; he observes, but cannot judge; he visualizes well, but has no vision." তারাশঙ্কর সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর এই উক্তি খুবই বিস্বাদ ও শ্রুতিকটু, কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অবশ্য এ-কটুক্তি তাঁর কিছু কিছু গল্পের বেলায় ততটা খাটে না যতটা খাটে তাঁর প্রায় সমস্ত উপন্যাসের বেলায়। বুদ্ধদেব বসুও সেকথা নিজেই স্বীকার করেছেন। তারাশঙ্করের উপন্যাসের মূল্য বিচার প্রসঙ্গে কোন এক সমালোচকের সংক্ষিপ্ত একটি মন্তব্য খুবই যথার্থ বলে মনে হয়। উক্তিটি এরূপ—"তারাশঙ্করের নায়ক-চরিত্রেরা বলি হয়ে যায় তাঁর নাটকীয়তার কাছে।" নাটকীয়তা, কখনো কখনো অতি-নাটকীয়তার প্রতি অত্যধিক দুর্বলতা থাকার কারণেই

তারাশঙ্কর অধিকাংশ ক্ষেত্রে....এমনকি অনেক গল্পের ক্ষেত্রেও চরিত্রের ক্রমবিকাশের অনিবার্য পারম্পর্য মেনে চলেননি এবং ঐ লঙ্ঘন ও উল্লম্ফনের জন্য তাঁর অতি-নাটকীয় প্রবৃত্তিকেই বহুলাংশে দায়ী করা যায়।

অহীন মার্কবাদ গ্রহণ করে কিন্তু সমাজ বাস্তবতার কোন্ অবস্থার চাপে সে তা গ্রহণ করলো তার যুক্তিগ্রাহ্য এবং ধারাবাহিক কারণ নির্ণয় তারাশঙ্কর করেননি। মেল-রানার দীনু ডোম কিংবা লালমোহন দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করা সত্ত্বেও কিসের জোরে আকর্ষণীয়-অর্থের লোভ অবলীলাক্রমে সংবরণ করে তার বাস্তব-সমর্থিত কোনো ব্যাখ্যাই তারাশঙ্কর তুলে ধরতে রাজী নন। আদর্শের প্রতিভূ হিসাবে ঐ সমস্ত চরিত্র পূর্ব থেকেই পরিকল্পিত অর্থাৎ তারা সংঘাতময় বাস্তব অবস্থার চাপে সৃষ্ট-চরিত্র ততটা নয় যতটা তারা নৈতিকতার আদর্শের ছকে আগে থেকেই তৈরি থাকে। দ্বান্দ্বিক বাস্তব অবস্থার বিচার-বিবেচনা ও সে-সম্পর্কে দূরদৃষ্টির অভাবই তাঁকে ঐ ধরনের ধর্মীয়-নীতি-সিদ্ধ ও ছক-বাঁধা গল্প রচনায় সাহায্য করে। ঠিক একই কারণে দেখা যায় তাঁর 'পৌষ-লক্ষ্মী'-র মতো একটি গল্পে মুকুন্দপালের আকস্মিক মৃত্যুতে নাটকীয়তার প্রকাশ যত বেশী, সমাজবাস্তবতার প্রকাশ সেই তুলনায় অনেক কম। তারাশঙ্করের অসাধারণ এই গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সালে।

দশ

কৃষকের জীবনের সুখ ও সচ্ছলতার আর্তিকে কেন্দ্র করে পল্লবিত হয়েছে তারাশঙ্করের শীর্ষস্থানীয় গল্প 'পৌষ-লক্ষ্মী'। বাংলার কৃষকের রঙীন ও সোনালী প্রত্যাশাকে বুকে নিয়ে পৌষ-লক্ষ্মী এবারে গ্রামের প্রপীড়িত ও বুভুক্ষু মানুষের দ্বারে এসেছে, এসেছে দিক-দিগন্ত ভরে সোনালী ধানের সাজে সেজে। মুকুন্দপালের হৃদয়ে এখন সুখের সমুদ্র-জোয়ার। তার নিঃশ্বাসে দখিনা বাতাসের প্রাচুর্য। চোখে আকাশ-নীলের-প্রশান্তি। সুখময়, শান্তিময় জীবনের কল্পনায় মুকুন্দপাল বিভোর ঃ "এবার মা লক্ষ্মী পায়ে হেঁটে এসেছেন। অনেকদিন পরে সত্যি পৌষ-লক্ষ্মী হবে। .... তিনটি গোলা। একটি সরস্বতীর, একটি লক্ষ্মীর, একটি আমার। .... বছর বছর যদি এমনই পৌষ আসে, মাঠ থই-থই-করা ধান, খামার ভর্তি গোলা ভর্তি ঘর ভর্তি করা পৌষ, তবে সে পৌষ আর যাবে না। সে জন্ম জন্মই থাকবে, গেরস্থকে দুধে ভাতেই রাখবে। ছেলেপুলে খোরা পাথর ভরে ভাত খাবে।" কৃষক জীবনের এ-স্বপ্ন-কল্পনা খুবই বাস্তব সম্মত নিঃসন্দেহে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাশঙ্কর স্বপ্ন-কল্পনায়-উদ্দীপিত-মুকুন্দপালের জীবনের পরিসমাপ্তি কিভাবে ঘটালেন? মুকুন্দপালের আকস্মিক সেই মৃত্যুর বর্ণনা এরূপ ঃ "চাঁদনী রাতের পালকের মত রঙের মলমলে ঢাকা মা বসুমতী–। এ কি! তার এ কি হ'ল? সরস্বতী, তার মেয়ে লক্ষ্মী, মাঠ ভরা ধান, এ ফেলে– সে দুই হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরলে তার গাড়ীতে বোঝাই ধানের আঁটির ডগা। আঁটির ডগায় ফলন্ত ধান। জোরে, সজোরে চেপে ধরলে নইলে পড়ে যাবে

সে। গাড়ি চলছিল। পালের দুই হাতের মুঠোর মধ্যে ছিঁড়ে এল মুঠাভর্তি ধান। গাড়ী চলে গেল। পাল মাটিতে পড়ে গেল মহাপ্রস্থানের পথে ভীমের মতো। বারকতক পা ছুঁড়লে— নাকটা মুখটা ঘষলে ক্ষেতের ধূলার উপর, এক মুখ ধূলা কামড়ে ধরবে বাঁচবার ব্যগ্রতায়। রক্ত মাটিতে মিশে একাকার হয়ে গেল। ধান-ভরা, মুঠা-বাঁধা হাত দুখানা প্রসারিত করে দিয়ে সমস্ত অপেক্ষা তার স্তব্ধ হয়ে গেল পর মুহূর্তে।" মুকুন্দপালের আকস্মিক এই মৃত্যু মর্মস্পর্শী নিঃসন্দেহে। কিন্তু এ-মৃত্যু এক সাধারণ এবং সরলীকৃত জীবনাবসানের আলেখ্য ছাড়া আর কিছু নয়— শ্রেণীগত দিক থেকে এ-মৃত্যুর তাৎপর্য অনুসন্ধান বৃথা। এ-গল্পে তারাশঙ্কর মুকুন্দপালের আবেগবান ও বলীয়ান প্রত্যাশার সঙ্গে চেকা মহাজনের আগ্রাসী মনোভাবের বিরোধ-সম্পর্কটিকে, সুযোগ যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও, বাস্তব সম্মত উপায়ে অধিক তীব্রতায় ও অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। বাংলাদেশের কৃষকের সচ্ছল জীবনের সুখ-স্বপ্নকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়ার ব্যাপারে হৃদরোগকে (মুকুন্দপালের আকস্মিক মৃত্যু খুব সম্ভব হৃদরোগের কারণে হয়েছে) কল্পনা করার চেয়ে জলের কুমীর ও বনের বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর গ্রাম্য মহাজন টাউটদের পরিকল্পিত শোষণের বিষাক্ত ছোবলকে কল্পনা করা কি অধিক বাস্তব সম্মত নয়? স্বপ্ন-কল্পনায়-উদ্বুদ্ধ মুকুন্দপালের সঙ্গে গ্রামের সর্বগ্রাসী মহাজন চেকার পরিহাস-রসিকতা এ গল্পে অগভীর বাস্তবতারই পরিচায়ক। তারাশঙ্কর কি মনে করেন বাংলার কৃষক এভাবেই তাদের অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুজনিত কারণেই হাতের মুঠোয় পাওয়া সুখভোগ থেকে বঞ্চিত হয়?

আসলে তারাশঙ্কর শ্রেণীসংগ্রামের অনুমোদক নন। তাঁর মত ও পথের নিশানা ভিন্ন। তিনি তাঁর কথা-সাহিত্যে মানুষ খুঁজেছেন— কিন্তু সে মানুষের চরিত্র "ধনীর নয়, দরিদ্রের নয়, জমিদারের নয়, প্রজার নয়, মহামহিম মানুষের।" তাঁর সে মানুষ ধর্মাদর্শে বলীয়ান, তাঁর সে মানুষ ঈশ্বরের আলোয় আলোকিত। কিন্তু তারাশঙ্কর কি জানেন না ক্লেদাক্তসমাজে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ঘর্মাক্ত যে মানুষকে আমরা অহরহ প্রত্যক্ষ করছি, সে-মানুষের জীবনে লালসা আছে, জিঘাংসা আছে, রিরংসা আছে, মনুষ্যত্ব-অমনুষ্যত্বের পারদধর্মী উপাদান আছে, শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণী সংঘর্ষ আছে— সব মিলিয়ে তবেই না একজন মানুষকে আমরা পাই। সেই মানুষের সন্ধান করতে গিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর কবিতায় বলেছেন—

মানুষের মানে চাই-
-গোটা মানুষের মানে।
রক্ত, মাংস, হাড়, মেদ মজ্জা
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, হিংসা সমেত-
গোটা মানুষের মানে চাই।

ক্ষয়িষ্ণু সমাজের আবেষ্টনীতে নিরন্তর যেখানে আত্মক্ষয় ও নীতিভ্রষ্টতার লীলা সগৌরবে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে সেখানে নির্লোভ ও নিষ্কাম মহাপুরুষদের জীবনাদর্শের

ছাঁদে মহামহিম চরিত্র সৃষ্টি করার মধ্যে আদর্শবাদী লেখকের কৃতিত্ব অর্জিত হলেও, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী লেখক, হিসেবে ব্যর্থতা অনস্বীকার্য। তারাশঙ্করের গল্পের জগৎ যেমন বিশাল তেমনি তার বৈচিত্র্যও প্রচুর। প্রগাঢ় রোম্যান্টিসিজমের মোহময়-উপস্থাপন যেমন তাঁর আউল-বাউল, বেদে-বেদেনী ইত্যাদির নিরুদ্বেলিত জীবনধারার মধ্যে দিয়ে লক্ষ্য করা যায় তেমনি কিছু কিছু গল্পের মুখ-থুবড়ে-পড়ে-যাওয়া-সামন্তবাদের প্রতি তাঁর বেদনা-মথিত হৃদয়ের সকরুণ হতাশ্বাস লক্ষ্য করা যায়। এর ফাঁকে ফাঁকেই তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কলাকৌশলে রোপণ করেছেন আধ্যাত্মিক আদর্শের বীজ। সমকালীন রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রবল অবক্ষয় একদা তারাশঙ্করকে সমাজ সচেতন লেখক হবার প্রেরণা যুগিয়েছিলো, কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, সে ক্ষেত্রেও তিনি বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন অবাস্তব স্বপ্ন-কল্পনার মাধ্যমে। আধ্যাত্মিকতার উচ্চতর আদর্শই তাঁর সেই স্বপ্ন-কল্পনা।

ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে কল্লোলীয় লেখকদের বিরুদ্ধে মনোভাব কিংবা তার মূলোৎপাটনের সচেতন অভীপ্সার কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। নীতির কষ্টি পাথর অনুযায়ী তাঁদের কারো কারো কথা-সাহিত্যের মানুষ নষ্ট ও ভ্রষ্ট—তাদের সারা শরীর ও মন পাপের কলুষতায় আচ্ছন্ন। মিথুনাসক্তির প্রাবল্য তারাশঙ্করের গল্প কিংবা উপন্যাসে নেই ঠিকই কিন্তু একেবারে বর্জিত হয়েছে তা অবশ্যই বলা যায় না। কিন্তু কল্লোলীয় ধারায় আধ্যাত্মিকতার প্রসঙ্গটি ছিলো একেবারেই অকল্পনীয় এবং দূষ্য, কল্লোলাদর্শে তাকে একেবারেই জ্ঞাতি-ভ্রষ্ট ও নীতিচ্যুত বলা যায়। তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যে অ-কল্লোলীয় সেই বিষয়টিকেই সগৌরবে লালন করলেন। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আগেই করা হয়েছে। তারাশঙ্কর সম্পর্কে একটি কথা কিছুতেই স্বীকার না করে পারা যায় না যে সৃষ্টি সম্ভারের বিপুলতা এবং তার বিচিত্রস্বাদী রূপকল্পনার কারণে তিনি বহু সংখ্যক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। গল্পকার ও ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করকে যে বিপুল বৈচিত্র ও প্রাণময়তার মধ্য দিয়ে আমরা আবিষ্কার করি তার কোনো প্রতিতুলনা কল্লোল যুগের কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে তো বটেই, এমন কি সমকালীন সমগ্র বাংলা কথা-সাহিত্যেও একমাত্র বস্তুবাদী লেখক হিসাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্বের কথা বাদ দিলে আর কারো সঙ্গেই করা চলে না। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বলা সমীচীন যে সমাজবাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সাহিত্য শ্রেণীসচেতন পাঠককে সামনের দিকে ততটা টানে না যতটা পেছনের দিকে ঠেলে দেয়। প্রগতিশীল ও সমাজতন্ত্রবাদী তারাশঙ্করের মধ্যেই মানবতাবাদের আড়ালে অতি সঙ্গোপনে লুকিয়ে আছে প্রতিক্রিয়াশীল ও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক এক তারাশঙ্কর—তাঁর সমগ্র সাহিত্যের আলোকে সেই বর্ণচোরা তারাশঙ্করটিকে চিনে নিতে না পারলে বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত।

যে কয়জন গাল্পিকের মানসপ্রবণতার স্বরূপ সন্ধান করা হলো, আমরা দেখেছি তাঁদের প্রায় সকলেরই প্রথম উন্মেষ কল্লোল পত্রিকায় ঘটেছে। কল্লোল ১৯৩০ সালের দিকে বন্ধ

হয়ে যাবার পর তাঁরা জীবনের শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়ে নিজেদের সাহিত্যের বিকাশ ঘটিয়েছেন—কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে উন্মেষকালের সেই একই মানসপ্রবণতা শেষ পর্যন্ত তারা লালন করে গেছেন। এঁদের প্রত্যেকেরই স্ব স্ব ক্ষেত্রে শক্তিমত্তা ও দুর্বলতার দিকসমূহ আগেই তুলে ধরা হয়েছে। সমাজবাস্তবতার ক্ষেত্রে এঁদের কারো কারো গল্প এক-আধটু অবদান রাখলেও, একথা বলা সমীচীন যে এ ব্যাপারে তাঁরা কখনোই পরিপূর্ণভাবে নির্দ্বন্দ্ব হতে পারেন নি। আমরা দেখেছি নজরুল প্রথম দিকে, অর্থাৎ কল্লোলের প্রায় উন্মেষ পর্বেই কাব্যক্ষেত্রে শোষণহীন সমাজ বিপ্লবের যে ধারা প্রবর্তন করলেন কিছুকাল পরে সেই বিপ্লবী ও বিদ্রোহী কবিকেই দেখা গেল অধ্যাত্মবাদে আত্মসমর্পিত। 'পাঁক'-পরবর্তী প্রেমেন্দ্র মিত্র হতাশায় ম্রিয়মাণ, বিষণ্নতায় কাতর। চার দশকের গোড়ার দিক থেকে (বলা যায় 'দর্পণ' উপন্যাসের পর থেকে) অব্যাহত ধারায় সমাজবাস্তবতার নির্দ্বন্দ্ব বিকাশ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা সাহিত্যে লক্ষণীয় হয়ে উঠার প্রায় এক যুগ আগেই কল্লোলের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। মানিক বন্দ্যোপ্যধ্যায় প্রথম দিকে কিছুটা কল্লোলাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই Sex-এর প্রতি ঝুঁকেছিলেন— অবশ্য Sex-কে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাবার কৃতিত্বটুকু তাঁর নিজের। এর মধ্যে সাহিত্যের পরমার্থ অনুসন্ধান যে বৃথা এ সর্তক বাণী তিনি পেলেন মার্কসবাদে। মার্কসবাদের প্রতি প্রবল আকর্ষণ এবং উত্তরোত্তর কঠোর অধ্যয়নই তাঁকে সমাজবাস্তবতার প্রতি আস্থাশীল করে তোলে।

কিন্তু কল্লোল প্রভাবিত গাল্পিকদের মধ্যে আমরা কি দেখলাম? বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রে দেখেছি তিনি সমাজের বাস্তব জীবনের পরিপার্শ্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নব নব কৌশলে আপন অন্তর্লোকে যাত্রা করেছেন। তিনি শিল্পরচনার জগৎ ও সমাজ-রচনার জগৎকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দেখতে চেয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' উপন্যাসে সমাজ-বিপ্লবের প্রসঙ্গ সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করলেও তাঁর মূল সমস্যা অনেকটা ঐ গ্রন্থের নায়ক অশান্ত কর্মকারের মতোই—অর্থাৎ 'পথ জানা নেই।' কোন্ পথে সমাজ শোষণমুক্ত হবে এ বিষয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকায় তাঁর তীব্র সমাজ সচেতনতা এক পর্যায়ে হতাশার ভাবে উচ্ছকিত করুণ ক্রন্দনের মতো অন্তর্ভেদী হয়ে উঠেছে। সমাজবাস্তবতার প্রতি আস্থাশীল হতে না পারার কারণে হতাশাই শেষ পর্যন্ত এমন অসাধারণ শক্তিমান গাল্পিককে গ্রাস করে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সামগ্রিক চেতনালোকে ছিলো উৎকট রোমান্টিকতার রঙ্গীন ভাববিলাস। এক পর্যায়ে তিনি যৌনতার প্রবল জোয়ারে ভেসে গিয়েছেন, এক পর্যায়ে তিনি আত্যন্তিক ভক্তিবাদে আচ্ছন্ন হয়ে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। পরস্পর বিরোধী এতগুলো ভাবধারাকে লালন করার অর্থই হচ্ছে লেখক হিসাবে তাঁর কমিটমেন্টের অভাবকে সুচিহ্নিত করা। অচিন্ত্যকুমার যেমন তাঁর বাস্তবধর্মী গল্পে জীবনের বাস্তবতাকে সমগ্রতার সঙ্গে সমন্বিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন, ঠিক শৈলজানন্দের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যর্থতা চোখে পড়ে। আমরা দেখেছি এঁদের তুলনায় তারাশঙ্কর

অনেক বেশী প্রগতিশীল। লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কিত জরুরী বিষয়গুলিকেও মোটামুটিভাবে তিনি কোনো না কোনোভাবে তাঁর সাহিত্যের সীমানায় টেনে এনেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর সাহিত্যে বাস্তব পরিমণ্ডলের objective conditions গুলোকে বাস্তব ঘটনার পারম্পর্যে বিচার করেননি—প্রায় ক্ষেত্রে তিনি পূর্ব পরিকল্পিত বদ্ধমূল কোনো অধ্যাত্ম কিংবা নৈতিক বোধের দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখকের এ-মানসিকতা অত্যন্ত ক্ষতিকর। রালফ ফক্সের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি তাঁর 'নভেল এ্যাণ্ড দ্য পিপল' গ্রন্থের এক স্থানে বলেছেন—'আজকের দিনের সাহিত্যের বিপ্লবী কাজ হল তার মহান ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করা, ভাববাদ বা অধ্যাত্মবাদের সব বন্ধন ভেঙ্গে ফেলা, ভেঙ্গে ফেলা সঙ্কীর্ণ বিশেষীকরণকে ; এবং সৃষ্টিশীল, প্রতিশ্রুতিময় লেখককে তাঁর একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। সেই কাজ হলো সত্যের জ্ঞানকে জানা ও জয় করা, সেই কাজ হল বাস্তবকে জানা। মানুষের পক্ষে বাস্তবকে উপলব্ধি করার ও অঙ্গীভূত করার যা উপায় আছে, শিল্প হল তার একটি। নওমি মিচিসনের ভাষায় বলা যেতে পারে লেখক তাঁর নিজস্ব অন্তর্লীন চেতনার কামারশালায় বাস্তবের উজ্জ্বল সাদা লোহাকে হাতড়ী-পেটা করে নিজের কাজে লাগানোর মত আকৃতি দিয়ে নেন; গড়ে পিটে নেন নিজের চিন্তার ধার দিয়ে। অর্থাৎ পৃথিবীর একটি খাঁটি ও বিশ্বাসযোগ্য চিত্র গড়ে তুলতে লেখক বা শিল্পীকে বাস্তবের সঙ্গে দুর্ধর্ষ এক সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে হয়। এই সংঘাতের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সৃষ্টির গোটা রহস্য, শিল্পীর তাবৎ যন্ত্রণা ও উদ্বেগ।...... বস্তুতঃই যিনি মহৎ সাহিত্যিক, তিনি তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক না কেন, সব সময়ই এক ভয়ঙ্কর ও বৈপ্লবিক সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন। এই সংগ্রাম বাস্তবের সঙ্গে। এই সংগ্রাম বৈপ্লবিক, কেননা তা বাস্তবকে পরিবর্তিত করতে সচেষ্ট থাকে প্রতিনিয়ত।" শিল্পীর সৃষ্টি-রহস্য ও তার যন্ত্রণা-উদ্বেগ যে বাস্তবের সঙ্গে প্রবল সংঘাতের মধ্যেই জড়িয়ে থাকে একথা অস্বীকার করা যায় না। মোটকথা সমকালীন বাস্তব পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে বিকাশমান মানুষকে দেখার প্রেরণা ও শক্তি না থাকলে মহৎ লেখক হওয়া যায় না। কল্লোলীয় গল্পকারদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু থেকে শুরু করে তারাশঙ্করের গল্পে বাস্তবতার সেই পরিচয় কতখানি পাওয়া যায় তা রালফ ফক্স কিংবা নওমি মিচিসনের বক্তব্যের কষ্টি পাথরে যাচাই করলেই বুঝা যায়। সমকালীন আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি অহরহ ব্যক্তি জীবনকে কিভাবে প্রকাশ করে, তা ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রেম-ভালোবাসা, ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব ইত্যাদিকে কতখানি প্রভাবিত করে—সেই সংঘাতসমূহের গতিপ্রকৃতি ও ফলাফল সম্পর্কে বস্তুবাদী লেখকের ধারণা কতটুকু স্বচ্ছ ও গভীর তা অবশ্যই বিচার্য। কল্লোলীয় গল্পকারদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের গল্পকে ভ্যাপসা রোম্যান্টিসিজমের আলো-হাওয়ায় ভরিয়ে তুলেছেন। ম্যাক্সিম গোর্কি ঐ প্রবণতাকেই প্যাসিভ বা নিশ্চেষ্ট রোম্যান্টিসিজম হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। কল্লোলীয় আদর্শের ঐ প্রভাব পরবর্তী বহু গাল্পিকের উপরেই

পড়েছে এবং আমরা জানি যে বাংলা কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার ফলাফল খুবই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন কথা-সাহিতিকের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনপুষ্ট গল্পের ধারা সংযোজিত হওয়ার ফলেই বাংলা গল্পের ক্ষেত্রে কিছুটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। হয়তো এই ধারারই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাবে ছোট গল্পের ক্ষেত্রে বর্তমানের সমাজ বিচ্ছিন্ন রোম্যান্টিসিজমের ধারাটি উত্তরোত্তর পরিবর্তিত হতে থাকবে। আশা করা যায় সেদিন বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ গল্পকারই রালফ ফক্স বা নওমি মিচিসনের মতোই জোর দিয়ে বিশ্বাস করবেন—লেখককে বিশ্বাসযোগ্য ও খাঁটি কোনো চিত্র আঁকতে হলে সমকালীন বাস্তবের সঙ্গে দুর্ধর্ষ সংঘাতে জড়িয়ে পড়তেই হবে, কারণ তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে লেখকের সমুদয় যন্ত্রণা-উদ্বেগ ও সৃষ্টি-রহস্য।

বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা
শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৯ থেকে মাঘ-চৈত্র ১৩৮৯।

লাল সালু ঃ দেশকাল

ধর্মাশ্রিত চিন্তা-চেতনার সিঁড়ি বেয়ে মুসলমান সম্প্রদায় কখানো কখনো যেমন গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করে বিশ্বের বহু মানুষের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছে, তেমনি কখনো কখনো মুসলমানেরা ধর্মোন্মাদ হয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে ডেকে এনেছে দারুণ বিপর্যয়। ইসলাম ধর্ম কিভাবে সমাজের নিঃস্ব ও নিপীড়িত মানুষকে রক্ষা করার ব্যাপারে একদা ইতিবাচক অবদান রেখেছিল তার পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারী চার খলিফার মহত্তর জীবনাদর্শ ও প্রত্যক্ষ জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে। মোটামুটিভাবে বলা যায় চার খলিফা গতায়ু হবার পর থেকে ইসলাম ধর্মকে নানা চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে পার হতে হয়েছে এবং আজও হতে হচ্ছে। ইসলাম ধর্ম যখন থেকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে (হযরত ওসমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই তা শুরু হয়ে যায়) তখন থেকেই ঐ ধর্মে ঢুকতে থাকে নানা প্রকারের সংকীর্ণতা, কুসংস্কার ও অন্ধ গোঁড়ামীর আবর্জনা। হজরত মোহাম্মদের ইসলামী আদর্শে পরিপুষ্ট মহত্তর জীবন বোধের মহিমান্বিত দিকগুলি ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দলের স্বার্থের কারণেই ধীরে ধীরে মুসলমান সমাজ থেকে বিলুপ্ত হতে থাকে। মুখ্যত মানবিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্মের মধ্যে স্তূপীকৃত কুসংস্কার ও স্বার্থবুদ্ধির সংকীর্ণ আবর্জনা ধীরে ধীরে পাহাড় প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমান রাষ্ট্রের মতোই এই উপমহাদেশীয় মুসলমানেরাও ঐ ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে নির্বিকার থাকেন। এই ঔদাসীন্যের কারণেই ইসলাম ধর্ম এখন বিশ্বরাজনীতির দূষিত প্ররোচণার বলয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে জটিল আবর্তের ঘোলাজলে ঘুরপাক খাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর প্রান্তিক পর্যায়ে এ সও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের কারণে বছরের পর বছর ধরে ভিন্ন ভিন্ন ছল ছুতায় এক মুসলমান রাষ্ট্র আর এক মুসলমান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বর্বরোচিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিজেদের শক্তিকে নিঃশেষিত করে চলেছে। এসব সংঘর্ষে ফায়দা লুঠছে পুঁজিবাদী অ-ইসলামী দেশগুলো। ইসলাম ধর্মকে সামনে রেখে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদেরকে কোন্ আদর্শ দিয়ে গেলেন আর মুসলমানরা ব্যক্তি, গোষ্ঠী তথা সামগ্রিকভাবে সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনীতিক জীবনে কোন্ আদর্শ অনুসরণ করছে? ইসলাম ধর্ম বিশ্বে আজও মাথা উঁচু করে টিকে আছে ঠিকই কিন্তু এই উপমহাদেশীয় মুসলমানরা যতটা ধর্মের আনুষ্ঠানিক ও কুসংস্কারের দিকগুলিকেই সাড়ম্বরে

ও সগৌরবে টিকিয়ে রেখেছে ততটা তার আদর্শগত দিকগুলিকে নয়। সেই কারণে ধর্ম এখন আমাদের জীবনে কেতাবী বুলি ছাড়া অন্য কোন ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে।

ইসলাম ধর্মের অন্ধ গোঁড়ামী উনিশ শতকের প্রথম পর্যায়ে এদেশে যে ভয়ংকর পরিণাম ডেকে এনেছিল তার কথা স্মরণ করতে গেলে ওহাবী আন্দোলনের প্রসঙ্গ কিছুটা এসেই যায় (যদিও নানা তর্ক-বিতর্ক সত্ত্বেও কোন কোন ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন যে ঐ আন্দোলনে মুসলমানদেরকে কেবল পশ্চাতের দিকে টেনেছে এটা সত্য নয়, এর মধ্য দিয়ে ভারতে কৃষকদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনাও লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ক্যান্টওয়েল স্মিথ, সুপ্রকাশ রায় প্রমুখ পণ্ডিতেরা মনে করেন প্রথমে ধর্মের ধ্বনির মধ্য দিয়ে এই আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু ক্রমশ ঐ আন্দোলন ভারতব্যাপী কৃষক বিদ্রোহে পরিণত হয়েছিল)। ওহাবী আন্দোলনের ইতিবাচক ঐ দিকের কথা স্মরণ করেও তার অন্ধ গোঁড়ামীর কথা এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে ওহাবীদের দারুণ এক কাট্টা মনোভাব মুসলমানদের জন্য খুবই ক্ষতিকর হয়েছিল। ইংরেজ শাসককে কাফের ও ইংরেজ শাসনকে শত্রুর শাসন হিসেবে আখ্যায়িত করে ওহাবীরা প্রবল রোষ ও উন্মাদনায় সদ্য প্রবর্তিত ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তার কথা স্মরণ করলে গোঁড়ামী কতটা গভীরে প্রোথিত হয়েছিল তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। জাতীয় পর্যায়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ইংরেজী শিক্ষাকে বর্জন করার সক্রিয় এই আন্দোলনকে তীব্র এক ধর্মান্দোলনে পরিণত করে তারা জেহাদী মনোভঙ্গীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর বিষাক্ত কুফল হিসেবে এই উপমহাদেশীয় মুসলমানদেরকে বহু বছর ধরে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের দিক থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক, অনেক পেছনে থাকতে হয়েছে। এক ধর্মান্ধ-সৈয়দ আহমদের অবিমৃষ্যকারিতা ও সমকালীন ঐতিহাসিক জীবনধারা সম্পর্কে বিরাট অজ্ঞতা দূর করার ব্যাপারে অনিবার্যভাবেই আর এক তমোঘ্ন-সৈয়দ আহম্মদের আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে পড়ে। উনিশ শো সাতচল্লিশের ভারত বিভাজনেরও মূল চালিকা শক্তি ছিলো মুসলমানদের ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি। জিন্নাহর দ্বি-জাতিতত্ত্ব ইসলাম ধর্মকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল। সুবিধাবাদী একটি শ্রেণী (মুখ্যত পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতালোভী শোষক-মুসলমান শ্রেণী) ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ধর্মের উন্মাদনা সৃষ্টি করে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করার সুযোগ নেয়—একটা অংশের নামকরণ হয় পাকিস্তান, অন্যটি ভারত। পাকিস্তান মূলত ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে উদ্ভূত একটি রাষ্ট্র হলেও সেখানে শ্রেণী স্বার্থের কারণে ক্রমান্বয়ে অ-ধর্মীয় কার্যকলাপ প্রাধান্য পেতে থাকে। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য প্রকট হওয়ার ফলে পাকিস্তানের মানুষ রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিশেষ করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের বঞ্চিত করে পশ্চিম পাকিস্তান সমৃদ্ধ হতে থাকার কারণে এতদ্দেশীয় মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। পর্যায়ক্রমে সেই আন্দোলন একাত্তরে গিয়ে বিশ্বকাঁপানো মুক্তিযুদ্ধের রূপ নেয়। ইসলাম ধর্ম পূর্ব পাকিস্তান

থেকে ভারতীয় হিন্দু শাসক গোষ্ঠীর সহায়তায় নিশ্চিহ্ন হতে যাচ্ছে এই জিগির তুলে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার জেহাদের ভঙ্গিতে নির্বিচারে নিরস্ত্র বাঙালীদের নিধন করার জন্য সোল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধর্মকে রক্ষা করার অছিলায় নয় মাসে তারা এদেশের প্রায় ত্রিশ লক্ষ নর-নারীকে ইতিহাসে নজিরবিহীন নৃশংসতায় হত্যা করে। নারকীয় এই হত্যাযজ্ঞের সময় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন প্যারিসে—পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের বীভৎস ঐ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে বিশ্ববিবেককে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জাগ্রত করার প্রচেষ্টায় তিনি রত ছিলেন সেখানে।

দুই

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র 'লাল সালু' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। উপন্যাসটি লেখা শুরু করেছিলেন ১৯৪৭ সালের কিছু আগে থেকে। তৎকালীন পাকিস্তানী রাজত্ব কায়েম হবার অব্যবহিত পূর্বে ঐ উপন্যাসটি লেখা আরম্ভ করলেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ লেখাটির কাজ সম্পূর্ণ করেন প্রধানত ধর্মের দাবীতে প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন পাকিস্তান আমলেই। পাকিস্তানের মতো ধর্মোন্মাদ একটি রাষ্ট্রের ভয়াবহ পরিণাম দেখার জন্য তাঁকে সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর সাল পর্যন্ত অর্থাৎ আরো দুইযুগ অপেক্ষা করতে হয়েছিলো ঠিকই কিন্তু ধর্ম পণ্যে পরিণত হলে কিংবা ধর্ম সচেতনভাবে কোনো রাষ্ট্রের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হলে সেই রাষ্ট্রের মূল কাণ্ড ও তার শাখা-প্রশাখাকে ধর্মীয় কুসংস্কার কতো সহজে আচ্ছন্ন করে ফেলে, গ্রাম-গ্রামান্তরের জনজীবনে তার প্রভাব কতো দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে, তা খুব গভীরভাবেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ধর্মীয় ভেক ধারণ করে বহিরাগত প্রতারক-মজিদের আকস্মিক আত্মপ্রকাশ, শিয়ালের নিরাপদ আশ্রয়স্থলকে লালসালু দ্বারা সুসজ্জিত করে কামেল-বুজর্গ মোদাচ্ছের নামক এক পীরের মাজার হিসেবে পরিচিত করার কূট কৌশল এবং মহব্বত নগর গ্রামের মানুষের অন্তর্লোকে মাজারকে কেন্দ্র করে আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপনের পরিকল্পিত প্রয়াস—এসবের সঙ্গে দূরাগত পশ্চিম পাকিস্তানী রাষ্ট্র-নায়কদের পূর্বাঞ্চলীয় অংশে ধর্মকে সামনে রেখে সুপরিকল্পিতভাবে যে শোষণ-শাসন অব্যাহত ছিলো তার সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। ধর্মের ধ্বজা সামনে রেখে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী দানবীয় শক্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের ঐশ্বর্য লুণ্ঠনে মত্ত হয়ে উঠেছিলো। মহব্বত নগরের মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি মানুষ, যে নিজেকে মজিদ নামে পরিচয় দিয়েছিলো, ধীরে ধীরে সেই লোকটি ঐ একই প্রক্রিয়ায় তথাকথিত ধর্মীয় আচার-আচরণের মাধ্যমে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও মাজারপূজারী মুসলমানদের ভয় ও বিস্ময় সৃষ্টি করে শোষণের সুনিপুণ ধারাটি বজায় রেখেছিলো।

মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে কেন্দ্র করে ধূর্ত-ধড়িবাজ মজিদ গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটি মানুষের কাছে আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতিভূ হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছিলো। গ্রামবাসীর মান-মর্যাদা, সুখ-দুঃখ, আলাপ-আলোচানা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, এক কথায় তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সব কিছুই মজিদের মর্জির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতো। মজিদই ছিলো গ্রামের মানুষের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের যথেচ্ছাচারী ডিক্টেটরদের মতোই ছিলো মজিদের কার্যকলাপের ভংগি। চরিত্রটির নিপট-অন্তঃসারশূণ্যতার দিকগুলি উপস্থাপন করতে গিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কেন খুবই সূক্ষ্মভাবে প্রচুর শ্লেষ ও বক্রোক্তি ব্যবহার করেছেন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

তিন

অবশ্য উন্যাসটির ঐ নিগূঢ় অর্থ উদ্ঘাটন না করেও চিরায়ত বাংলার গ্রামীণ মুসলমান সমাজের যে চিত্র সেখানে পাওয়া যায় তার মূল্যও অপরিসীম এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকেও উপন্যাসটি পাঠকের মনে স্থায়ী আসন করে নেয়। কারণ ঐ উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র আমাদের চির চেনা—আবহমান কাল থেকে চলে আসছে চিরায়ত বাংলার গ্রামীণ জীবনের ঐ ধারা। মজিদের মতো একজন ধর্মব্যবসায়ী যে শুধু মাজার ব্যবসা করেই অঢেল চিত্তের অধিকারী হয়—এমন লোককে আমরা মহব্বত নগর গ্রামের মতো বাংলাদেশের অন্য যে কোনো গ্রামেই দেখি। তাদের দেখতে পায় বাংলার গ্রামে, গঞ্জে, শহরে-নগরে সর্বত্রই। রাজধানী ঢাকা মহানগরীতে আজও অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীর দোর গোড়ায় এসেও লাল সালুতে আচ্ছাদিত শত শত মাজারকে দর্পিত ভংগিতে তাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করতে দেখা যায়। গ্রামে-গঞ্জে ধর্ম ব্যবসায়ীদের মাজার-ব্যবসা আরও জমজমাট–ভক্তদের সংখ্যা সেখানে যেমন বিপুল তেমনি তারা মাজারের নামে শহরের তুলনায় অধিক সম্মোহিত, পুণ্য লোভে অধিক ক্রন্দনাকুল।

এর কারণ গ্রামের মানুষ অশিক্ষিত। অশিক্ষিত বলেই ধর্মীয় কুসংস্কারকেও তারা অন্ধের মতো বিশ্বাস করে। তাদের মনে শিক্ষার আলো নেই বলেই তারা কোনো কিছুকে যুক্তির দ্বারা যাচাই করতে সাহস পায় না। মহব্বত নগর তেমনি একটি গ্রাম, সেখানকার প্রায় সব মানুষই অক্ষরজ্ঞানহীন। মক্তব-মাদ্রাসা আছে—সেখানে শুধু ছেলে-মেয়েদের আমপারা মুখস্ত করানোর ব্যবস্থা আছে—ইংরেজী বা অন্য কোনো উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। সেখানে, শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি । আক্কাসের ইংরেজী শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপের ব্যাপারটিকে নিয়ে মজিদ কিভাবে বহুলোকের সামনে হাসি-তামাসা করেছে, ব্যঙ্গবিদ্রূপে আক্কাসকে কিভাবে জর্জরিত করেছে তা আমরা দেখেছি। এক পর্যায়ে আক্কাসের উদ্যোগকে মজিদ বলেছে, 'পোলামাইনষের মাথায় একটা বদ

খেয়াল ঢুকেছে'। শেষ পর্যন্ত মোদাব্বের মিয়ার পুত্র আক্কাসের প্রস্তাবের স্থলে গ্রামবাসী মজিদের পাকা মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাবকেই সানন্দে স্বাগত জানায় এবং অতঃপর আক্কাসকে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনে ব্যর্থ হয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হয়। আগে এই গ্রামের কৃষকরা ধান কাটার সময় গান গাইত, মেয়েরা ধান ভাংগার সময় কিংবা অন্যান্য উৎসবে গীত গাইত—মজিদের কড়া হুকুমে এখন দোয়া-দরুদ পড়া ছাড়া অন্য কিছু করার উপায় নেই। এই হচ্ছে মহব্বত নগর গ্রামের পরিবেশ।

মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামীণ সমাজের কর্তৃত্ব থাকে দুধরনের লোকের হাতে—এক, ভূমির মালিক অর্থাৎ জোতদারদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী তাঁর হাতে। দুই, ঐশী ক্ষমতার যিনি ধারক-বাহক অর্থাৎ মৌলবী-মৌল্যানা-পীরের হাতে। বলাই বাহুল্য এটা সামন্ত সমাজেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। খালেক ব্যাপারী তার অনেক জোত-জমির কারণে গ্রামের মাথা হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছিলো কিন্তু সহসা অজানা-অচেনা স্থান থেকে মোদাচ্ছের পীরের দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ঐশী ক্ষমতার অধিকারী রূপে মহব্বত নগর নামক গ্রামের রঙ্গমঞ্চে মজিদের আবির্ভাবের পরেই মজিদই হয়ে ওঠে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার দণ্ড-মুণ্ডের একমাত্র হর্তা-কর্তা-বিধাতা। খালেক ব্যাপারীর জমি-জমা প্রচুর থাকলেও তার মধ্যে মজিদের মতো ঐশী ক্ষমতা ছিলো না। দুর্জ্ঞেয় রহস্যে ভরা মাজারকে কেন্দ্র করে মজিদ যে অলৌকিক শক্তি মহব্বত নগর গ্রামের মানুষের কাছে জাহির করেছিলো তাতে কোনো প্রশ্ন না তুলেই (একমাত্র জমিলার বিদ্রোহ ছাড়া) সবই দারুণ ভয় ও বিস্ময়ের সঙ্গে মাথা নত করে তাকে আল্লাহ্ ও মোদাচ্ছের পীরের বিশ্বস্ত এবং একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নিয়েছিলো। মজিদের এই অপ্রতিহত ক্ষমতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো শক্তি ও সাহস খালেক ব্যাপারীর ছিলো না বলেই সেও গ্রামের আর দশজনের মতোই তাকে সবার উঁচুতে স্থান দিতে বাধ্য হয়েছিলো। অবশ্য এ কারণে দুজনের মধ্যে শ্রেণীগত বা ব্যক্তিগতভাবে কোনো দ্বন্দ্ব কিংবা কলহ আদৌ সৃষ্টি হয় নি। শ্রেণীগত স্বার্থের কারণেই উভয়ে উভয়কে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলো। খালেক ব্যাপারী তার স্ত্রীর পেটের বেড়ী খোলার জন্য মজিদের দ্বারস্থ হওয়ায় তাতে মজিদের মাজার-ব্যবসা আরো প্রসারিত হয়েছিলো। খালেক ব্যাপারীকে মজিদ তার নিজস্ব বলয়ের মধ্যে টেনে আনার জন্য যেসব কৌশল অবলম্বন করেছিলো, তার সবগুলিতেই সে সফল হয়েছিলো। মজিদের কূট কৌশল বোঝার মতো বোধ শক্তি খালেক ব্যাপারীর ছিলো না।

'লাল সালু' উপন্যাসে মহব্বত নগর গ্রামকে কেন্দ্র করে, বিশেষ করে মজিদের জীবনকে কেন্দ্র করে প্রধানভাবে যে কয়টি চরিত্র আবর্তিত হয়েছে তাদের মধ্যে রহীমা, তাহেরের বাপ. হাসুনির মা, আমেনা বিবি, জমিলা, আক্কাস প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। প্রথমা স্ত্রী হিসেবে যে মেয়েটি মজিদের ঘরে এলো তার নাম রহীমা। রহীমার পরিচয় ঔপন্যাসিক দিয়েছেন এভাবে ঃ 'অনেক দিন থেকে আলি-ঝালি একটি চওড়া বেওয়া মেয়েকে দেখেছিলো (মজিদ)। শেষে সে মেয়ে লোকটিই বিবি হয়ে তার

ঘরে এলো। নাম তার রহীমা। সত্যি সে লম্বা-চওড়া মানুষ। হাড় চওড়া মাংসল দেহ। শীঘ্র দেখা গেলো, তার শক্তিও কম নয়। বড় বড় হাঁড়ি সে অনায়াসে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তুলে নিয়ে যায়, গোঁয়ার ধামড়া গাইকেও স্বচ্ছন্দে গোয়াল থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসে। হাঁটে যখন, মাটিতে আওয়াজ হয়, কথা কয় যখন, মাঠ থেকে শোনা যায় গলা। তবে তার শক্তি, তার চওড়া দেহ তা বাইরের খোলসমাত্র। আসলে সে ঠাণ্ডা, ভীতু মানুষ, দশ কথায় রা নেই। রক্তের রাগ নেই। মজিদের প্রতি তার সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভয়। শীঘ্র মানুষটির পেছনে মাছের পিঠের মত মাজারটির বৃহৎ ছায়া দেখে।" রহীমা গ্রাম-বাংলার মুসলমান সমাজ জীবনে সচরাচর দৃশ্যমান একটি নারী চরিত্র। তার সমগ্র সত্তার মধ্যে নিম্ন পর্যায়ের গ্রামের সহিষ্ণু ও মমতাময়ী নারী চরিত্রের শাশ্বত রূপ লক্ষ্য করা যায়। ধর্মে তার বিশ্বাস আছে, তার চেয়ে বেশী বিশ্বাস আছে ধর্মের কুসংস্কারের উপর। কোন্‌টা ধর্ম, আর কোন্‌টা ধর্মের নামে কুসংস্কার তার পার্থক্য নির্ণয় করতে সে জানে না। মাজারের সঙ্গে মজিদের অস্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলেই মজিদের প্রতি তারও শ্রদ্ধার কোনো শেষ নেই। এই চরিত্রটির পদচারণা 'লাল সালু' উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসের সবগুলি নারী চরিত্রের আর্জি, আকুতি ও আহাজারি মজিদের কাছে সঠিকভাবে পৌছে দেবার দায়-দায়িত্ব খুব চমৎকারভাবে রহীমা পালন করেছে। বিশেষ করে নিজে নিঃসন্তান হওয়ার কারণে সন্তানহীনা নারীদের জন্য তার যে সহানুভূতি ও মাজারে শায়িত পীরের (রহীমার দৃঢ় বিশ্বাস মোদাচ্ছের নামক এক শক্তিমান পীর ঐ কবরের নীচে শুয়ে আছেন) দরবারে তাদের সবার জন্য দোওয়া চাওয়ার মধ্যে যে আন্তরিকতা লক্ষ্য করা যায় তাতে এই চরিত্রের মহত্ব অনস্বীকার্য। শান্ত-শীতল রহীমা, যে রহীমা মজিদকে খোদার খাস বান্দা ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে তাকে অন্ধের মতো ভক্তি করে, মজিদের কোনো কথার বিরুদ্ধে যে কোনোদিন একটি কথাও উচ্চারণ করেনি—সেই রহীমাও উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে গিয়ে জমিলার প্রতি মজিদের নিষ্ঠুর আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে থাকতে পারেনি। দয়া, মায়া, করুণা এবং এক ঝলক কাঠিন্যে সমৃদ্ধ এই চরিত্রটিকে অঙ্কন করতে গিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছেন।

বন্ধ্যত্ব যে-কোনো নারীর জীবনে দুর্মোচ্য ও মর্মন্তুদ এক সমস্যা। এ সমস্যার কারণে বিশাল বৈভবের অধিকারিণী নারীর জীবনও অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। অন্তর্দাহী যন্ত্রণায় বন্ধ্যা নারী সারাজীবন ছটফট করে। এ সমস্যা চিরন্তন। গ্রাম-বাংলার মেয়েরা এর বৈজ্ঞানিক কারণ সম্পর্কে অজ্ঞ বলেই খুব সহজেই যে কোনো মানুষের প্ররোচণায় তারা ছুটে যায় পীর-ফকিরের আখড়ায় কিংবা লাল সালু দ্বারা আচ্ছাদিত মাজারে। পীরের খাদেম টাকা-পয়সার বিনিময়ে তাদেরকে দেয় পড়া-পানি, তাবিজ, মাদুলি অথবা পেটের বেড়ী খোলার নির্দেশ। খালেক ব্যাপারীর প্রথমা স্ত্রী আমেনা বিবির (যে এগারোটি বছর ধরে সন্তান কামনায় ব্যাকুল) পেটের বেড়ী খোলার যে-নাতিদীর্ঘ অনুষ্ঠানটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

'লাল সালু' উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন তা গ্রাম-বাংলার বন্ধ্যা নারী সমাজের এক অরুন্তুদ চিত্র। অসাধারণ কলাকুশলতায় ঔপন্যাসিক এই অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করেছেন।

আওয়ালপুরে এক বুজর্গ পীরের আগমনে আমেনা বিবির দেহ-মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। তার দৃঢ় বিশ্বাস আওয়ালপুরে আগত ঐ পীরের পড়া-পানি খেলে তার সন্তান হবে। কিন্তু মজিদ এর মধ্যে ঐ পীরকে সশরীরে গিয়ে অপমান করে এসেছে এবং নিজের কর্তৃত্ব ও জনপ্রিয়তা খর্ব হবার আশংকায় সে মহব্বত নগর গ্রামের মানুষ যাতে কোনোদিন আওয়ালপুরে আগত ঐ পীরের কাছে না যায় তার জন্য কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছে। এতৎসত্ত্বেও আমেনা বিবির সনির্বন্ধ অনুরোধে খালেক ব্যাপারী অত্যন্ত সংগোপনে শ্যালক ধলা মিয়াকে পড়া-পানি আনার জন্য আওয়ালপুরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু ঘটনাচক্রে ধলা মিয়া আওয়ালপুরে না গিয়ে মজিদের কাছে পড়া-পানি আনতে যায় এবং পুরো ব্যাপারটি ফাঁস হয়ে যাবার পর মজিদের সমস্ত ক্রোধ গিয়ে পড়ে আমেনা বিবিরি উপর। মজিদের অলৌকিক শক্তির উপর আমেনা বিবির আস্থাহীনতা সমগ্র গ্রামের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এই আশংকায় সে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আজ পর্যন্ত মহব্বত নগর গ্রামের কোনো মানুষই তার পড়া-পানির উপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আমেনা বিবির এতদূর স্পর্দ্ধা যে সে মজিদের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে এবং আওয়ালপুরে আগত পীরের দ্বারস্থ হয়? প্রতিশোধ নেবার জন্য মজিদ ফন্দি আঁটে। খালেক ব্যাপারী সেই ফাঁদে পা দেয় এবং মজিদের প্রস্তাব অনুযায়ী সন্তান লাভের প্রত্যাশায় আমেনা বিবির পেটের বেড়ী খোলার জন্য তাকে মাজারে আনতে সম্মত হয়। মাজারে সাত পাক দেবার ব্যবস্থা হয়। আমেনা বিবি দেখতে সুন্দর। মাজারের চার পাশে পাক দেবার সময় মজিদ বিভিন্ন কোণ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কামার্ত-দৃষ্টিতে আমেনা বিবির সৌন্দর্য লেহন করতে থাকে। সাত পাক শেষ হবার আগেই আমেনা বিবি মূর্ছিত হয়ে পড়ে। মজিদের নির্দেশে রোজা থাকার কারণে শরীর দুর্বল ছিলো এবং সেই কারণেই সে মূর্ছিত হয়। মজিদ খালেক ব্যাপারীকে জানালো আমেনা বিবির চরিত্রে দোষ আছে, তার আত্মা অপবিত্র। সেই কারণে সে আল্লাহর পাক কালাম সহ্য করতে পারেনি। অতএব এমন মেয়েকে তালাক দেওয়াই সমীচীন। খালেক ব্যাপারী আমেনা বিবিকে তেমন ভালোবাসতো না ঠিকই কিন্তু মজিদের এই প্রস্তাবে সে হতভম্ব না হয়ে পারেনি। তবুও মজিদ যখন কাউকে কোনো কিছু করতে বলে তখন গ্রামবাসী বুঝে নেয় তার পেছনে আল্লাহর নিগূঢ় ইচ্ছা কাজ করছে এবং সেই কারণে তা সবাইকেই মানতে হয়। মজিদ বলেছে মানুষ পারেনা এমন কোনো কাজ নেই—আমেনা বিবির চরিত্র স্খলনের ব্যাপারে আপাত দৃষ্টিতে কোনো প্রত্যয়-গ্রাহ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু তাই বলে সে অসতী হতে পারে না একথা ঠিক নয়। আমেনা বিবি সতী হলে সাত পাকের ধকল সইতে পারতো। আল্লার কালাম কখনো ঝুট হয় না— মজিদের মতে এইটিই সবচেয়ে বড়ো কারণ, সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। এগারো বছর একত্রে যার সঙ্গে ঘর করছে, তাকে তালাক

দিতে খালেক ব্যাপারীর খারাপ লাগারই কথা। ব্যাপারীর তনু-মন বর্তমানে অল্প বয়স্কা তানু বিবির উপর সমর্পিত হলেও সে মজিদের মাধ্যমে প্রাপ্য ঐশী আদেশে আমেনা বিবিকে তালাক দিতে গিয়ে কিছুটা মনোকষ্ট পেয়েছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটিকে সহজভাবেই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। পুরো ঘটনার উপস্থাপন ও বর্ণনকুশলতার মধ্যে এক ধরনের নির্লিপ্ততা কাজ করছে। বিষয়টির ফলাফল শেষ পর্যন্ত খালেক ব্যাপারীর কাছে তেমন গুরুতর না হলেও আমেনা বিবির কাছে এটি ছিল একটি মর্মচ্ছেদী ঘটনা। কিন্তু লেখক এরকম অরুন্তুদ-ঘটনার চিত্রায়নে কোথাও উচ্ছ্বাস কিংবা বুকফাটা আর্তনাদের শব্দ শোনান নি। এমন ঘটনা গ্রাম-বাংলার জোতদার, মৌলবী কিংবা নিম্ন পর্যায়ের সমাজ জীবনে হর হামেশাই ঘটে থাকে। সুতরাং এ নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে শোক প্রকাশের ব্যাপারটা লেখকের কাছে অবান্তর মনে হয়েছে। অবান্তর মনে হয়েছে শৈল্পিক কারণেও। এই কৌশলটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সম্ভবত সমকালীন প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে অর্জন করেছিলেন। চরিত্র–নির্ভর এই উপন্যাসে সব ক'টি মানুষের চরিত্রাঙ্কন করতে গিয়ে নির্লিপ্ততার এই গুণটি যথেষ্ট মুন্সিয়ানার সঙ্গে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। প্রসংগত উল্লেখ্য যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর গল্প ও অন্যান্য উপন্যাসেও চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে নির্লিপ্ত থাকার এই ভঙ্গিটি দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন। হাসুনির মা, তার বৃদ্ধ পিতা ও বৃদ্ধ মাতাকে নিয়ে যে উপাখ্যানটি রচিত হয়েছে সেখানেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আগাগোড়া মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। হাসুনির মায়ের বৃদ্ধ বাবা অর্থাৎ গ্রামে তাহেরের বাবা নামে পরিচিত বৃদ্ধ লোকটির আকস্মিক অন্তর্ধান এবং পুরো ঘটনার সঙ্গে, বিশেষ করে গ্রামের জনসমাবেশে তাকে নিয়ে যে বিচার অনুষ্ঠিত হয় তা ভণ্ড মজিদের কুটিল চক্রান্তের প্রাহসনিক-ইতিবৃত্ত ছাড়া কিছু নয়। এতে মাতব্বর ও মৌলবী-শাসিত গ্রাম সমাজের চমৎকার একটি চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। তাহেরের মা কোনো একদিন বৃদ্ধের উপর রাগের বশবর্তী হয়ে হয়তো বলেছিলো তার গর্ভস্থ সন্তানেরা বৃদ্ধের ঔরসজাত নয় এবং এই সংবাদটি কথায় কথায় হাসুনির মা মজিদের কাছে একদিন প্রকাশ করায় বৃদ্ধ তার মেয়েকে প্রহার করেছিলো। প্রহৃত হাসুনির মা মজিদের কাছে এর জন্য বিচার প্রার্থনা করে। এহেন অভিযোগের কারণেই মজিদ ও খালেক ব্যাপারী গ্রামে বিচার সভার আয়োজন করে। সর্ব সমক্ষে এ সম্পর্কে অর্থাৎ বৃদ্ধের সন্তানেরা তার ঔরসজাত কিনা তা জানতে চাওয়া হয় কিন্তু তাহেরের বাবা এ রকম একটি ব্যক্তিগত ও নাজুক প্রশ্নে হতভম্ব হয়ে যায়। কড়া ভাষায় সে বিরক্তি প্রকাশ করে। কিন্তু ঐ প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। এমতাবস্থায় মজিদ তার স্বভাবসুলভ-কারুকার্যখচিত-কণ্ঠস্বরে বিবি আয়েশার উদাহরণ টেনে এনে ঐ কদর্য সংশয়ের নিষ্পত্তি করে দেয়। মজিদ বৃদ্ধকে তার মেয়ের কাছে মাপ চাওয়ার আদেশ দিলে বৃদ্ধ বাড়ি গিয়ে তার কৃতকর্মের জন্য মেয়ের কাছে মাপ চায়। তারপর মানসিক দ্বন্দ্বে দারুণভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে এক পর্যায়ে বৃদ্ধটি লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। এই চরিত্রটির মধ্যে এক

ধরনের ঋজুভঙ্গি ছিলো—মজিদ কিংবা ব্যাপারীকে সে গ্রাহ্য করতো না। কিন্তু ভরা মজলিসে মজিদ যে কৌশলে তাকে ঘায়েল করলো তা সহ্য করা বৃদ্ধের পক্ষে কঠিন হয়েছিলো। দারুণ অপমানের গ্লানি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই লোকটি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলো। বিচার পর্বের পুরো দৃশ্যের সূচনা ও পরিসমাপ্তির মধ্যে গ্রাম্য মাতব্বর কিংবা মৌলবীদের বিচারের নামে প্রহসনের ভঙ্গিটি ঔপন্যাসিক অভূতপূর্ব কলাকুশলতায় উপস্থাপন করেছেন।

চার

মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে কেন্দ্র করে মজিদ ঘরে বাইরে তার নিজস্ব ঐশী ক্ষমতার যে সব কাহিনী তৈরী করেছিলো তাতে বলা চলে মহব্বত নগর গ্রামের তেমন কোনো লোকই ছিলো না যে তার শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়। এককালে যে গ্রামে কৃষক ও কিষাণীদের কণ্ঠ থেকে হাসি ও গান শোনা যেত, আজ মজিদের নসিহতের কৃপায় সেইসব কণ্ঠ থেকে দোয়া-দরুদ-কলমা ছাড়া অন্য কিছু শোনা যায় না। গ্রামের মোটামুটি সবাইকেই মজিদ নামাজ পড়তে বাধ্য করেছে। মজিদের ঐ রাজত্বে তার হুকুমের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস কারোরই ছিলো না। কিন্তু একজন তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। সে হচ্ছে জমিলা। কংসকে ধ্বংস করার জন্য গোকুলে যেমন শ্রীকৃষ্ণ বড়ো হয়ে এক পর্যায়ে কংসকে হত্যা করেন, ঠিক তেমনিভাবে কৃষ্ণরূপী জমিলা মজিদেরই ঘরে তার স্ত্রী হিসেবে এসে মজিদের নিজের হাতে গড়া রাজত্বে ত্রাস সৃষ্টি করে। মজিদকে যেন সে কেয়ামতের মুখোমুখি দাঁড় করলো। সবুজ লতার মতো কিশোরী গ্রাম্য মেয়ে জমিলা। কিশোরীর চপলতা তার সর্ব অঙ্গে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সে যখন হাসে তখন আর সহজে থামে না। হাসতে হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। লেখকের ভাষায় 'জীবন্ত সে হাসি, ঝরণার অনাবিল গতির মত ছন্দময় সমাপ্তিহীন ধারা।' গ্রাম সমাজে এমনি কচি মেয়ের সঙ্গে মজিদের মতো দাড়িয়াল, বর্ষীয়ান ও ধর্মোন্মাদ লোকের বিয়ের ব্যাপারটা অস্বাভাবিক বা অবাস্তব কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ অত্যন্ত স্বল্প পরিসরের মধ্যে এই চরিত্রটির বিকাশ যেভাবে ঘটিয়েছেন তা অনন্যসাধারণ নিঃসন্দেহে। স্বল্প সময়ের পদচারণার মধ্য দিয়েও এই চরিত্রের গাঁথুনিটিকে লেখক এমনভাবে মজবুত করে দিয়েছেন যে বাঙ্গালী পাঠকের কাছে সে চিরস্মরণীয় হয়েই রয়ে গেল। মজিদ তার যৌনক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্যই প্রথমা স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বেও কচি মেয়ে জমিলাকে পছন্দ করেছিলো। তার ধারণা ছিলো জমিলাকে সে নিজের জীবনের ভাবধারার ছাঁচে গড়ে তুলবে। কিন্তু ঐ কচি মেয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই মজিদের ধারণা বদলে দেয়। তার মনে হয় ঃ "মেয়েটি যেন কেমন? তার মনের হদিশ পাওয়া যায় না। কখন তাতে মেঘ আসে কখন উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করে,–পূর্বাহ্নে তার ইঙ্গিত পাওয়া দুষ্কর"। আর এক পর্যায়ে মজিদ ভাবে ঃ "নেশার লোভে কাকে সে ঘরে আনলো? যার রুচি কোমল লতার মতো

হাল্কা দেহ দেখে, এক ফালি চাঁদের মত ছোট মুখ দেখে তার এত ভালো লেগেছিলো–তার এ কী পরিচয় পাচ্ছে ধীরে ধীরে"? মজিদের ক্রোধ ক্রমে ক্রমে যেন আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে তপ্ত লাভার মত সঞ্চিত হতে থাকে।

ওদিকে জমিলা মজিদের মাজার-কেন্দ্রিক-জীবনের সমস্ত আয়োজনকে দারুণ সংশয় ও অশ্রদ্ধার চোখে দেখতে থাকে। সে তার প্রাণ ধর্মের স্বতঃফূর্ত তাগিদেই মাজারের পেছনের ফাঁকিটুকু সহজেই আবিষ্কার করে, কিন্তু পরিমন্ডলের প্রভাবের কারণেই সে ঐ ব্যাপারে মুখ খুলতে সাহস পায় না। মজিদ যে ভণ্ড সেটাও বুঝতে পারে—সেই কারণে জমিলা মজিদকে মোটেই সহ্য করতে পারে না। মজিদের অষ্টপ্রহর তাগাদার কারণেই জমিলা নামাজ পড়ে ঠিকই কিন্তু তাতেও তার মন পুরোপুরিভাবে বসে না। তাই নামাজের সেজদায় গিয়ে সে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে। মজিদ ভাবে এ সমস্ত তার ও মোদাচ্ছের পীরের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের কৌশলমাত্র। জিকিরের রাতে জমিলা অসংখ্য মুসল্লীর অদ্ভুত কায়দায় ভয়াবহ-সমবেত-গর্জন সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ কাউকে কিছু না বলেই এবং মাথায় ঘোমটা না দিয়ে বাইরে চলে যায়। এ দৃশ্য সহসা মজিদের চোখে পড়ে এবং এতে সে দারুণভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। শাস্তি হিসেবে সে জমিলাকে তারাবির নামাজ পড়তে বলে। কিন্তু নামাজ পড়তে পড়তে এক সময় জমিলা জায়নামাজের উপর ঘুমিয়ে পড়লে মজিদ ক্রোধে ফেটে পড়ে। এক হ্যাঁচকা টান মেরে সে ঘুমন্ত জমিলাকে প্রথমে বসতে বাধ্য করে এবং দ্বিতীয় হ্যাঁচকা টানে তাকে দাঁড়াতে বাধ্য করে। তারপর জমিলার কচি হাতের কব্জিকে শক্ত করে ধরে মজিদ তাকে মাজারের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। অসহ্য ব্যথা, পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও দারুণ বীতশ্রদ্ধা জমিলাকে মুহূর্তের মধ্যে ক্রোধোন্মাও করে তোলে এবং সে অতিতর–আকস্মিকতায় মজিদের মুখমন্ডলের উপর থুতু ছিটিয়ে দেয়। জমিলার এই আচরণকে মজিদের কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো মনে হয়— সে তার সম্মুখে কেয়ামতের দৃশ্য দেখতে থাকে। মহব্বত নগর রাজ্যের উপর মজিদের নিরঙ্কুশ একাধিপত্যের বিরুদ্ধে এ হচ্ছে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এক ঘটনা। জমিলার এই প্রতিবাদী ভঙ্গিতে মজিদ দারুণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে। মজিদ জমিলাকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে তাকে অন্ধকার মাজার ঘরের সঙ্গে সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। প্রবল বর্ষণ ও বিদ্যুৎ চমকের মধ্য দিয়ে রাত্রি অতিবাহিত হবার পর মজিদ ভোর বেলায় জমিলার অবস্থা দেখার জন্য মাজার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। তারপর লেখকের বর্ণনা ঃ "ঝাপটা খুলে মজিদ দেখলো লাল কাপড়ে আবৃত কবরের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে জমিলা, আর মেহেদী দেয়া তার একটা পা কবরের গায়ের সংগে লেগে আছে"। একি অচেতন হবার পূর্ব মুহূর্তে কল্পিত মোদাচ্ছের পীরের প্রতি জমিলার অশ্রদ্ধা প্রদর্শনেরই সচেতন প্রয়াস? হয় তো তাই। মজিদের ভয়ঙ্কর ক্রোধ দেখে তাই-ই মনে হয়। কারণ ঐ দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে মজিদের মনে হলো–"মুহূর্তের মধ্যে কেয়ামত হবে। মুহূর্তের

মধ্যে মজিদের ভেতরে কী যেন উলটপালট হয়ে যাবার উপক্রম করে–কিন্তু শেষ পর্যন্ত টান খেয়ে সে সামলে নেয় নিজেকে"।

হাঁ, চরম উত্তেজিত মুহূর্তেও মজিদ নিজেকে আশ্চর্যভাবে সামলে নিতে জানে। সব রকমের উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে সংযত রাখার কৌশলটি মজিদ সুনিপুণভাবে আয়ত্ত করেছিলো। যে অবস্থায় একজন মানুষ অন্যের জীবন সংহারেও পিছপা হয়না মজিদ সেই রকম পরিস্থিতিতেও ঠান্ডা মাথায় নিজের দুরভিসন্ধি অনুযায়ী কাজ করে চলে। সে ক্রুদ্ধ হয়, বিচলিত হয় কিন্তু তা তাৎক্ষণিকভাবে, পরমুহূর্তেই সে তার ক্রোধকে শীতল করে ফেলে। এ-শীতলতা তার বহিরাবরণ মাত্র, ভেতরে ভেতরে ক্রোধের আগুনকে সে ঠিকই জ্বালিয়ে রাখে। মহব্বত নগর গ্রামের মানুষ তার সে আগুন সব সময় আঁচ করতে পারে না।

হাসুনির বাবা যখন ভরা মজলিসে মজিদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে কথা বলা শুরু করে তখন মজিদ তার সঙ্গে সংযত ভঙ্গিতে কথা বলে, আক্কাসের ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের উদগ্র ইচ্ছাকে কূট কৌশলে বানচাল করার সময়ও সে মাথা ঠাণ্ডা রাখে। জমিলা তার জীবনে এক ঝঞ্ঝা কিংবা বলা যায় ভয়াবহ এক বিভীষিকার রূপ ধরে এসেছে জেনেও মজিদ তাকে শায়েস্তা করার ব্যাপারে যতগুলি ব্যবস্থা নিয়েছে তাতে সংযত ভাব ও সতর্ক বুদ্ধির পরিচয়ই বেশী পাওয়া যায়। জমিলা যখন মজিদের মুখের উপর থুতু ছিটিয়ে দিলো তখন সে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে জমিলাকে দারুণভাবে প্রহার করতে পারতো কিংবা গলাটিপে বা অন্য কোনো উপায়ে হত্যা করতে পারতো। তার মতো ক্ষমতাধর পুরুষের পক্ষে ঐ ধরনের অপরাধকে অপরাধই বলা যায় না। কারণ মজিদ নিজেও তার ক্ষমতা সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন ছিলো। সে মনে করতো–"এই দুনিয়ার মানুষেরা যেমন আমারে ভয় করে, শ্রদ্ধা করে—তেমনি ভয়ও করে, শ্রদ্ধা করে, অন্য দুনিয়ার জীন-পরীরা।" সুতরাং এহেন ক্ষমতার অধিকারী কোন ব্যক্তি জমিলার মতো দু-চারটা মেয়েকে রাগের বশে হত্যা করলে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এমন মানুষ মহব্বত নগর গ্রামে কোথায়? কিন্তু তৎসত্ত্বেও মজিদ ঐ রকম ভয়ঙ্কর ক্রোধের মুহূর্তে ঠান্ডা মাথায় সতর্কতার সঙ্গে কাজ করেছে। চকচকে এই সতর্কবুদ্ধি ও সংযত আচরণ মজিদ চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পাঁচ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনী ও অন্যান্য সাহিত্যকর্ম মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে তিনি বিভিন্ন ঘটনাধারার মধ্য দিয়ে ধর্মের প্রসঙ্গ বার বার টেনে এনেছেন। কোথাও কোথাও ধর্মের মাধ্যমেই মূল ঘটনাকে বিচার করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করতেন সাধারণভাবে মুসলমানরা ধর্ম ছাড়া কথা বলে না, ধর্মে কোনটা সিদ্ধ, কোনটা নিষিদ্ধ তা না জেনে কোনো কিছু মানতে চায় না, কিন্তু তাদের ধর্ম ও কর্মের মধ্যে প্রচুর

CamScanner

হাল্কা দেহ দেখে, এক ফালি চাঁদের মত ছোট মুখ দেখে তার এত ভালো লেগেছিলো–তার এ কী পরিচয় পাচ্ছে ধীরে ধীরে''? মজিদের ক্রোধ ক্রমে ক্রমে যেন আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে তপ্ত লাভার মত সঞ্চিত হতে থাকে।

ওদিকে জমিলা মজিদের মাজার-কেন্দ্রিক-জীবনের সমস্ত আয়োজনকে দারুণ সংশয় ও অশ্রদ্ধার চোখে দেখতে থাকে। সে তার প্রাণ ধর্মের স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদেই মাজারের পেছনের ফাঁকিটুকু সহজেই আবিষ্কার করে, কিন্তু পরিমন্ডলের প্রভাবের কারণেই সে ঐ ব্যাপারে মুখ খুলতে সাহস পায় না। মজিদ যে ভণ্ড সেটাও বুঝতে পারে—সেই কারণে জমিলা মজিদকে মোটেই সহ্য করতে পারে না। মজিদের অষ্টপ্রহর তাগাদার কারণেই জমিলা নামাজ পড়ে ঠিকই কিন্তু তাতেও তার মন পুরোপুরিভাবে বসে না। তাই নামাজের সেজদায় গিয়ে সে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে। মজিদ ভাবে এ সমস্ত তার ও মোদাচ্ছের পীরের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের কৌশলমাত্র। জিকিরের রাতে জমিলা অসংখ্য মুসল্লীর অদ্ভুত কায়দায় ভয়াবহ-সমবেত-গর্জন সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ কাউকে কিছু না বলেই এবং মাথায় ঘোমটা না দিয়ে বাইরে চলে যায়। এ দৃশ্য সহসা মজিদের চোখে পড়ে এবং এতে সে দারুণভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। শাস্তি হিসেবে সে জমিলাকে তারাবির নামাজ পড়তে বলে। কিন্তু নামাজ পড়তে পড়তে এক সময় জমিলা জায়নামাজের উপর ঘুমিয়ে পড়লে মজিদ ক্রোধে ফেটে পড়ে। এক হ্যাঁচকা টান মেরে সে ঘুমন্ত জমিলাকে প্রথমে বসতে বাধ্য করে এবং দ্বিতীয় হ্যাঁচকা টানে তাকে দাঁড়াতে বাধ্য করে। তারপর জমিলার কচি হাতের কব্জিকে শক্ত করে ধরে মজিদ তাকে মাজারের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। অসহ্য ব্যথা, পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও দারুণ বীতশ্রদ্ধা জমিলাকে মুহূর্তের মধ্যে ক্রোধোন্মত্ত করে তোলে এবং সে অতিতর–আকস্মিকতায় মজিদের মুখমন্ডলের উপর থুতু ছিটিয়ে দেয়। জমিলার এই আচরণকে মজিদের কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো মনে হয়— সে তার সম্মুখে কেয়ামতের দৃশ্য দেখতে থাকে। মহব্বত নগর রাজ্যের উপর মজিদের নিরঙ্কুশ একাধিপত্যের বিরুদ্ধে এ হচ্ছে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এক ঘটনা। জমিলার এই প্রতিবাদী ভঙ্গিতে মজিদ দারুণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে। মজিদ জমিলাকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে তাকে অন্ধকার মাজার ঘরের সঙ্গে সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। প্রবল বর্ষণ ও বিদ্যুৎ চমকের মধ্য দিয়ে রাত্রি অতিবাহিত হবার পর মজিদ ভোর বেলায় জমিলার অবস্থা দেখার জন্য মাজার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। তারপর লেখকের বর্ণনা ঃ ''ঝাপটা খুলে মজিদ দেখলো লাল কাপড়ে আবৃত কবরের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে জমিলা, আর মেহেদী দেয়া তার একটা পা কবরের গায়ের সংগে লেগে আছে''। একি অচেতন হবার পূর্ব মুহূর্তে কল্পিত মোদাচ্ছের পীরের প্রতি জমিলার অশ্রদ্ধা প্রদর্শনেরই সচেতন প্রয়াস? হয় তো তাই। মজিদের ভয়ঙ্কর ক্রোধ দেখে তাই-ই মনে হয়। কারণ ঐ দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে মজিদের মনে হলো–''মুহূর্তের মধ্যে কেয়ামত হবে। মুহূর্তের

মধ্যে মজিদের ভেতরে কী যেন উলটপালট হয়ে যাবার উপক্রম করে–কিন্তু শেষ পর্যন্ত টান খেয়ে সে সামলে নেয় নিজেকে''।

হাঁ, চরম উত্তেজিত মুহূর্তেও মজিদ নিজেকে আশ্চর্যভাবে সামলে নিতে জানে। সব রকমের উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে সংযত রাখার কৌশলটি মজিদ সুনিপুণভাবে আয়ত্ত করেছিলো। যে অবস্থায় একজন মানুষ অন্যের জীবন সংহারেও পিছপা হয়না মজিদ সেই রকম পরিস্থিতিতেও ঠান্ডা মাথায় নিজের দুরভিসন্ধি অনুযায়ী কাজ করে চলে। সে ক্রুদ্ধ হয়, বিচলিত হয় কিন্তু তা তাৎক্ষণিকভাবে, পরমুহূর্তেই সে তার ক্রোধকে শীতল করে ফেলে। এ-শীতলতা তার বহিরাবরণ মাত্র, ভেতরে ভেতরে ক্রোধের আগুনকে সে ঠিকই জ্বালিয়ে রাখে। মহব্বত নগর গ্রামের মানুষ তার সে আগুন সব সময় আঁচ করতে পারে না।

হাসুনির বাবা যখন ভরা মজলিসে মজিদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে কথা বলা শুরু করে তখন মজিদ তার সঙ্গে সংযত ভঙ্গিতে কথা বলে, আক্কাসের ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের উদগ্র ইচ্ছাকে কূট কৌশলে বানচাল করার সময়ও সে মাথা ঠান্ডা রাখে। জমিলা তার জীবনে এক ঝঞ্ঝা কিংবা বলা যায় ভয়াবহ এক বিভীষিকার রূপ ধরে এসেছে জেনেও মজিদ তাকে শায়েস্তা করার ব্যাপারে যতগুলি ব্যবস্থা নিয়েছে তাতে সংযত ভাব ও সতর্ক বুদ্ধির পরিচয়ই বেশী পাওয়া যায়। জমিলা যখন মজিদের মুখের উপর থুতু ছিটিয়ে দিলো তখন সে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে জমিলাকে দারুণভাবে প্রহার করতে পারতো কিংবা গলাটিপে বা অন্য কোনো উপায়ে হত্যা করতে পারতো। তার মতো ক্ষমতাধর পুরুষের পক্ষে ঐ ধরনের অপরাধকে অপরাধই বলা যায় না। কারণ মজিদ নিজেও তার ক্ষমতা সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন ছিলো। সে মনে করতো–''এই দুনিয়ার মানুষেরা যেমন আমারে ভয় করে, শ্রদ্ধা করে—তেমনি ভয়ও করে, শ্রদ্ধা করে, অন্য দুনিয়ার জীন-পরীরা।'' সুতরাং এহেন ক্ষমতার অধিকারী কোন ব্যক্তি জমিলার মতো দু-চারটা মেয়েকে রাগের বশে হত্যা করলে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এমন মানুষ মহব্বত নগর গ্রামে কোথায়? কিন্তু তৎসত্ত্বেও মজিদ ঐ রকম ভয়ঙ্কর ক্রোধের মুহূর্তে ঠান্ডা মাথায় সতর্কতার সঙ্গে কাজ করেছে। চকচকে এই সতর্কবুদ্ধি ও সংযত আচরণ মজিদ চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পাঁচ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনী ও অন্যান্য সাহিত্যকর্ম মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে তিনি বিভিন্ন ঘটনাধারার মধ্য দিয়ে ধর্মের প্রসঙ্গ বার বার টেনে এনেছেন। কোথাও কোথাও ধর্মের মাধ্যমেই মূল ঘটনাকে বিচার করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করতেন সাধারণভাবে মুসলমানরা ধর্ম ছাড়া কথা বলে না, ধর্মে কোনটা সিদ্ধ, কোনটা নিষিদ্ধ তা না জেনে কোনো কিছু মানতে চায় না, কিন্তু তাদের ধর্ম ও কর্মের মধ্যে প্রচুর

CS CamScanner

ফাঁকি থেকে যায়। কোন্ দিক থেকে কতখানি ফাঁকি থাকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সেটা দেখাতে চান বলেই তিনি প্রায়শই ধর্মের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। বিবেক বর্জিত ধর্ম মানুষের জীবনকে কতোখানি অর্থহীন ও অন্তঃসারশূন্য করে ফেলে, সমাজে তার প্রভাব যে কতো ক্ষতিকর, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে তা তাঁর উপন্যাস ও ছোট গল্পে দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন বিবেকহীন একশ্রেণীর সুবিধাবাদী মানুষ কতো সহজে ধর্মের ধ্বজা ধরে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দর্পিত ভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্ছে। একে কি সম্মুখের দিকে অগ্রসরণ বলা যাবে ? সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মনে করেন ধর্ম যখন বাহ্যিক আড়ম্বর-অনুষ্ঠানে পরিণত হয় কিংবা তা যখন বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণীর স্বার্থ আদায়ের হাতিয়ারে পরিণত হয় তখন সেই ধর্ম মানুষকে নানা কৌশলে কেবলই দিকভ্রষ্ট করে, আবর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করে। এর চিত্র আমরা তাঁর লাল সালু উপন্যাস ছাড়াও অন্যান্য উপন্যাস ও গল্পেও দেখতে পাই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম লগ্নেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বুঝেছিলেন ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে যে-রাষ্ট্রের জন্ম হয়, সে-রাষ্ট্রে প্রকৃত গণতন্ত্র কোনোদিনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ভণ্ড, বিবেকহীন ও স্বৈরাচারী মজিদেরাই সেখানে প্রাধান্য বিস্তার করবে। তারা তাদের নিরঙ্কুশ-আধিপত্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্মের নামে ধর্মের আগাছার চাষ করবে। সেইজন্যই তিনি শস্যের চেয়ে টুপির সংখ্যা অনেক বেশী দেখে আতঙ্কিত হয়েছিলেন।

ধর্মের আগাছা অর্থাৎ ধর্মীয় কুসংস্কার মানুষকে কোন্ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে যুক্তির আলো থেকে টেনে এনে মানুষকে কতোখানি অন্ধকারে নিক্ষেপ করতে পারে তার বিচিত্রবিধ চিত্র তিনি তাঁর উপন্যাস ও ছোট গল্পে অঙ্কন করেছেন। মুসলমান সমাজে পীরের প্রতি মানুষের অন্ধভক্তির বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ছিলো নিশিত তরবারির মতো। তাদের চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তিনি নানাধরনের বাস্তব ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদেরকে শ্লেষ ও বক্রোক্তির দ্বারা জর্জরিত করেছেন। আওয়ালপুরে আগত অতিবৃদ্ধ পীরের সমাগত বিশাল জনসমাবেশে এক পর্যায়ে বৃক্ষের শাখায় চড়ে বসে দোল খাওয়া, ঐ ঘটনায় তাঁর সাঙ্গপাঙ্গের আর্ত চিৎকার 'পীর সাহেব শূন্যে ওঠে গেছেন' শোনার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মুরীদের আহাজারি ও মরাকান্না— তার সবটুকু অংশই শ্লেষে ভরপুর। সাঙ্গপাঙ্গরা যদি প্রচার করতো পীর সাহেব বৃক্ষশাখা থেকে আর কোনদিনই অবতরণ করবেন না তাহলে ঐ কথার সত্যাসত্য বিচার না করেই হয়ত বহু মুরীদ সঙ্গে সঙ্গেই আত্মহত্যা করে বসতো। এই হচ্ছে আটষট্টি হাজার গ্রাম সম্বলিত বাংলাদেশের মুসলমান জনসাধারণের আসল চেহারা। চরিত্রে ঋজু ও ঋত ভঙ্গি নেই বলেই তারা শৈশব থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিজেদেরকে পাপী-তাপী ভাবতে শেখে এবং তার থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় তারা পীর-ফকিরের সান্নিধ্য লাভের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। চোখের জলে তারা মাজারের লালসালু সিক্ত করে। পীরের মহিমায় অন্ধ এদেশের মুসলমান প্রজাকুলকে খুশী করার জন্য, তাদের হৃদয় জয় করার জন্য আমাদের দেশের ভণ্ড রাষ্ট্র নায়কেরাও তাই ছুটে যান

ফরিদপুরে, টুঙ্গীতে, চট্টগ্রামে বা সিলেটের জীবিত কিংবা মৃত পীরের সন্নিধানে। পীর অথবা পীর কেন্দ্রিক মাজারের মহিমা এতে আশাতীতভাবে বেড়ে যায়। এই দেশে আসবে জনগণতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্র! পীর ও মাজারের প্রতি দেশের মানুষের এই অন্ধভক্তি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে দারুণভাবে বিচলিত করেছিলো। কল্লোলীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েও এবং নিজে বিশ্বের অত্যাধুনিক শহর নগরে জীবন কাটানো সত্ত্বেও তিনি আধুনিক মধ্যবিত্ত জীবনের কাহিনী না লিখে লিখলেন গ্রাম কেন্দ্রিক সেই জীবনের কাহিনী যেখানে গ্রামের মানুষের সমুদয় আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ এক কথায় তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত হয় ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রবর্তক ও লালয়িতাদের দ্বারা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জন্মসাল ছিলো ১৯২২। আনন্দমোহন কলেজে পড়তে পড়তেই লেখক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। কলকাতায় তখন সাহিত্যিকদের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য সুচিহ্নিতভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো। তার মধ্যে একটিতে ছিলো সমাজের সবচেয়ে ঘৃণিত ও অবহেলিত শ্রেণীর মানুষ, যারা কৃষক, মজুর, কামার, তাঁতি, মুচি, ডোম প্রভৃতি নামে পরিচিত—তাদের সংঘাত-জর্জর-জীবনকে নিকটতম দূরত্ব থেকে দেখার প্রবণতা। দ্বিতীয়ত অধিকাংশ লেখকের মানবতাবাদী প্রবণতা সনাতন প্রথার বিরুদ্ধে, এমন কি ধর্মের বিরুদ্ধেও কথা বলার এক দুঃসাহসী মনোভঙ্গী গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলো। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে কল্লোলের অভিনব ঐ দুটি বেগমান ধারাই তাঁর সাহিত্যের চালচিত্র নির্মাণে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিলো। তাঁর গল্প ও উপন্যাসে সমাজের নিম্ন পর্যায়ের মানুষের স্বচ্ছন্দ পদচারণা লক্ষ্য করলেই একথার সত্যতা অনুধাবন করা যায়। প্রথাগত ধর্মের বিরুদ্ধে তাঁর বিতৃষ্ণ মনোভাব খুবই প্রকট। নিজেকে নাস্তিক হিসেবে কখনো ঘোষণা করেন নি ঠিকই, কিন্তু তিনি তাঁর সাহিত্যে ইসলাম ধর্মকে টেনে এনে যেভাবে কাটা-ছেঁড়া করেছেন তাতে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বুঝতে অসুবিধা হয় না। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সারাজীবন কল্লোলীয় কোনো কোনো লেখকের মতোই বিবেকবান ও সৎ মানুষের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর ধারণা ধর্মকে অনুসরণ করে, কিংবা ধর্মের উপর আদৌ আস্থা না রেখেও মানুষ সৎ হতে পারে, বিবেকবান হতে পারে।

ধর্মীয় পরিমন্ডলের মধ্যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বা ধর্মের সমুদয় আচার-আচরণ নিখুঁতভাবে পালন করে অথবা প্রতি মুহূর্তে খোদার নাম জপ করেও মানুষ যে কতো বিবেকহীন ও অসৎ হতে পারে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বিভিন্ন গল্পে ও উপন্যাসে তার চিত্র উপস্থাপন করেছেন। 'লাল সালু'-র মধ্যে ধড়িবাজ মজিদের অসৎ ও বিবেকহীন জীবনের চালচিত্রে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। ভিন্নতর ভঙ্গিতে কপট জীবনের পরিচয় পায় 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের দরবেশ হিসেবে পরিচিত কাদেরের মধ্যে। বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও শুধু নিজের লালসা চরিতার্থ করার পর কাদের কিভাবে করীম মাঝির যুবতী বৌকে হত্যা করে, কিভাবে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ধর্ম-সমাজ ও আইনের রক্ষাকর্তাদের বশীভূত করে, হত্যার সমস্ত দায়ভাগ আরিফের উপর চাপিয়ে নিজে আবার কিভাবে দরবেশ

হিসেবেই সসম্মানে বেঁচে থাকে—তার সমুদয় বর্ণনার মধ্য দিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আমাদের সমাজে ধর্ম ও আইনের অসারতা কতোখানি তা দেখিয়েছেন। অর্থের বিনিময়ে এসমাজে সবচেয়ে বড়ো দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিও নিজেকে মহা ধার্মিক হিসেবে পরিচিত করতে পারে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কিংবা জজের রায়ও এসমাজে খুব সহজেই অর্থের বিনিময়ে কেনা যায়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তৎকালীন ক্যান্সারাক্রান্ত ইসলামী রাষ্ট্রের পরিকীর্ণ-জীবনের চারপাশে এসব কেনা-বেচার কারবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। এসব কল্পিত কোনো কাহিনী নয়। অথচ ঐসব মানুষেরই চারপাশে বিশাল যে নিম্নশ্রেণীর জনগোষ্ঠী উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে দুবেলা আহার যোগাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় রত, তাদের জীবনে ধর্মের চেয়ে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ব্যাপারটাই প্রধান। দাদাসাহেব, কাদের, মজিদ প্রভৃতির মতো তারা ধর্মের বেসাতি করে না—করে না বলেই জীবনে ধর্ম নিয়ে ভণ্ডামী নেই। আমাদের দেশের বিশাল কৃষক জনগোষ্ঠীর কথাই ধরা যাক। তাদের তথাকথিত ধর্মহীন জীবনেও কোনো কলুষ–কালিমা স্পর্শ করে না। তাদের মতো সৎ ও বিবেকবান মানুষ এ সমাজে আর কে আছে?

ছয়

'লালসালু' উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকদের স্বর্ণপ্রসূ জমি ও শস্যের প্রতি প্রবল আকর্ষণের কথা কোথাও কোথাও গভীর মমতা ও যত্নের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। কৃষকদেরকে তিনি রহীমারই অন্য সংস্করণ নামে অভিহিত করেছেন। বলেছেন, "তাগড়া তাগড়া দেহ –চেনে জমি আর ধান, চেনে পেট। খোদার কথা নেই। স্মরণ করিয়ে দিলে আছে, নচেৎ ভুল মেরে থাকে। জমির জন্যে প্রাণ। সে জমিতে বর্ষণহীন খরার দিনে ফাটল ধরলে তখন কেবল স্মরণ হয় খোদাকে। কিন্তু জমি এধারে উর্বর, চারা ছড়িয়েছে কি সোনা ফলবে। মানুষরাও পরিশ্রম করে, জমিও সে শ্রমের সম্মান দেয়। দেয় তো বুক উজাড় করে দেয়"। অমানুষিক হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের কৃষকেরা জমিতে ফসল ফলায়। এ শ্রম-সাধনার কোনো তুলনা নেই। সেই পরিশ্রমের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে ঐ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বলেছেন, "মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তারা খাটে। হয় তো কাঠফাটা রোদ, হয় তো মুষলধারে বৃষ্টি—তারা পরিশ্রম করে চলে। অগ্রহায়ণের শীত খোলা মাঠে হাড় কাঁপায়। রোদ-পানি খাওয়া মোটা কর্কশ ত্বকের ভাসা লোমগুলো পর্যন্ত জলো শীতল হওয়ায় খাড়া হয়ে ওঠে–তবু কোমর পরিমাণ পানিতে ডুবে থাকা মাঠ সাফ করে। সযত্নে, সন্দেহে সাফ করে যত জঞ্জাল। কিন্তু জঞ্জালের আর শেষ নেই। রাত নেই দিন নেই হাল দেয়। তারপর ছড়ায় চারা—ছড়াবার সময় না তাকায় দিগন্তের পানে, না স্মরণ করে খোদাকে। এবং খোদাকে স্মরণ করেনা বলেই হয় তো চারা ছড়ানো জমি শুকিয়ে কঠিন হতে থাকে। রোদ চড়া হয়ে আসে, শূন্য

আকাশ নগ্নতায় নীল হয়ে জ্বলে পুড়ে মরে। নহর নহর হয়ে ওঠা কচি কচি ধানের ওপর পানে চেয়ে বুক কেঁপে ওঠে তাদের। তারা দল বেঁধে আবার ছোটে। তারপর রাত নেই, দিন নেই, বিল থেকে কেঁদে কেঁদে পানি তোলে।" নিজের সন্তান প্রতিপালনেও এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা নেই। প্রতিটি ধানের শিষ কিংবা প্রতিটি শস্যকণার মধ্যে এদের শ্রম-জর্জরিত শরীরের স্বেদের স্পর্শ আছে। তাই বাংলার কৃষক যখন সোনালী ফসল কাটার জন্য, সারিবদ্ধভাবে মাঠে নামে, তখন তাদের সবার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় খুশীর গান। সেই সমবেত গানের সুরেরে হিল্লোল সারা মাঠ ও আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। সব কষ্ট সব দুঃখ যেন ভুলিয়ে দিয়ে ঐ গান ধ্বনিত হয়। চিরায়ত বাংলার কৃষকের সম্মিলিত এই গান অমূল্য সম্পদ। বহিরাগত মজিদের কাছে কৃষকের এ গানের আওয়াজ অসহনীয় হয়ে ওঠে। এদের ধর্মের প্রতি আকর্ষণ নেই। এদের মধ্যে খোদাভক্তি নেই। কণ্ঠে নেই খোদার কালাম, আছে শুধু গান। ক্রোধে মজিদের শরীর-মন রি রি করে ওঠে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ খুব চমৎকার ভঙ্গিতে মজিদের ক্রোধ ব্যক্ত করেছেন : "কাতারে কাতারে সারবন্দী হয়ে দ্বিতীয়ার চাঁদের মত কাস্তে নিয়ে মজুররা যখন ধান কাটে আর বুক ফাটিয়ে গীত গায় তখনো মজিদ দূরে দাঁড়িয়ে দেখে আর ভাবে। .... কিসের এত গান, এত আনন্দ? মজিদের চোখ ছোট হয়ে আসে। রহীমার শরীরে তো এদেরই রক্ত, আর তার মতোই এরা তাগড়া, গাট্টাগোট্টা ও প্রশস্ত। রহীমার চোখে ভয় দেখেছে মজিদ। এরা কি ভয় পাবে না? ওদের গান আকাশে ভাসে, ঝিলমিল করতে থাকা ধানের শীষে এদের আকর্ণ হাসির ঝলক লাগে। ওদের খোদার ভয় নেই। মজিদ চায়, তার গোলা ভরে উঠুক ধানে। কিন্তু সে তো জমিকে ধন মনে করে না, আপন রক্তমাংসের শামিল খেয়াল করে না? শ্যেন দৃষ্টিতে অবিশ্যি চেয়ে দেখে ধানকাটা, কিন্তু তাদের মত লোমজাগানো পুলক লাগে না তার অন্তরে। হাসি তাদের প্রাণ, এ কথা মজিদের ভালো লাগে না। তাদের গীত ও হাসি ভালো লাগে না। ঝালরওয়ালা সালু কাপড়ে আবৃত মাজারটিকে তাদের হাসি আর গীত অবজ্ঞা করে যেন।" মজিদ কৃষকদের মাঠ থেকে ধান ও কণ্ঠ থেকে গান কেড়ে নেবার ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে কিভাবে পাকা করে ফেলে তা আমরা জেনেছি। মজিদের ভয়ে কৃষকরা কলমা ও দোয়া-দরুদ মুখস্ত করতে থাকে। মজিদ এক একজন কৃষককে ধরে ধরে সবার সামনে সুকৌশলে এসবের মহড়া চালায়। জোর করে মজিদ তাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেও বাধ্য করে। মহব্বত নগর গ্রামের কৃষকদের হাসি-গানে ভরা জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণ প্রাচুর্যের অপমৃত্যু এভাবেই ঘটে।

বৃহত্তর জীবনের এমন বাস্তব ছবি অঙ্কন করে ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নিজেকে বাস্তববাদী কথা শিল্পী হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। কৃষিজীবী মানুষের কঠিন জীবনের চালচিত্র এতো নিঁখুতভাবে চিত্রিত করতে যেয়ে তিনি সমকালীন পাক সরকারের এ দেশে আগমনের পর থেকে ধানের দেশ, গানের দেশ এই বাংলাদেশের কৃষক সমাজের শোচনীয় অবস্থার কথা বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্মরণ করেছেন। আমাদের

এদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় আশি/পঁচাশি ভাগ মানুষের অর্থাৎ ঐ বিশাল কৃষক জনগোষ্ঠীর জীবনে যেটুকু সুখ, হাসি, আনন্দ ও গান বৃটিশ রাজ শক্তির অবসানের পর অবশিষ্ট ছিলো, পাক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ধর্মীয় কলাকৌশলে শোষণের মাধ্যমে কিভাবে শেষ হতে থাকে লেখক তা নিকটতম দূরত্ব থেকে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে অবলোকন করেছেন। কৃষক জনগোষ্ঠীর শোচনীয় সেই অবস্থার ইতিবৃত্তই হচ্ছে 'লাল সালু' উপন্যাস। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ গভীর মমতা ও ভালোবাসার সঙ্গে স্বল্প পরিসরে কৃষকদের জীবনকে যেভাবে এই উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন তার মূল্য অপরিসীম। কৃষকদের প্রতি ঔপন্যাসিকের শ্রদ্ধা একটি মাত্র বাক্যে কি গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে সত্যিই তা লক্ষ্য করার মতো : "ঝালরওয়ালা সালুকাপড়ে আবৃত মাজারটিকে তাদের (কৃষকদের) হাসি আর গীত অবজ্ঞা করে যেন"।

সাত

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র 'লাল সালু' উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যমনি অচেনা মজিদের মহব্বত নগর গ্রামে আকস্মিক অনুপ্রবেশ, ধর্মীয় নানা কুসংস্কারকে সামনে রেখে সেই গ্রামের নিরীহ-নিরক্ষর অধিবাসীদেরকে শাসন ও শোষণ এবং প্রতি পদক্ষেপে ক্ষমতাদর্পী সম্রাটের মতো তার আচরণ ও কথোপকথন—এর সব কিছুই ইসলামী তাহজীব ও তমুদ্দুনে সমৃদ্ধ তৎকালীন পাকিস্তানের স্বৈরাচারী রাষ্ট্র নায়কদের পূর্ববঙ্গে অনুপ্রবেশ ও ধর্মের নামে শাসন-শোষণের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় না কি ? একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে ধর্মের ধুয়া তুলে, সারাক্ষণ ইসলামী তাহজীব ও তমুদ্দুনের নিনাদ তুলেও পাকিস্তানী সরকার পূর্বাঞ্চলের প্রজাদের রোষ এড়াতে পারেনি। ধর্মের ঢক্কা নিনাদ শুনে আত্মসার একটি শ্রেণী সম্মোহিত হয়েছে এবং তারা জিন্নাহ থেকে ইয়াহিয়া খান পর্যন্ত সবাইকে অন্ধভাবে খোদার প্রেরিত প্রতিনিধি হিসেবে বন্দনা করেছে কিন্তু তার মধ্যেই জমিলাদের মতো আর এক শ্রেণীর মানুষের শক্তিও পাক সরকারের গড়া (মজিদে গড়া মাজারের মতো) ধর্মের অচলায়তন ভেঙ্গে ফেলার জন্য তীব্র রোষে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। মজিদের মুখের উপর জমিলার থুতু নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে ঐ শ্রেণীর রুদ্র রোষের প্রাবল্যকে লেখক নিরবদ্য ভঙ্গিতে নির্বারিত করে দিয়েছেন।

রহীমার মতো আপনজনও জমিলার প্রতি নিষ্ঠুর দমনপীড়ন সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদী ভঙ্গিতে মজিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং সে এক পর্যায়ে মজিদের আড়ালে চলে যায়। মজিদ তার কাছে এক অচেনা মানুষে পরিণত হয়। দমন-নিপীড়ন-শাসনের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে বিক্ষুব্ধ প্রজারা তাদের হর্তা-কর্তার বিরুদ্ধে কখন যে কি করে বসে তা নিশ্চত করে কিছু বলা যায় না। নিরুপায়-নিঃসহায় জমিলা মজিদের দ্বারা নিপীড়িত হতে হতে এক পর্যায়ে ক্রোধে ও ঘৃণায় তার মুখের উপর থুতু ছিটিয়ে দিয়েছে। মজিদ

নামক একাধিপত্য বিস্তারকারী স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার এর চেয়ে অত্যুত্তম উপায় আর কি আছে ? কঠিন বিধি-নিষেধের ফাঁক দিয়ে ধর্মোন্মাদ পাকিস্তানী সরকারের বিরুদ্ধে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র রুখে দাঁড়াবার এই ভঙ্গি ও কৌশলের কোনো তুলনা হয় না। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি লেখনী ধারণ করেন নি, কোনো সভা-সমিতিতে সরকার-বিরোধী কোনো বক্তৃতাও দেন নি কিন্তু তবুও বলা যায় ক্যাঙ্গারাক্রান্ত ইসলামী ঐ রাষ্ট্রের অনৈসলামিক কার্যকলাপ নানা ভাবে তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে ফাটল সৃষ্টি করেছিলো। তাঁর সাহিত্যের সমুদয় অংশ খুঁটিয়ে পড়লে এ ধারণা স্পষ্ট হয়। ১৯৭১ সালের ১০ই অক্টোবর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্যারিসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ লোকান্তরিত হন। প্যারিসে সেই সময় তিনি পাক সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যাশায় মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। পাক সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গড়ে তোলার জন্য তিনি প্যারিসে বসেই নানা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অত্যন্ত সংগোপনে টাকা ও বস্ত্র পাঠাতেন। এ কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯৪৬ সালে সোহরাওয়ার্দী, শরৎবসু প্রভৃতির দ্বারা উত্থাপিত, 'স্বাধীন বাংলা'র দাবীর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে সেই স্বপ্ন অনেকখানি পূরণ হতে যাচ্ছে দেখে তিনি দারুণভাবে উদ্দীপিত হয়েছিলেন। ঐ স্বপ্ন, ঐ প্রত্যাশা যাতে ব্যর্থ না হয় তার জন্য তাঁর উদ্বেগের কোনো সীমা পরিসীমা ছিলো না। মাথার রক্তক্ষরণ জনিত কারণে মৃত্যু কি সেই দারুণ উদ্বেগের জন্যই ঘটেছিলো ? নবোদ্ভূত স্বাধীন বাংলাদেশকে দেখে যাবার সৌভাগ্য তাঁর হয় নি, কিন্তু সে আশা যদি তাঁর পূরণ হতো তাহলে আমরা তাঁর কাছ থেকে কালান্তরে স্মরণ রাখার মতো কিছু সাহিত্য হয় তো উপহার পেতাম। রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কথা না বলার কঠিন নিয়মের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যে-যন্ত্রণায় দুই যুগ ধরে গুমরে মরেছিলেন, একাত্তরে তার অবসানের পর মৃত্যু যদি আকস্মিকভাবে তাঁকে ছিনিয়ে না নিতো তাহলে দুই যুগের শোষণ-নিপীড়নের অকথিত কতো কথা দিয়ে রচনা করতেন কালজয়ী উপন্যাস, নাটক, ছোট গল্প। এ-অচরিতার্থতা আমাদের বাংলাদেশের সাহিত্যের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি নিঃসন্দেহে।

'লালসালু এবং ওয়ালীউল্লাহ্' নামক সংকলন-গ্রন্থ থেকে
উৎকলিত হলো (মমতাজউদদীন আহমদ সম্পাদিত)

এয়াকুব-মানস ও তাঁর সাহিত্য পরিচয়

এয়াকুব আলী চৌধুরী ছিলেন চিরকুমার। চিরকৌমার্যের মূলে যে কারণ নিহিত ছিল তা কিছুটা শারীরিক। তিনি দুরারোগ্য যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এই শারীরিক ব্যাধি তাঁর শরীরকে কুরে কুরে খেয়ে অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণ হয়েছিলো। কিন্তু অতিশয় আশ্চর্যের কথা এই যক্ষা রোগাক্রান্ত মানুষটির শারীরিক কাঠামোর সঙ্গে মানসিক কাঠামোর দুস্তর ব্যবধান লক্ষ্য করা গিয়েছিল। জীবদ্দশায় তিনি যে সব গুণের অধিকারী হয়েছিলেন তা এহেন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে রীতিমত অকল্পনীয়। বচনে, আচরণে তিনি ছিলেন অতিশয় নম্র ও মিষ্টভাষী। মানব হিতৈষণা ও পরহিতব্রতের জন্য তিনি সমকালীন মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন। সারাটি জীবন তিনি ইসলাম ধর্মের সারাৎসার এবং হযরত মোহাম্মদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার অনলে পোড়ানো জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সেই চিন্তা ও চেতনার দ্বারা নিজের জীবনকে বিকশিত করবার জন্য সাধনা করে গেছেন। তিনি কেবল সাহিত্যিক নন, তিনি সাধক এবং সঠিক অর্থে ধার্মিকও। তিনি ১২৯৫ সালের ১৮ই কার্তিক ফরিদপুরের পাংশা থানার অন্তর্গত মাগুরভাঙ্গা গ্রামে জন্মেছিলেন এবং ঐ গ্রামের নিজস্ব বাসভবনে ১৩৪৭ সালে ১লা পৌষ তিনি গতায়ু হন।

দুই

বাংলা সাহিত্যে এয়াকুব আলীর আবির্ভাব মুসলিম জাতির এক ঘোর দুর্দিনে। আশাভঙ্গের বেদনায় এই জাতির মর্মস্থল তখন বিধ্বস্ত। সুচতুর ইংরেজ এদেশে তাদের শাসন ও শোষণকে কায়েম করার মানসে ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে যেমন অদ্ভুত সব পদলেহনকারী এক একটি তাঁবেদার শ্রেণী তৈরি করেছিলো তেমনি শিক্ষা সংস্কার করতে গিয়ে হিন্দু ও মুসলমান এই দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধকে প্রকট করার জন্য বিশেষভাবে যত্নবান হয়েছিলো। পদলেহনকারী এক একটি শ্রেণীর মধ্যে ইংরেজ দু'টি উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করলো। প্রথমত নির্মমভাবে দেশের বৃহত্তর জনগণকে শোষণ করে প্রচুর রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা, দ্বিতীয়ত ভূমির মালিকদের সঙ্গে শোষিত ভূমিহীনদের অসন্তোষ ও অনৈক্যসুলভ মনোভাবের সৃষ্টি। শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা যাতে তারা অর্জন করতে না পারে তার জন্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমন একটি ছকে ফেলা হলো যাতে বৃহত্তর জনমানসের সঙ্গে তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষিত জনমানসের ব্যবধান দুস্তর হয়। ১৮৩৫

সালে ফার্সীর বদলে ইংরেজী রাজভাষা হলো। রাজ্য হারানোর মনোবেদনা ছিল মুলসমানদের মধ্যে তীব্র, রাজভাষা হারানোর অসহ চেতনা হলো যেন আরও তীব্রতম। একটা প্রচন্ড আক্রোশে মুসলমান সমাজ ফেটে পড়লো। ইংরেজী শিক্ষাকে তারা সচেতন বিরোধিতায় বর্জন করলো। এর ফলে হিন্দু সমাজ উত্তরোত্তর ইংরেজদের প্রীতিভাজন হলো। এরা নবপ্রবর্তিত ইংরেজী শিক্ষা যার সঙ্গে দেশের বৃহত্তর জনমানসের কোনো সংযোগই ছিল না, তাকে রামমোহনের যুক্তিগ্রাহ্য আবেদনে গ্রহণ করলো। সমাজের এই ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি যতই ভক্তি-প্রীতি ও শ্রদ্ধার অনুপম নির্দশন দেখিয়ে ইংরেজদের নৈকট্য লাভ করলো, মধ্যবিত্ত মুসলমানেরা তাদের মাদ্রাসা শিক্ষায় আবদ্ধ থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে শাস্ত্রসম্মত নানারকম ফতোয়া এঁটে ততই দূরে সরে গেল। ওহাবী ও ফারাজীদের উদ্ভবে এই দূরত্ব অতিশয় প্রকট হলো। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমান যারা তারা মাদ্রাসায় আরবী-ফার্সী শিখে চাকুরী না পেয়ে অবর্ণনীয় দুর্দশার সম্মুখীন হলো। বাস্তব জীবনের রূঢ় আঘাত বৃহত্তর জনসংযোগহীন এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়টিকে সাংঘাতিকভাবে বিচলিত করে তুললো। উত্তর ভারতের রায়বেরিলী নিবাসী প্রখ্যাত ধর্মনেতা সৈয়দ আহমদ, পূর্ববাংলার ফারাজী নেতা হাজী শরীয়তুল্লা ও পশ্চিমবঙ্গের ফারাজী নেতা মীর নিসার আলী (তিতুমীর) প্রমুখ ব্যক্তি মক্কায় হজ্জ উপলক্ষে ওহাবীদের সংস্পর্শে এসে তাঁদের 'আদিম ইসলামে' প্রত্যাবর্তনের আদর্শ গ্রহণ করেন এবং নবতর উদ্দীপনায় ভারতবর্ষে তার প্রচার শুরু করেন। বৃটিশ সরকার-বিরোধী এই আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের ধ্বংসাত্মক প্রবাহে বাংলাদেশের সাধারণ স্তরের বহু মানুষ একাত্ম হয়েছিলো: কিন্তু অন্তর্লীন তাগিদটি ছিল মুখ্যত ধর্মকেন্দ্রিক অর্থাৎ বিধর্মী ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে যে আত্মাহুতি, তাতে পারলৌকিক মুক্তি অনিবার্য—এই অভিজ্ঞানটি ছিল প্রকট এবং তথাকথিত তেজস্বী কতকগুলি ধর্মপ্রাণ মানুষ যাঁরা মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীসম্ভূত, তাঁদের ওজস্বিনী ও জ্বালাময়ী বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের কৃষকশ্রেণীর অগণিত যুবক আত্মাহুতি দিয়েছিলো। কিন্তু এটাকে ঐ শ্রেণীর মানুষের দুঃখ ও দৈন্যপ্রপীড়িত জীবনের মুক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করার জন্য কোন পরিকল্পিত আন্দোলন বলা যায় না। ইংরেজকে বিতাড়িত ক'রে দেশে আবার মুসলমান শাসনের পুনঃপ্রবর্তনের স্বপ্ন কামনায় এঁরা বিভোর হয়েছেন সত্য, কিন্তু তার সামন্ততান্ত্রিক সত্তার পরিবর্তন ঘটানোর কোন বৈপ্লবিক চেতনা এঁদের ছিল না। ফলে এটা প্রকৃত অর্থে গণআন্দোলন না হয়ে একশ্রেণীর মানুষের রাজনৈতিক স্বার্থচেতনাসম্ভূত ধর্মান্দোলনে পর্যবসিত হয়েছে। অথচ 'আদিম ইসলামে' প্রত্যাবর্তনের যে আদর্শটি তারা গ্রহণ করেছিলো তার ভেতরেই-এর শুধু বীজ নয়, শাখা-প্রশাখা-বিস্তৃত বিরাট মহীরুহই ছিল। সর্বহারা মানুষের অভাব-তাড়িত, দৈন্যপীড়িত জীবনের সঙ্গে যিনি প্রগাঢ় চেতনায় ও অখন্ড আন্তরিকতায় একাত্মতা স্থাপন করে জগতের সামনে এক অনুপম দৃষ্টান্ত রেখেছেন সেই নররত্ন হজরত মোহাম্মদের কথা বলছি। ওহাবীদের ধর্মপ্রচারণার উদগ্রতায় 'আদি ইসলামে' প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারটা

নিছক কতকগুলি ধর্মীয় বিধিনিষেধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, অবিরত বিকশিত জীবনের চলিষ্ণু ধারার চমকপ্রদ সৃজনশীলতার সঙ্গে তার অসদ্ভাব ছিল অত্যন্ত প্রকট। এইভাবে পশ্চাদ্বর্তনের পৌনঃপুনিক পুনরাবৃত্তিতে অন্তঃসারশূন্যতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দিলো। লুপ্ত আভিজাত্যের সুতীব্র অভিমানে দৃষ্টি প্রসারিত হলো ইরান-তুরানের দিকে। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মুসলমান তাদের চিন্তা ও চেতনার খোরাক খোঁজার জন্য মানস পরিক্রমা করলো আরব-ইরান-তুরানের স্বপ্নোজ্জ্বল রাজ্যে। আনুভূতিক চিন্তা ও চেতনার এমনি এক অন্তঃসারশূন্য লগ্নে মুসলমান কবিদের দ্বারা সৃষ্ট হলো আবর্জনার মতো রাশি রাশি পুঁথি সাহিত্যের। 'এতে পরিচয় ছিল, শাসন ছিল কিন্তু আর্বজনার দুশ্ছেদ্য সম্বরণ থেকে মানবত্বের মুক্তি ছিল না। তাই এই স্তরে পৌছেও বাঙালী মুসলমান দেশের উৎকৃষ্ট জীবনে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি'। পুঁথিসাহিত্যের পাশাপাশি সর্বৈব ধর্মকেন্দ্রিক আরও কিছু কিছু সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিলো। এয়াকুব আলী মুসলমান বাংলা সাহিত্যের ধর্মকেন্দ্রিক গুমোট ও স্যাঁতসেঁতে সেই আবহাওয়ায় আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু এই প্রাবন্ধিকের চিন্তা ও চেতনা সেদিনের ধর্মের গুমোট ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া থেকে নির্মুক্ত হয়ে বলিষ্ঠ জীবনের অনুসন্ধানে উন্মুক্ত আলোবাতাসে নিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছিলো। সীমাবদ্ধতা যেটুকু ছিল তা নিতান্তই সমকালের অবরুদ্ধ চেতনার ফলশ্রুতি মাত্র। এয়াকুব আলী বিস্তারিত হয়েছেন এবং সেই বিস্তার সর্বহারা মানুষের কল্যাণ কামনাকে স্পর্শও করেছে; কিন্তু রাজনীতিক চেতনার অভিধায় বিস্ফোরিত তিনি হতে পারেন নি। এটা তাঁর সীমাবদ্ধতা। কিন্তু এক অর্থে তাঁর বিস্তারিত চৈতন্যই এক ধরনের বিস্ফোরণ। মানবিক গুণাবলীর সুস্নিগ্ধ মৃদুতার অনির্বচনীয় স্বাদুতায় তা অনুভূত হয়। ন্যায় ও নীতিসর্বস্ব মনুষ্যত্বের উজ্জীবন ও দৈনন্দিন জীবনে তার সার্থক প্রয়োগেই মানবিক কল্যাণ সম্ভব এবং সে-কল্যাণ অর্থনীতিক ও আধ্যাত্মিক উভয়ত— এই বিশ্বাস তৎকালীন ধর্ম-ধ্বজী সাহিত্যিকদের ধর্ম প্রচারণার অন্ধ উন্মত্ততাকে লজ্জা দিয়েছে। তাঁর সমকালে ও উত্তরকালে মুসলমান চিন্তাশীল সাহিত্যিকেরা তাঁদের দৃষ্টিকে সীমাহীন শ্রদ্ধায় আবর-ইরান-তুরান-আফগানের দিকে প্রসারিত ক'রে যখন নতুন একটি মুসলিম জগৎ নির্মাণের স্বপ্নকামনায় বিভোর এবং তার উদগ্র প্রচারণায় উন্মত্ত তখন এই চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক সেই রঙীন মোহজালকে কিভাবে ছিন্ন করেছেন তা বিশেষভাবে স্মর্তব্যঃ "ফলতঃ ইসলামের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব দেশকাল ও গিরিমরুর সীমা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলেও মমতাভেদ মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিবলে মুসলমানদিগের মধ্যেও বিদ্যমান আছে। প্রত্যেক জাতির হৃদয় তাহার জন্মভূমির আকর্ষণে আনন্দিত হয়। স্বদেশের সম্পদগৌরবে তাহার হৃদয় নন্দিত হয়। নববলে বলীয়ান তরুণ তুর্কী বা আফগান যদি ঘটনাক্রমে এই দেশ অধিকার করে তবে তাহা তুর্কী বা আফগানেরই রাজত্ব হইবে, ভারতীয় মুসলমাদের রাজত্ব হইবে না। সেই অধীনতার পেষণ হিন্দুর ন্যায় মুসলমানদিগকেও সমভাবে ভোগ করিতে হইবে। সেই নবপ্রতিষ্ঠিত রাজত্বের সুখ-সুবিধার স্বর্ণ-তোরণ উদ্‌ঘাটিত হইবে

ভারতীয় মুসলমাদের জন্য নয়, তুরস্ক বা কাবুলের মুসলমানের জন্য। ভারতের ধনস্রোত তখন লণ্ডন হইতে ফিরিয়া আঙ্গোরা বা কাবুলের দিকেই প্রবাহিত হইবে। বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর-জীর্ণ পল্লী-প্রাঙ্গণে ছিন্নবাস-পরিহিত মুসলমান কৃষক-কুলের কুটিরে রজত-কাঞ্চনের হাসি ফুটিবে না। এখন তাহারা যেমন করিয়া মরিতেছে, তখনও তাহারা তেমনি করিয়াই মরিবে।' ('মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতা' ও 'হিন্দুর জাতীয়তা' নামক এয়াকুব আলীর প্রবন্ধ, এয়াকুব আলী চৌধুরীর অপ্রকাশিত রচনাবলী হতে উৎকলিত)। যুগমানসের সঙ্গে তাঁর যে ব্যবধান এবং দ্বিধাহীন দৃপ্তচেতনায় তিনি যে কতখানি ভাস্বর তার স্বরূপটি তুলে ধরার জন্যই উপরোক্ত উদ্ধৃতির প্রয়োজন হলো। এ ধরনের বিশ্লেষণী শক্তিতে তিনি যতই সত্যের কাছাকাছি পৌছেছেন ততই মুসলমান সমাজের বুদ্ধিজীবী একটা শ্রেণীর মানুষের থেকে তিনি দূরে সরে গেছেন। কিন্তু এর মহত্তম পরিণাম এদেশের মুসলমানদের জন্য মহৎ সংবাদেরই অন্তর্গত। দূরে গিয়ে তিনি সত্য-দৃপ্ত চেতনার আলোকে ধর্মের সারাৎসারকে গ্রহণ করেছেন, আর গ্রহণ করেছেন প্রেমময়, স্নেহময়, দয়াময় ও তেজোময় ব্যক্তিত্বের আধার নর-চূড়ামণি হজরত মোহাম্মদকে।

বাংলাদেশের উনিশ শতক এবং বিশ শতকের কিছুকাল নানা ঐতিহাসিক কারণে ধর্মান্দোলনের স্বরূপ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। হিন্দু সমাজের একদল ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির জোয়ারে গা ভাসিয়ে ভারতীয় ধর্ম ও জীবনাদর্শের মাহাত্ম্যকে অস্বীকার করলো, অন্যদিকে অন্য আর একটি দল ভারতীয় ধর্ম ও জীবনাদর্শকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকার জন্য নানাভাবে ব্রতী হলেন। রামমোহন থেকে বঙ্কিম পর্যন্ত নতুন ধর্ম প্রচার, প্রচলিত ধর্মের সংস্কার ও ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও সমালোচনা ইত্যাদিতে তখন বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত এক নতুন রূপচেতনায় উদ্ভাসিত। ১৮৯২ সালে বঙ্কিমের 'কৃষ্ণ-চরিত্রে'র সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'কৃষ্ণ-চরিত্র' গ্রন্থের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এ-গ্রন্থে আমি তাঁহার কেবল মানবচরিত্রেরই সমালোচনা করিব। তবে এখন হিন্দু ধর্মের আলোচনা কিছু প্রবলতা লাভ করিয়াছে। ধর্মান্দোলনের প্রবলতার এই সময়ে কৃষ্ণ-চরিত্রের সবিস্তারে আলোচনা প্রয়োজনীয়।' কৃষ্ণ-চরিত্রের যৌক্তিক সমালোচনার এই প্রবণতা ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে কোন কোন মুসলমান সাহিত্যিককে হজরত মোহাম্মদের চরিত্রকে পর্যালোচনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। হজরত মোহাম্মদের চরিত্র পর্য়ালোচনা করতে গিয়ে অনেকে কেবল তাঁর অলৌকিকত্ব ও অসাধারণত্বের কথা স্মরণ ক'রে তাঁকে মহিমময়, জ্যোতির্ময় এমন এক লোকে সরিয়ে দিয়েছে যেখান থেকে আমাদের লৌকিক জীবনের দূরত্ব দুর্লঙ্ঘ্য ও দুরতিক্রম্য হয়ে পড়েছে। এয়াকুব আলীর মনীষা ও বিচার-বিবেচনায় অনেকখানি বঙ্কিমের কৃষ্ণ-চরিত্রের প্রেরণায় হজরত মোহাম্মদকে সাধারণ অর্থে মানবিক বা লৌকিক জীবনের পটভূমিতে উপস্থাপন করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

তিন

পূর্বেই বলা হয়েছে এ যুগের সাহিত্যের মূল লক্ষণ ধর্ম অথবা ধর্মাশ্রিত কোন জীবন কাহিনী বর্ণনা। মুসলমানদের রিক্ত ও নিঃসহায় ঐ অবস্থায় ধর্ম বা ধর্মাশ্রিত কোন কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বলা তখন সম্ভব ছিল না। বাংলার মুসলিম জীবনের দুর্যোগময় ঘনঘটায় ইসলামের পুনরুজ্জীবনের এই মহৎ প্রচেষ্টার কথাটি মনে রেখে আমরা এয়াকুব আলী চৌধুরীর সাহিত্য প্রতিভার স্বরূপ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হবো।

হজরত মোহাম্মদের জীবন ও কর্মের অনুস্যুত ধারাটি মানব জীবনের অন্ধকার পথে এক তেজোদীপ্ত আলোকবর্তিকা। তিনি মানুষের পরমতম বন্ধু, শোকদীর্ণ ও ব্যথাহত মানুষ তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে শোকহরণের অনুপম প্রলেপ, পতিত মানবাত্মার তিনি ব্যথাহারী নীলকণ্ঠ। মহাপ্রাণ হজরত মোহাম্মদ দিব্যলোকের জ্যোতির্ময় চেতনায় উজ্জ্বল হয়েও মর্তের দুঃখ ও বেদনায়, হাসি ও আনন্দে কত প্রগাঢ় আন্তরিকতায় সংযুক্ত। তাঁর আশ্চর্য উদারতা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার মহত্তম আদর্শ মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক অপূর্ব সংযোজন।

এয়াকুব আলী ইসলামের মর্মমূলীয় বাণী অন্বেষণ করতে গিয়ে মর্ত্যরসে সঞ্জীবিত এই মহাপ্রাণ হজরতের জীবনের অনবদ্য ধারাটিকে পরম বিস্ময়ে ও গভীরতম শ্রদ্ধায় অবলোকন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি যতই প্রবলভাবে এই মহাপ্রাণ হজরতের জীবনের অনুধ্যানের স্বরূপটিকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন ততই হীনবল মুসলিম জাতির পশ্চাদ্বর্তনের কারণটিকে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে মুসলিম জাতির হীনতা ও দীনতা অবশ্যম্ভাবী ছিল না কিন্তু যেদিন থেকে মুসলমানেরা ইসলামের অনুপম সত্তা থেকে বিচ্যুত হলো সেইদিন থেকে পতনের ভারে মুসলমান জাতি নত হল, ক্রমায়ত-অবক্ষয় তার জন্য অনিবার্য হয়ে দেখা দিলো। হজরত মোহাম্মদের সত্যসুন্দর, সাধনপূত, ত্যাগব্রত মহানজীবন ছিল মুসলিম জাতির পথ নির্দেশক, যার অনুসৃতিতে জীবনের সমস্ত গ্লানি মুছে গিয়ে জীবন জ্যোতির্ময় আলোকে উদ্ভাসিত হতো। কিন্তু আমরা তাঁর সত্যসিক্ত চেতনার স্বরূপটিকে বিস্মৃত হয়ে তাঁকে মহিমময় এমন এক লোকে সরিয়ে রেখেছি যা কেবল হিন্দুদের দেবতা ও দেবলোকের সঙ্গেই তুলনীয়। জীবন সংগ্রামের জন্য, জীবন পথে চলার জন্য মুসলমানদের কোরআনে যা লিখিতভাবে নির্দেশিত হয়েছে, হজরত মোহাম্মদ তাঁর আদর্শায়িত প্রতিরূপমাত্র। ইসলামের এই অপরিহার্য সত্তাটিকে সার্থকভাবে অনুভব ও অনুসরণ করতে না পেরে আমরা আজ দিশেহারা।

এয়াকুব আলী চৌধুরী হজরতের জীবনকে সামনে রেখে সারাটি জীবন আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁর প্রতিটি সাহিত্য কর্মের ফলশ্রুতি এই আত্মানুসন্ধানের স্বরূপে উদ্ভাসিত। তাঁর 'ধর্মের কাহিনী', 'শান্তিধারা', 'মানব-মুকুট' ও 'নূরনবী' এই চারিটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ বৃহৎ ভাব ও জীবনের অপরূপ মর্ত্যরসে সঞ্জীবিত। আর এই রসের মূলধারার উৎস ইসলাম ও আমাদের একমাত্র পথ প্রদর্শক হজরত মোহাম্মদ।

এয়াকুব আলী বুঝেছিলেন যে, ধর্ম ছাড়া মানুষের কোন গতি নেই। মানুষের জীবনের সমুদয় অস্থিরতা, মলিনতা ও অসার্থকতার নিরসন ঘটে ধর্মের নৈষ্ঠিক অনুসৃতিতে। কিন্তু তিনি ব্যবহারিক জীবনে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় চেতনার অভাব লক্ষ্য করেছেন নিদারুণভাবে। তিনি দেখেছেন মানুষ তার চাকুরী, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও ঘর-সংসারের চিন্তায় এত বেশী আত্মনিমগ্ন যে ধর্মীয় চিন্তা ও চেতনায় আত্ম-বিশ্লেষণের কোন ফুরসৎ তার হয় না। ধর্ম যেন নিরর্থক। 'ধর্ম একটা গল্পমাত্র'। স্বার্থের পঙ্কে নিমজ্জিত মানুষ পরার্থ চিন্তায় আঁতকে উঠে, ত্যাগ ও তিতিক্ষার কথা শুনলে তার মন আর্তনাদ করে উঠে অথচ নামাজ ও রোজা পালনের মাধ্যমে সে ধর্মকে পাবার জন্য উন্মুখ। —এয়াকুব আলী তথাকথিত সালাত-সিয়াম পালনকারী ধার্মিকদের মুখোশটিকে টেনে খুলে ফেলেছেন এবং বলেছেন যে, কেবল এসব পালন করেই ধর্মকে পাওয়া যায় না। প্রাত্যহিক জীবনের কর্মের মর্মে ধর্মের অধিষ্ঠান। আর সেই কর্মময় জীবনের পাপড়িগুলি পরিহিতব্রতের রঙ্গীন আলোকে ঝলমলিয়ে উঠা চাই। কিন্তু তিনি পৃথিবীর চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে যা দেখেছেন তা বড়ই হতাশাব্যঞ্জক। 'মানব সমাজের যে-দিকে ও যে-স্তরেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই কেবল অধর্মের পূর্ণপ্রসার দেখিতে পাই, ধর্মকে কোথাও খুঁজিয়া পাই না'। মানুষের শুভবুদ্ধির উপর তিনি আস্থাশীল। তাই তিনি বলেছেন, 'তুমি মানুষ, পুণ্য ও চৈতন্যস্বরূপ....... তুমি কেন ছোট হইবে? কেন পাপ করিবে? ধর্ম তোমাকে জ্যোতিষ্মান করুক। তুমি নিশা অবসানে শিশির স্নিগ্ধ পদ্মের মত করুণাময় খোদাতালার পানে বিকশিত হইয়া উঠ'।

তাঁর 'শান্তিধারা' বইয়ে ইসলামের অন্তর্নিহিত মহৎ সত্যটিকে একজন খাঁটি মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গীতে অনুভব করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তিনি ইসলাম সম্পর্কে বলেছেন, 'পুষ্পের যাহা সুরভি, পল্লবের যাহা শ্যামলতা, দিগন্ত বিস্তৃত-গগনের যাহা অসীম নীলিমা, ইসলাম মানবাত্মার তাই'। ইসলামকে তিনি স্বভাব ধর্ম বা ফিতরতের ধর্ম বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আসলে প্রত্যেক মানুষ ইসলামে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তার স্বজনেরা তাকে নিয়ে যায় অন্যপথ ও মতের দিকে। তিনি বলেছেন, 'যে-সঙ্গীত-সমন্বয় নিখিল ভুবনের মূলে বিদ্যমান থাকিয়া এই বিপুল বিচিত্র জগৎ-যন্ত্র অনায়াসে চালনা করিতেছে, সেই পরম ঐক্য ইসলাম ধর্মেও মূর্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে'।

'সালাত' (নামাজ) ও 'সিয়াম' (রমজানের উপবাস) সম্পর্কে তিনি যেসব কথা বলেছেন তাতে তাঁর প্রকৃত ধর্মীয় চেতনার রূপায়ণ ঘটেছে। রমজানের সংযম সম্পর্কে তাঁর উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়: 'পঙ্কিল দেহের লালসা-কামনা ঐ শতকুটিলতা হিংসাদ্বেষ, ঐ ঘৃণ্য, ঐ নীচতা, ওসকল তুমি নও। তুমি আত্মা প্রাণময় জ্ঞানময় চৈতন্যের আত্মা, উহাদের উর্ধ্বে তোমার স্থান। অনন্ত কল্যাণময় চিন্ময় আল্লাহর ধ্যান ও চিন্তায়, প্রেম ও সেবায় যে অম্লান আনন্দামৃত সঞ্চিত আছে, তাহাই তোমার খাদ্য।' ইসলামে উপাসনা বলতে এয়াকুব আলী বুঝেছেন, 'মূলের প্রতি মানবচিত্তের স্বাভাবিক আসক্তি'র প্রকাশ।

CamScanner

'জরজর কলেবরে তাঁহার সমীপে লুণ্ঠিত হইতে না পারিলে তাঁহার সহিত মিলনানুভূতির অমৃতরসে মজিয়া যাইতে না পারিলে কিছুতেই মানব-মন শান্তি পায় না'। এই শান্তি পাওয়ার দুর্মর আকুতিতে অবারিতভাবে তিনি ভেসে চলেছেন। তিনি বার বার যুক্তির দ্বারা তাঁর হৃদয়ের তপ্তজ্বালাকে নিবারিত করতে গিয়ে দেখেছেন চিত্তের জ্বালা তাতে জুড়ায় না। হৃদয়ের মর্মতলে তপ্ত ব্যথা যেন লুকিয়ে থাকে, যেন কুরে কুরে তাঁর সত্তাকে বিনষ্ট করতে উদ্যত। তাই তিনি যুক্তির পথ ত্যাগ ক'রে অন্তর্নিহিত শক্তির সন্ধান করেছেন ভাবালুতার মাধ্যমে। ফলে বিজ্ঞানভিত্তিক চেতনা ও চিন্তার স্বচ্ছ রূপ ও কার্যকারণ সম্পর্কটি সেখানে অনুপস্থিত। কিন্তু তাঁর ধর্মীয় ভাবালুতা কোথাও উদভ্রান্ত চিন্তা ও চেতনার পরিপোষক হয়নি—একটা বলিষ্ঠ আত্মিক শক্তির আলোকোজ্জ্বল দ্যুতিতে সে ভাবালুতা বর্ণাঢ্য রূপ চেতনায় ভাস্বর। অন্ধ বিশ্বাসের অনমনীয় গোঁড়ামির নিগড়ে তিনি তাঁর পাঠক-পাঠিকাকে আবদ্ধ করার চেষ্টা করেন নি—ভক্তি-প্রীতি-স্নেহের চিত্তজয়ী বন্ধনের নিমিত্তে তাঁর উক্তি আবেগবান ধারায় স্বতোৎসারিত। এয়াকুব আলীর ভক্তির প্রগাঢ় চৈতন্য বাঙ্ময় হয়েছে তাঁর 'মানব মুকুট' গ্রন্থে। এটিতে তিনি হজরত মোহাম্মদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকে নবতর আলোকে বিচার করেছেন। নবতর কথাটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। হজরত মোহাম্মদ সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই ধারণা তেমন স্বচ্ছ নয়। তিনি আল্লাহতালার প্রেরিত পুরুষ এবং তিনি নবী নামে আখ্যায়িত। নবী বলতেই আমরা তাঁর মানবিক সত্তার চাইতে অতিমানবিক বা অলৌকিক সত্তার অবিভাজ্য রূপটিকে প্রত্যক্ষ করি এবং তাঁকে এমন একটি স্থানে রেখে তাঁর মহত্ত্ব কল্পনা করি যেখানে আকাশ অথবা আল্লাহ্‌র আরশের দূরত্ব খুব কাছাকাছি। কিন্তু তিনি মর্ত্যেরই অধিবাসী—মর্ত্যরসে সঞ্জীবিত চিত্তেরই অধিকারী, দুঃখ-শোক হাসি-আনন্দের মিশ্রিত জীবনধারায় তিনি সাধারণ মানুষেরই একজন, কিন্তু উর্দ্ধ জীবনের অন্তহীন গতিতে তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে অসাধারণ। এ অসাধারণত্ব অলৌকিকত্বের দ্যোতক নয়, এ ছিল জীবনেরই পরিপূরক, যা মানবিক জীবনের জন্য একান্ত কাম্য। অন্ধকার থেকে আলোয় আসবার সাধনাই হলো মানব জীবনের একমাত্র সাধনা। মানুষ যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত তখনই আলোকবর্তিকা নিয়ে আবির্ভূত হন নবী। তাঁরা বিপথগামী মানুষের চিত্তকে আলোকিত করেন। সে আলো কোন দৈব রশ্মি নয় যার অলৌকিক প্রভাবে মানুষ চৈতন্যলাভ করে। সে আলো জীবন থেকে উৎসারিত আলো—জীবনের নানা ত্যাগে, দহনে, ঔদার্যে, মহত্ত্বে ও বীরত্বের বর্ণবহুল চমৎকারিত্বে মোহনীয়। হজরত মোহাম্মদের জীবন বিচিত্র আলোকসম্পাতে প্রোজ্জ্বল। তিনি কখনও সাধনার তুঙ্গতম প্রদেশে অবস্থান করছেন আবার কখনও মর্ত্যের মানুষের জীবনের স্রোতধারায়—যেখানে দীনতম কিংবা হীনতম মানুষের মিছিল, তাদের শোকার্ত চেতনা ও চিন্তার তিনি সার্থক দোসর। শয়নে ও ভোজনে তিনি তাদেরই পংক্তিভুক্ত। আবার এই মানুষটিরই বীর্যবন্ত চেতনার প্রকাশ ঘটে যখন তিনি বিশ্বাসহন্তাদের বিরুদ্ধে আত্মবিশ্বাসের জয়ধ্বজা নিয়ে গর্জে উঠেন। অন্যায়ের

বিরুদ্ধাচরণে তিনি কুলিশ-কঠোর। আবার এই মানুষটিই যখন আর্তের কিংবা কোন মুমূর্ষের সেবায় নিয়োজিত তখন কুলিশ কঠোরতা নিঃশেষিত, নিবেদিত আত্মার বিনম্র চেতনা তখন এক অপরূপ মাধুর্যে মণ্ডিত। এই মহামানবের এই বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বে এয়াকুব আলী শ্রদ্ধাবনত, বিস্ময়ে অভিভূত। তিনি হজরত মোহাম্মদের ব্যক্তিত্বের স্বরূপটিকে এইভাবেই তাঁর 'মানব-মুকুট' গ্রন্থে উদঘাটিত করেছেন। বলা বাহুল্য তিনি যে যুগের হাওয়ায় লালিত তাতে মুক্ত বুদ্ধিতে নবীজীর জীবনাদর্শ পর্যালোচনা করাটা খুব নিরাপদ ছিল না ; কারণ নানা ঐতিহাসিক কারণে তখন ধর্মকে গোঁড়ামির আস্তরণে কঠোর ভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরার একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। এয়াকুব আলী ধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন অন্ধকার থেকে আলোয় বিকশিত হবার সফলতম মাধ্যম হিসাবে। নিষ্ফল প্রচারণার চাইতে হৃদয়ের নিবিড়তম অনুভূতির পরিস্ফূর্তিই যেন সেখানে অধিকতর কাম্য। আত্মিক সমুন্নতির জন্য ধর্মকে যেমন আত্মগত করেছিলেন তেমনি উর্দ্ধগত হবার জন্য তিনি সম্মুখে মানবিক আদর্শ হিসাবে রেখেছিলেন হজরত মোহাম্মদকে। কারণ, তাঁর মতে 'মানুষেরই তিনি মহত্তম পরিণাম'।

'মানব মুকুটে'র বক্তব্যটিকে তিনি কোমলমতি বালক-বালিকাদের কাছে তাদের মত ক'রে তুলে ধরেছেন তাঁর 'নূরনবী' বইয়ে। তৎকালিক বহু প্রখ্যাত সমালোচক বইটিকে বাংলা শিশু সাহিত্যের জগতে অমূল্য সম্পদ বলে অভিহিত করেছেন। এয়াকুব আলীর সবগুলো গ্রন্থ পর্যালোচনা করে একটি অখণ্ড মানসিকতা, যা তাঁর সারাটি জীবনব্যাপী অবিভাজ্য চেতনায় বিদ্যমান ছিল, তাকে এক কথায় আত্মানুসন্ধান নামে অভিহিত করা যেতে পারে। তাঁর আত্মানুসন্ধানের স্বরূপটিকে কোন এক সমালোচক উদঘাটন করতে গিয়ে তাঁর তিনটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। সমালোচক তাঁর তিনটি গ্রন্থকে তিনটি স্তর হিসাবে দেখেছেন।"অধর্মের অবাধ অধিকার সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখে তাঁর অন্তরের আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে 'ধর্মের কাহিনী'তে। তারপর শান্তির সন্ধানে তাঁর পথ-চারণা যেন পরিণতি লাভ করেছে 'শান্তিধারায়'। এই শান্তির প্রমূর্ত প্রতীকরূপে তিনি দেখেছেন এমন এক ব্যক্তিকে যিনি মানুষের নিত্য ও স্বাভাবিক জীবনের সুগভীর অভিব্যক্তি— A firey mass of life cast up from the bosom of Nature herself, এবং তাঁকেই তিনি নিজে বিভিন্নভাবে, বিভিন্নরূপে বুঝতে এবং অপরকে বোঝাতে চেয়েছেন 'মানব-মুকুট' বইটাতে। উপলব্ধি, সাধনা এবং প্রচার—বিশ্বহিতব্রতী তপস্বী ও কর্মী মহা-মানুষদের সত্তাকে মোটামুটি এই তিন ভাগে বিভক্ত করা চলে। চৌধুরী এয়াকুব আলীর 'ধর্মের কাহিনী', 'শান্তিধারা', ও 'মানব-মুকুট' বই তিনটাও তাঁর জীবনের এই তিন ভাগেরই প্রতিরূপ।"

এয়াকুব আলী যখন বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেন তখন বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান বলতে ধর্মকেন্দ্রিক কতকগুলো রচনা ছাড়া অন্য কিছু ছিলনা। ধর্মাশ্রিত চিন্তা ও চেতনা পুঁথি রচয়িতাদের অপরিণত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার ছাঁচে গড়ে উঠে

CamScanner

ইতিপূর্বে যে অবিশ্বাস্য-উদ্ভট রূপ সৃষ্টি করেছিলো, মীর সাহেবের মত লেখকও তার মোহজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। মীর সাহেবের 'বিষাদসিন্ধু' যা নানা পুঁথির কাহিনী অনুসরণে রচিত, তার নানা অলৌকিক ও উদ্ভট কাহিনীর উপস্থাপনায় ইসলামের জন্য উৎসর্গীকৃত বীরদের স্বরূপটি বিকৃত হয়ে ইসলামের মর্মমূলে কি তীব্রভাবে কুঠারাঘাত হেনেছে তা বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য। পল্লী-জন-মানস-নন্দিত এই গ্রন্থখানি যে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস ছাড়া অন্য কিছু নয় একথা বিবেচনার ক্ষমতা প্রায়-অশিক্ষিত সাধারণের মধ্যে লুপ্ত কারণ তারা এর বিবৃত আখ্যান ভাগের গোটাটাকেই ইসলামেরই অংগীভূত কতকগুলি বীরের অভ্রান্ত আদর্শ-জীবন-কাহিনী হিসেবে গ্রহণ করেছে। এছাড়া সমাজে মোল্লাদের বিবেকহীন দাপটে অলৌকিক ও উদ্ভট চেতনা জনমানসে সগৌরবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রথমত পুঁথি, দ্বিতীয়ত বিষাদসিন্ধু, তৃতীয়ত মোল্লাদের অবিবেকী ইসলামী জৌস— এই তিনের সমন্বয়ে গঠিত ধর্মীয় প্রমত্ততার একটি অনমনীয় শক্তি ইসলামের অন্তর্নিহিত মাহাত্ম্য ও জৌলুসকে প্রবলভাবে খণ্ডিত করেছে। ইসলামের এই অবক্ষয়ের স্বরূপটি এয়াকুব আলী প্রথম যে-ভাবে অন্তরের উষ্ণ পরশ দিয়ে অনুভব করেছিলেন তেমন করে তাঁর সমকালীন মুসলমান লেখকদের মধ্যে আর কেউ করেছেন বলে মনে হয় না। এই অবক্ষয়ের রূপটিকে তিনি কিভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন তা লক্ষ্যযোগ্য। এখানে তাঁর লেখার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি ঃ "মিলাদের মাহফিল ও ওয়াজের মজলিসে তাঁহাকে এতকাল ধরিয়া কেবল শিখান হইতেছে—রোজা, নামাজ, তসবি-তেলোয়াত, না বুঝিয়া কোরান পাঠ। কোরআন-সাগরের বুকে ন্যায়, সত্য, প্রেম, সেবা, পরোপকার ও জ্ঞানচর্চার কত যে মহা-মানিক ঘুমাইয়া আছে, যে কথা তাহাকে কখনও বলা হয় নাই, ফলে সে মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শের সঙ্গে কোন পরিচয়ই লাভ করিবার সুযোগ পায় নাই এবং অর্থ-জ্ঞানহীন আবৃত্তির অন্ধকারে ঘুরিতে ঘুরিতে সে অতি দীন, অতি হীন এবং প্রকৃতপক্ষে অবিশ্বাসীর জীবন-যাপন করিয়া আসিতেছে। মুলমানেরা যদি একবার আত্মার সত্য, অনুভূতির মহিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলিতে পারিত, তবে তাহার শক্তির অন্ত থাকিত না। যদি তাহার সেজদা সত্য হইত, যদি সে প্রাণের বলে বলিতে পারিত, 'ইয়্যাকা নাবোদো-হে রব্বেল আলামিন, হে ন্যায়, সত্য ও পুণ্যের সম্রাট, কেবল তোমারই আরাধনা করি, কেবল তোমারই কাছে শক্তি ও সাহায্য চাই, দিন-রাত্রির অজস্র অর্থহীন আবৃত্তির মধ্যে যদি এই সত্যের বাণী তাহার প্রাণের মধ্যে সত্য করিয়া গর্জিয়া উঠিত, তার পাপ তাহাকে স্পর্শ করিত না। সমস্ত গ্লানি, সমস্ত হীনতা, সমস্ত মূঢ়তা তাহা হইতে দূরে পলায়ন করিত। সত্যের তেজ ও পুণ্যের প্রভায় যে বাংলাদেশে মনুষ্যত্বের উচ্চ মহিমা বিপুল গৌরবে ফুটিয়া উঠিত, নামাজ পড়িয়া চুরি-ডাকাতি, হত্যা, ব্যভিচার আর সে করিতে পারিত না ; অনাথ এতিমকে বঞ্চিত করিয়া, দীন দুর্বলকে উৎপীড়িত করিয়া নিজের ধনবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে সে ভীত হইত ; মিথ্যা প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইতে সে লজ্জিত হইত ; পরের সেবা ও উপকারে হজরত ইব্রাহিমের মত আপনাকে

কোরবাণী করিয়া দিতে সে কুণ্ঠিত হইত না; মদিনার মুসলমানের মত ভাইয়ের সাহিত আপনার সর্বস্ব ভাগ করিয়া খাইতে সে অপার আনন্দ অনুভব করিত। কেবলমাত্র রোজা-নামাজের কথা বলিয়া, না বুঝিয়া কোরআন পড়িবার উপদেশ দিয়া, উর্দুভাষায় মৌলুদ শরীফের বাঁধা গদ আবৃত্তি করিয়া যাঁহারা মুসলমানকে ইসলামের নৈতিক জীবনের আদর্শ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহারা তাহার সর্বনাশ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। রসুলুল্লাহ্‌র মত লম্বা কোর্তা পরিলে কি হইবে,— যদি তাঁহার প্রতি পরম প্রেমে, সত্যের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ ও সর্ব যন্ত্রণা সহ্য করিতে না শিখি; তাঁহার উপর লাখবার দরুদ ভেজিলে তাঁহার কি আনন্দ হইবে—যদি তাঁহারই ন্যায় শত্রুকে প্রেম করিতে না পারি বা বিধর্মীর সেবা না করিতে শিখি, বুভুক্ষু প্রতিবেশীর সহিত আপন অন্ন বাঁটিয়া না খাই।'

উপরোক্ত বক্তব্যে এয়াকুব-মানসের সামগ্রিক রূপটি সার্থক ও সমুজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট। তিনি কেবল ইসলামের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হওয়াতে ক্ষুব্ধই নন, যাঁরা মাহাত্ম্যকে ক্ষুণ্ণ করেন তাঁদেরকে তিনি নির্মমভাবে কশাঘাতও করেন। ইসলামের ধ্বজাধারী সালাত সিয়াম পালনকারী তথাকথিত মুসলমাদের ধর্মীয় সাধনা যে কত অসার, কত অর্থহীন তা নিরন্ন ও বুভুক্ষু মানুষের প্রতি তাদের সমবেদনাহীন চেতনার মাধ্যমে প্রকট করে তুলতে এতটুকু কুণ্ঠিত হননি, শংকিত হননি। এয়াকুব-মানসের এই নির্ভীকতা তৎকালিক মুসলিম জনমানসে ছিল অভাবিত ও অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার আস্বাদন। ধর্ম প্রচারণার উদ্দেশ্যেই এয়াকুব আলী তাঁর গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেছেন সত্য, কিন্তু সমকালীন মুসলমান লেখকদের সংগে তাঁর পার্থক্য দুই ভাবে সুস্পষ্ট ঃ এক. ধর্মের সারাৎসারটুকুকে সর্বপ্রথম আনুভূতিক সত্যতার জারকরসে জারিত করে জীবনের সর্ব কর্মে তা প্রকাশের প্রচেষ্টা ; দুই. ধর্মীয় প্রবণতা জীবনের সদাজাগ্রত চেতনার সঙ্গে সার্থকভাবে সংমিশ্রিত হতে পেরেছিলো বলেই প্রচারণায় অন্ধ প্রমত্ততাকে সচেতনভাবে পরিহার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো। ঠিক এই কারণেই তিনি অতিশয় পরিণত-প্রত্যয়ে পিউরিটানিজমের স্তর অতিক্রম করে মানবতাবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছাতে পেরেছেন এবং এই আদর্শ যে অনেকটা এ কালের প্রলেতেরীয় মানবতাবাদের সমতুল্য তাও তাঁর উপরোক্ত মন্তব্যে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকটিত। এয়াকুব আলী এখানে আপোষহীন সংগ্রামী নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ। তথাকথিত ধর্মের উপর তাঁর সংগ্রামী আক্রমণ ঃ 'তাঁহার (রসুল) উপর লাখবার দরুদ ভেজিলে তাঁহার কি আনন্দ হইবে—যদি তাঁহারই ন্যায় শত্রুকে প্রেম করিতে না পারি বা বিধর্মীর সেবা না করিতে শিখি, বুভুক্ষু প্রতিবেশীর সহিত আপন অন্ন বাঁটিয়া না খাই'। এমন উক্তির আলোকে যখন ধর্মকে যাচাই করি তখন দেখি সমাজের প্রচলিত ধর্ম যেন 'ধর্ম একটা গল্প মাত্র'। আর যাদেরকে আমরা মুসলমান বলি, মানুষ বলি তারা তখন কেবলমাত্র মনুষ্য আকারের দ্বিপদবিশিষ্ট জন্তুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এয়াকুব আলী তাঁর সারাটি জীবন কেবল সত্যিকার মানুষের সন্ধানে মানস পরিক্রমা করেছেন এবং এই পরিক্রমণের অন্তিম পর্যায়ে পরিণত-প্রত্যয়ে তিনি এক অর্থে সমাজতন্ত্রের সদর

CS CamScanner

দরজায় উপনীত হতে পেরেছিলেন বলে ধরে নেওয়া যায়। ('দুনিয়ার মজদুর এক হও' এ অর্থে নয় তবে তাদের কল্যাণ ও ইষ্ট কামনার দিক থেকে কথাটি সত্য বলে মনে হয়)। এটাকে কোন রাজনীতিক প্রজ্ঞাপ্রসূত চেতনার অনুষঙ্গ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞান বলা চলে না, মানবিক জীবনের সুসমঞ্জস ও সুপরিণত বিকাশের পূর্বশর্ত থেকে এটি উৎসারিত। সেকালের পিউরিটানিজমের সাথে একালের প্রলেতেরীয় মানবতাবাদের কি চমৎকার সংযোগসাধন ! মর্মে ও কর্মে তামসিকতার অবলুপ্তি ঘটানোর ব্যাপারে তিনি সিদ্ধকাম বলেই উদারহৃদয়ের প্রসন্নতায় অথবা মানবিকতার আশ্চর্য প্রসারতায় তিনি বুভুক্ষুদের নিয়েই ঊর্ধ্বগত হবার প্রয়াসী। আর এই শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে অন্ন ভাগ করে না খেলে ধর্ম যে নিদারুণভাবে নিরর্থক এবং জীবনের অধোগতি তাতে যে অনিবার্য এই মহৎ সাংবাদটি তিনি যে-ভাষায় ও যে-ভঙ্গীতে দিয়েছেন তা শুধু সেকাল বা একাল নয়, সর্বকালের মানুষের জন্য স্মরণীয় হয়ে রইবে।

এয়াকুব আলীর স্বল্পতম সাহিত্য সৃষ্টি— যা কেবলমাত্র প্রবন্ধের মধ্যেই সীমিত, তার আধ্যাত্মিক সুঘ্রাণটুকু তাঁর আশ্চর্য-প্রাঞ্জল গদ্যের নিরবদ্য উদাহণের মাধ্যমে পাঠকের চিত্ত-নৈর্মল্যকে সহজতর করে তোলে। চিত্তের তামসিকতা ঘুচিয়ে নৈর্মল্যলাভই ছিল তাঁর জীবনসাধনার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। তমোঘ্ন-এয়াকুব আলীর সাহিত্য কর্মের মৌল উপাদানও তাই ধর্মাশ্রিত চিন্তা ও চেতনার গভীরেই নিহিত। কিন্তু তাঁর ধর্মবোধ সর্বকালীন জীবনবোধের ব্যাপকতর প্রত্যয়ের সঙ্গে গভীরতর চেতনায় সংসৃষ্ট এবং এই মহৎ সংবাদের জন্যই তিনি তাঁর সৃষ্টির স্বল্পায়তনেও মহত্তম লেখকের একটি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বাংলা একাডেমী পত্রিকা
মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৭

সুকান্ত সমীক্ষা

সমাজকেন্দ্রিক মানুষের অন্তরিত ও অনাবৃত সত্তার যে পরিচয় আমরা বর্তমানকালে পাচ্ছি তা যুগে যুগে নানা সামাজিক ব্যবস্থা ও অবস্থার বিবর্তিত ধারার ফলশ্রুতি মাত্র। শক্তিশালী একটি শ্রেণী যুগে যুগে সমাজের অন্য দুর্বল শ্রেণীগুলোকে জীবন-সংগ্রামে পরাভূত করেছে। সেই প্রবল-পরাক্রান্ত শ্রেণীটি সমাজকে, রাষ্ট্রকে, মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকর্মকে শ্রেণীস্বার্থের কারণে নিয়ন্ত্রিত করেছে, মর্জি মাফিক ভেঙেছে, গড়েছে। প্রপীড়িত শ্রেণীর মানুষ কখনও পুঞ্জীভূত অসন্তোষে ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ হয়েছে, কখনও সংঘবদ্ধ হয়ে শুরু করেছে সংগ্রাম, ঘটিয়েছে বিস্ফোরণ। একদিকে পরাক্রান্ত শ্রেণীর মানুষের লোভের উদগ্র অভীপ্সা, লাভের নিঃসীম আকাঙ্ক্ষা, ভোগের অফুরন্ত প্রাচুর্য এবং অন্যদিকে দুর্বল শ্রেণীর সীমাহীন রিক্ততা ও বঞ্চনা, পীড়নের দুঃসহ যন্ত্রণা—এই দুই বৈপরীত্যের উৎকেন্দ্রিকতায় সৃষ্টি হলো দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বের অভিঘাতে সামজজীবনে অনিবার্যভাবে এলো রূপান্তর। চিন্তাশীল মানবদরদী দার্শনিক যুগে যুগে মানুষের তথা সমাজের এই বিবর্তিত ধারার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বিশ্লেষণ করেছেন এবং নানা পথ ও মতের সন্ধান দিয়েছেন বিশিষ্ট ভঙ্গীতে, বিচিত্র উক্তিতে। কোন মতই নিশ্ছিদ্র নয়, নিরঙ্কুশভাবে অভ্রান্তও নয়। কিন্তু কার্ল মার্কস মানুষের অতীত ও বর্তমান ইতিহাসের ধারা পর্যালোচনা করে, পৃথিবীর নানা দেশের চলিষ্ণু সমাজ-জীবনের বিবর্তিত ধারার গতি-প্রকৃতি বিচার করে যে মতবাদ প্রচার করলেন তা সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিমুক্ত না হলেও সত্যতা ও যথার্থতায়, বিশেষ করে তাঁর বিজ্ঞান-বিশুদ্ধ মানসিকতার প্রতি অনেকেই আকর্ষিত হলো। তাঁর সমাজ চিন্তার মূল কথা হলো মানুষ নিজেকে জানার অন্তর্লীন তাগিদে অহরহ সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছে তার ব্যক্তিসত্তার, তার বোধের, বুদ্ধির ও অনুভূতির ; ফলে ক্রমাগত সে একরূপ থেকে অন্যরূপে, স্বভাব থেকে স্বভাবান্তরে, সমাজ থেকে সমাজান্তরে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। তাই অবিরাম চলার প্রবাহে পুরাতন নিশ্চিহ্ন হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে জন্ম হচ্ছে নতুনের। এই ধ্বংস ও সৃষ্টির ক্রমানুবর্তিত ঐক্যের তালে তালে সৃষ্ট হচ্ছে নতুন মানুষ, নতুন সমাজ জীবন। তাই তিনি জীবনকে বলেছেন 'জীবন প্রবাহ' (Life process), সমাজকে বলেছেন সমাজ প্রবাহ' (Social process)।

মার্কসীয় চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষের অধিষ্ঠান। মার্কসবাদে ব্যক্তিবাদের চেয়ে সমষ্টিবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ব্যক্তিবোধের অতিক্রমণ বা উত্তরণ ঘটানোর জন্যেই মার্কস প্রকৃতি-চিন্তাকে সামনে রেখে বলেছেন যে, প্রকৃতিকে জানার ব্যাপকতায় ব্যক্তির স্বকীয় অস্তিত্বের সম্প্রসারণ ঘটানো সম্ভব ; সম্ভব ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর,

CamScanner

সংকীর্ণ থেকে মহত্তর চেতনার সংক্রমণ অথবা তার মধ্যে পরিপূর্ণ অবগাহন। এক কথায় এতে বিশ্বরূপ-সন্দর্শন ঘটে। সেজন্যেই মার্কস বলেছেন "Society therefore, is the complete essential unity of men with Nature, the completed naturalism of man and the completed humanism of Nature" শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ক্রমাগত স্তর থেকে স্তরান্তরে চলেছে শ্রেণী-সংগ্রামের কঠোরতার মধ্য দিয়ে। যেমন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ভাঙ্গনের অন্তরালে জন্ম হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজের। এ-রূপান্তর অনিবার্য। এ না হলে 'dialectic becomes a barren negation' (লেনিন)। এই রূপান্তরের পশ্চাতে দুটো জিনিষ সক্রিয়ভাবে কাজ করে। প্রথমত এবং প্রধানত অর্থনীতিক জীবনের অভিঘাত। মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে অর্থনীতিই সমাজ সৃষ্টির মৌলভিত্তি। অপরটি ভাব-জীবনের প্রভাব। ভাব-জীবনের তরঙ্গিত চেতনায় জীবনের রূপ বদলায়, ঘটায় রূপান্তর। মানুষের জীবনে এ-দুটো জিনিসের ধারা স্বতন্ত্রভাবে প্রবহমান। এঙ্গেলস তাই এ-দুটির স্বতন্ত্র ধারাকে Independent entities বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই দুটি ধারার যুগ্ম-চেতনায় গড়ে ওঠে মানুষের জীবনপ্রবাহ ও সমাজপ্রবাহ।

সাহিত্য বা ব্যাপকার্থে শিল্পকর্ম ভাবজীবনেরই অন্তর্গত। এবং ভাবজীবন যেহেতু সমাজজীবনের সঙ্গে সু-সংলগ্ন, বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করেই তার পরিস্ফুরণ ও পরিণতি, সেই হেতু নিশ্চিতভাবে একথা বলা যেতে পারে যে, যে-কোন কবি অথবা সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যকর্মের ফলশ্রুতিকে অবশ্যই জীবনপ্রবাহ তথা সমাজ প্রবাহের সামগ্রিক চেতনার সঙ্গে সমন্বিত করবেন, সুমিত ও সুস্থ চেতনায় জীবনের তথা, সমাজের সমগ্র রূপটিকে তুলে ধরবেন। অন্যথায় তাঁর সাহিত্যকর্ম খণ্ডিত হবে। এ কালের একজন কবি—বর্তমান বিশ্বের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক হালচাল সম্বন্ধে যিনি পুরোপুরি ওয়াকিবহাল, তাঁর ভাবজীবনকে পুষ্ট করছে বহু কিছুর সমন্বয়ে গঠিত জীবনের প্রবাহ—রাজনীতিক ও অর্থনীতিক বিপর্যয়, বৃহত্তর জনগণের উপর তার অভাবিত প্রতিক্রিয়া, বুর্জোয়া শ্রেণীর নিদারুণ লোভ ও লাভের কারণে শ্রমিক শ্রেণীর উপর নির্যাতন, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে দিকে দিকে শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রাম, সমাজতন্ত্রের অনিবার্য-অভ্যুদয়ের মর্মরিত-চেতনা ইত্যাদি। ঐ সঙ্গে তাঁর ভাবজীবন আন্দোলিত হচ্ছে কখনও আদিম কামনায় অথবা নির্লোভ সততায়, কখনও বিমল হাসি-আনন্দে, কখনও অভাবিত বেদনায়, অপ্রত্যাশিত চাওয়ায়-পাওয়ায়। আবার কখনও প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্যে কবি-মন বিস্ময়াবিষ্ট—অনুভূতি তখন বিচিত্র ভঙ্গীতে সম্প্রসারিত। একটি মনের উপর প্রতিফলিত জীবনের এই সমস্ত রূপরেখার বিচিত্র আলোকসম্পাতেই সৃষ্ট হয় অখণ্ড জীবন। সার্থক কবি-সাহিত্যিকের সাহিত্য-কর্মে এই অখণ্ড জীবন-প্রবাহের রূপটিই বিবৃত হয়, বিধৃত হয়। কিন্তু একথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে জনগণের মর্মরিত চেতনাকে মূলধন করেই শিল্প সাহিত্যের প্রকৃত কারবার চলে। শিল্প-সাহিত্যের মুক্তি সেখানেই। লেনিন তাই বলেছেন যে সকল শিল্পসৃষ্টির উৎস জনজীবন, শিল্পসম্পদের আসল মালিক জনগণ।

CS CamScanner

দুই

'কবিতা তোমায় আজকে দিলাম ছুটি
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় ঃ
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'।

বাংলা সাহিত্যে সাম্যবাদী কবিতা সম্পর্কে যাঁর সামান্যতম পরিচয় আছে তিনিও চেনেন উপরোক্ত পংক্তি তিনটির রচয়িতাকে। সুকান্ত। সুকান্ত আধুনিক বাংলা কাব্যের বহুল পরিচিত একটি নাম। ইনি জন্মেছিলেন ১৯২৬ সালে, বেঁচে ছিলেন মাত্র একুশটি বছর। এইটুকু সময়ের ব্যাপ্তিতে তিনি 'পূর্বাভাস', 'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই', 'গীতিগুচ্ছ', 'মিঠেকড়া', 'অভিযান' (একটি রূপকধর্মী নাট্যকাব্য) ও 'সূর্যপ্রণাম'— এইসব কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ছাড়া তিনি কিছু অনুবাদও করেছিলেন। অভাবিত ব্যাপার যে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন এবং সে-সব কবিতা বালকসুলভ চপলতায় আচ্ছন্ন নয়। পরিচ্ছন্ন-বিবেকের পরিমণ্ডল বক্তব্যে ও ছন্দে সুস্পষ্ট। সমগ্র পরিমণ্ডলটিও হয়েছে ভাবগম্ভীর। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে জীবনবোধের সচেতন মনোভঙ্গীটিও অভাবিতভাবে জটিল বিকারে-কাঁদা দুর্বল পৃথিবীর উত্যক্ত জীবনের—যে জীবনের স্বরূপ তিনি পরে আরও পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছেন— তার সঙ্গে সংলগ্ন হয়েই অভিব্যক্ত হয়েছে। মাত্র চৌদ্দ বছরের একটি বালক-কবি যখন বলে ঃ

'কঠিন কঠোর বিন্ধ্যাচল
অনেক ধৈর্যে আজো অটল
ভাঙ্গো বিঘ্নকে, কর শিকল
পদাহত
*　*　*
সময় যে হল বিন্ধ্যাচল
ছেঁড়ো আকাশের উঁচু ত্রিপল
দ্রুত বিদ্রোহে হানো উপল
শতশত।'

অথবা–

'আজকের দিন নয় কাব্যের
আজকে সব কথা পরিণাম আর সম্ভাব্যের।'

তখন মনে হয় যেন ছোট্ট ছোট্ট কবিতাগুলো দেশলাইয়ের ছোট্ট ছোট্ট কাঠি। মাথায় আগুনের কণিকা-শক্তি নিয়ে প্রকাণ্ড-প্রজ্জ্বলনের সম্ভাবনায় যেন উন্মুখ—অগ্নিগিরির মুখ থেকে লাভা ও গলিত পদার্থ প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বের হওয়ার যেন পূর্বমুহূর্ত। মাত্র চৌদ্দ বছরের কোন ইস্কুলে-পড়া কিশোর বালকের এহেন প্রতীকপুষ্ট মনোভঙ্গী রীতিমত

বিস্ময়কর। কোন মহৎ কবির আশি বছরের অতি-বিস্তারেও মানুষের সব চেয়ে গুরুত্ববাহী দিকটি তেমন প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি, চৌদ্দ বছরের বালক-কবির কবিতায় তাই জীবনের চরমতম সত্য হয়ে প্রবল ও প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। কবির চৌদ্দ বছরের লেখা কাব্য 'পূর্বাভাস'। একথা বোধকরি অনেকেই স্বীকার করবেন যে, আমাদের দেশে অধিকাংশ কবিই পঁচিশ বছরের আগে ভাবালুতা কাটিয়ে উঠতেই পারেন না, তা তিনি যে ধরনের কবিই হোন না কেন ; কিন্তু সুকান্ত মাত্র চৌদ্দ বছরে এ-ব্যাপারে সিদ্ধকাম। তাঁর 'পূর্বাভাস' নামক কাব্যের কবিতাগুলো ছন্দের দিক থেকে হয়তো সর্বত্র ত্রুটিমুক্ত নয়। পরিণত চিন্তার ছাপ সর্বত্র সহজলক্ষ্য নয় তাও সত্য। কিন্তু শব্দচয়নে তাঁর অবিশ্বাস্য সাফল্য। এ-কাব্যের সবগুলো কবিতাই সমকালীন জীবনের নানা অস্থিরতা ও অ-হৈতুকী বিকারকে কেন্দ্র ক'রে লেখা হয়েছিলো। জীবনের সঙ্গে সংলগ্ন বলেই তা এমনভাবে আকৃষ্ট করে।

সুকান্তের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'ছাড়পত্র'। 'ছাড়প্রত্র' কাব্যের রচনাকাল ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে। অর্থাৎ কবির বয়স তখন সতেরো থেকে একুশের মধ্যে। এই বয়সেও কবি পৃথিবীর বিপন্ন মানুষের অসহায় আকুলতায় অস্থির। কর্তব্যে অনমনীয়, দৃঢ়তায় স্থির, কিন্তু ব্যাকুলতায় দিশেহারা নন, আবেগে উচ্ছ্বসিতও নন। বজ্র-সুকঠিন দৃপ্ততায় আস্তীর্ণ তাঁর চেতনা—এবং সে-চেতনা নির্যাতিত মানুষের মুক্তিকামনায় অটল। অটল-অচল মনোভঙ্গীর দৃপ্ত-পরিচয় 'ছাড়পত্র' কাব্যের প্রথম কবিতায় লক্ষ্য করা যায় ঃ

'চলে যাব—তবু যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ-বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি
নব জাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।'

অথবা–

'তাই আজ আমারো বিশ্বাস
শান্তির লালিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।
তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে।'

'ছাড়পত্র' কাব্যখানিই সম্ভবত পরিচিতি ও খ্যাতিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এতে মোট আটত্রিশটি কবিতা ঠাঁই পেয়েছে। কবিতাগুলো আকারে দীর্ঘ নয় কিন্তু বক্তব্য পরিবেশনে যেমন অদ্ভুত সারল্য আছে তেমনি তার শরীরের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে আছে প্রতীকধর্মী ব্যঞ্জনা। আশ্চর্য-সংযমে সংহত বলেই সমগ্র কবিতা-শরীরের বাঁধুনি কোথাও আলগা হতে পারেনি। বরঞ্চ বলা চলে প্রতীকধর্মী হওয়াতে কবিতাগুলো অভাবিত-সাফল্যে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। 'ছাড়পত্র' কবিতার কোন কোন কবিতায় সামান্য

একটুখানি আখ্যায়িকা-সচেতন-স্পর্শ আছে—কিন্তু তার আগাগোড়া প্রতীকতায় আচ্ছন্ন—প্রতীকের সমগ্র রূপটি তির্যক ভঙ্গীতে প্রকাশিত হয় শেষোক্ত বিশেষণ-বর্জিত স্বল্পবাক্যের আশ্চর্য-সংযমে। এবং সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটির শরীর নাড়া খায় প্রচণ্ড শিহরণে। এমনি একটি উল্লেখযোগ্য কবিতার নাম 'একটি মোরগের কাহিনী'। এ ছাড়া প্রতীকধর্মী কবিতা হিসাবে 'চারাগাছ' 'প্রার্থী' 'কলম' 'আগ্নেয়গিরি', 'সিগারেট', 'দেশলাই কাঠি', 'চিল' এবং বহুল পরিচিত 'রাণার' কবিতার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। সর্বপ্রথম 'একটি মোরগের কাহিনী' কবিতাটি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই। কিন্তু এটি এমন একটি কবিতা যার সমগ্র উদ্ধৃতিতেই Satire-এর প্রচণ্ড শিহরণটুকু অনুভব করা সম্ভব। কবিতার সবটুকু অংশই এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

'একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেল
বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোণে,
ভাঙ্গা প্যাকিং বাক্সের গাদায়—
আরো দু'তিনটি মুরগীর সঙ্গে।
আশ্রয় যদিও মিলল,
উপযুক্ত আহার মিলল না।
সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে প্রতিবাদ জানিয়ে
গলা ফাটাল সেই মোরগ
ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত—
তবুও সহানুভূতি জানাল না সেই বিরাট শক্ত ইমারত।
শুরু হলো তার আস্তাকুঁড়ে আনাগোনা।
আশ্চর্য! সেখানে প্রতিদিন মিলতে লাগলো
ফেলে দেওয়া ভাত-রুটির চমৎকার প্রচুর খাবার।
তারপর এক সময় আস্তাকুঁড়েও এল অংশীদার
ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়াপরা দু'তিনটে মানুষ;
কাজেই দুর্বলতর মোরগের খাবার গেল বন্ধ হয়ে।
খাবার! খাবার! খানিকটা খাবার।
অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে
বারবার চেষ্টা করল প্রাসাদে ঢুকতে।
প্রত্যেকবারেই তাড়া খেল প্রচণ্ড।
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু ক'রে স্বপ্ন দেখে
প্রাসাদের ভেতর রাশি রাশি খাবারের।

তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেল,
একেবারে সোজা চলে এল
ধপধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে,
অবশ্য খাবার খেতে নয়—
খাবার হিসাবে।'

সমগ্র একটি শ্রেণীর নিদারুণ বঞ্চনার মর্মান্তিক পরিণতির অন্তরালে যে নির্মম পরিহাস তা এমন ভঙ্গীতে আর কোন সমাজবাদী, বাঙ্গালী কবি প্রকাশ করতে পেরেছেন বলে জানা নেই। কবিতার সমগ্র সত্তায় বর্ণকের বর্ণন-কুশলতায় সহজতর পরিচ্ছন্ন ছাপটি বঞ্চিত জীবনের রূঢ় সত্যকে আশ্রয় ক'রে সুচিহ্নিত। কবিতা ঠিক নয়, খাঁটি গদ্য; কেবল কবিতার আকারে কেটে কেটে সাজানো। পড়তে পড়তে মনে হবে নীরস গদ্যের গতানুগতিক একটুখানি ঘটনা, ঘটমান জীবনেরই একটুখানি বিবৃতি। ঘটনার বিবরণ ঈষৎ,বক্রতায় মোড় নেয় ঃ

'তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেল
চলে এল একেবারে সোজা
ধপধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে।'

এখানে অনুভূতি অন্য কোন নতুনতর চেতনায় বিস্তারিত হতে পারে এমনটি অপ্রত্যাশিত ছিলো। কিন্তু যখনই বলা হলো–

'অবশ্য খাবার খেতে নয়—
খাবার হিসাবে।'

তখনই আশ্চর্য-চমকে সমগ্র কবিতাটি প্রবলভাবে নাড়া খেলো। মনে হলো কবিতাটির শরীরে শিরা-উপশিরা আছে। আর উত্তপ্ত রক্তের প্রবাহটা সেই মুহূর্তেই অনুভূত হলো তীব্রতার সঙ্গে। বঞ্চিত মানুষের বঞ্চনার স্বরূপটা পরিহাসের এমন সুতীব্র-আবরণে বিশেষণ-বর্জিত একটিমাত্র বাক্যে প্রকাশিত হলো যে তাকে বিস্ময়কর না বলে উপায় নেই। শাব্দিক-সারল্যের এমন ঋজু ভঙ্গীতে কথা বলা কেবল তখনই সহজ হয় যখন বক্তব্য ও ছন্দের উপর কবির মনে কোন সংশয় থাকে না, থাকে না মতবাদে কোন দোলাচাল মনোভঙ্গী। সুকান্ত যে ছন্দ-কুশলী তা বোঝা যায় তাঁর শব্দ-প্রয়োগের আশ্চর্য সংযমে। এ-কবিতায় এবং অন্যান্য অনেক কবিতায় তিনি পয়ারের সঙ্গে হসন্ত শব্দের ব্যবহারে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। হসন্ত শব্দকে তিনি পরবর্তী স্বরান্ত শব্দের সঙ্গে এমন কৌশলে ব্যবহার করেছেন যাতে গদ্য ছন্দের অনতিলক্ষ্য স্রোতটি প্রবহমান থেকেছে। এই প্রবহমানতার কারণেই বিদ্রূপের তির্যক ভঙ্গিটি স্বচ্ছন্দ অথচ সংযতভাবে বিস্তারিত করা সহজ হয়েছে। সম্ভবত এ ব্যাপারে তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নিকট থেকে পাঠ নিয়েছেন । সংযমের লেশতম শৈথিল্যে কিংবা সামান্যতম ঔদাসীন্যে এ-কবিতার

আগাগোড়াই মাটি হতো: কিন্তু কবি আশ্চর্য সফলতায় কবিতাটিকে নিখুঁত-নিটোল রূপদানে সক্ষম হয়েছেন। সারল্যের অনুশীলন কেবল শব্দ প্রয়োগেই সার্থক হয়েছে তাই নয়, বক্তব্যের উপস্থাপনায় তাঁর অনুশীলিত-সারল্য আশ্চর্য সাফল্যে দীপ্যমান। কবিতা কেন লেখেন, কাদের জন্যে লেখেন সেসব বিষয়ে কবি পুরোপুরি সজাগ ও সচেতন। শিল্পকর্মের সারাৎসার বৃহত্তর জনগণের বোধশক্তি ও অনুভূতির দ্বারাই পুরিপুষ্ট এবং কবির অনুভূতির উৎস ও বিস্তার বৃহত্তর জন-জীবন-কেন্দ্রিক—এসব ধারণাকে তিনি স্বকীয় বিশ্বাসের বিশিষ্ট ভঙ্গিতে লালন করেছেন। শিল্পকর্ম সম্পর্কে লেলিন বলেছেন ঃ 'Art belongs to the people, It ought to extend with deep roots into the very thick of the broad toiling masses and loved by them. And it ought to unify the feelings, thought and will of these masses, elevate them.'— হয়তো লেনিনের এই মতবাদকে সচেতনভাবে গ্রহণ করার ফলেই তাঁর লালিত বিশ্বাস এত সুদৃঢ় হতে পেরেছিলো।

'ছাড়পত্র' কাব্যের অন্যান্য কয়েকটি কবিতায় প্রতীকের ব্যঞ্জনা সফল-সঞ্চারী। কতকগুলো কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। যেমন 'চারাগাছ' কবিতায় ঃ

'ছোট ছোট চারাগাছ–
নিঃশব্দে হাওয়ায় দোলে, কান পেতে শোনে ঃ
প্রত্যেক ইটের নীচে ঢাকা বহু গোপন কাহিনী
রক্তের ঘামের আর চোখের জলের।
তাই তো অবাক আমি দেখি যত অশ্বত্থ চারায়
গোপনে বিদ্রোহ জমে, জমে দেহে শক্তির বারুদ
প্রাসাদ-বিদীর্ণ করা বন্যা আসে শিকড়ে শিকড়ে'

'দেশলাই কাঠি' কবিতায় ঃ

'আমরা বারবার জ্বলি, নিতান্ত অবহেলায়–'
তা তো তোমরা জানোই।
কিন্তু তোমরা তো জানো না
কবে আমরা জ্বলে উঠবো......
সবাই শেষ বারের মতো।'

'অনুভব' কবিতায় ঃ

'এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম
অবাক পৃথিবী! সেলাম, তোমাকে সেলাম।'

'রাণার' কবিতায় ঃ

'রাণার! গ্রামের রাণার।

সময় হয়েছে নতুন খবর আনার ;
শপথের চিঠি নিয়ে চল আজ
ভীরুতা পিছনে ফেলে......
পৌছে দাও এ নতুন খবর
অগ্রগতির মেলে
দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখুনি
নেই দেরি নেই আর।
ছুটে চলো, ছুটে চলো আরো বেগে
দুর্দ্দম, হে রাণার।।'

কিংবা 'হে মহাজীবন কবিতায় ঃ

'কবিতা তোমায় আজকে দিলাম ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়ঃ
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।'

কবিতাগুলোর সর্বত্র ছান্দিক সৌকর্য আছে একথা বলা যায় না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বক্তব্যের ঋজুভঙ্গীটি কোথাও হোঁচট খেয়েছে বলে মনে হয় না। পারস্পরিক বাক্য বিনিময়ের অনায়াস-ভঙ্গীটি, যা অন্তর্গত-আবেদনে বাঙময়, তারই আমেজ লক্ষ্য করা যায় প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাতে। কিন্তু এ-ভঙ্গী সফল হতো না যদি বাচ্যাতীত বক্তব্যটি কবিতার সমুদয় শরীরে প্রচ্ছন্ন না থাকতো। এবং এ কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে তিনি তাঁর বক্তব্যকে সঞ্চারিত করেছেন ঘটমান জীবনের কতকগুলি বহুল-ব্যবহৃত ও অতি-পরিচিত জিনিষের কথা উল্লেখ ক'রে। প্রচন্ড বিস্ফোরণের সম্ভাব্য সত্যকে তুলে ধরতে গিয়ে তিনি আজগুবী অথবা উদ্ভট কাব্যস্মৃতির (allusion) সহায়তা না নিয়ে কখনও অহরহ-ব্যবহার্য সামান্য একটা দেশলাইয়ের কাঠি কিংবা একটা কলম অথবা একটা সিগারেট—এইসব সামান্যতম বস্তুর সাহায্য নিয়েছেন। বলাবাহুল্য এতে ক'রে বৃহত্তর জনগণ তাঁর কাছ থেকে অন্তরঙ্গতার উষ্ণ পরশটুকু পুরোপুরি অনুভব করার সুযোগ পেয়েছে। সুকান্ত লিখেছেন অল্প। এত অল্প লিখে তিনি যে এত বেশী পরিচিত হয়েছেন তার কারণ তাঁর এ ধরনের কবিতা। সাধারণ পাঠকের কাছে সুপরিজ্ঞাত এইসব চিত্রকল্পের সাহায্যে লেখা কবিতাগুলোর আবেদন তাই এত সংবেদনশীল হয়েছে।

'ঘুম নেই' কাব্যের কবিতার সংখ্যা মোট ছত্রিশ। 'ছাড়পত্রে'র পরে প্রকাশিত গ্রন্থ এটি। এই কবিতাগুলোর প্রায় সবগুলোতেই বক্তব্য আগের কাব্যের মতোই বাস্তবধর্মী। তবে প্রত্যেক কবিতার বক্তব্য অধিক স্পষ্টতায় উচ্চারিত এবং বক্তব্যে সমাজবাদী মনোভঙ্গীটি যেন আরো কুঠার-কঠোর। রাজনীতির শ্লোগান কতকগুলি কবিতাকে বেশী করে আশ্রয় করেছে। কিন্তু শ্লোগানের অন্তর্নিহিত বক্তব্য রাজনীতির সংকীর্ণতার সংক্রাম থেকে মুক্তি পেয়েছে অনায়াসে এবং সেইজন্যেই চেহারায় ও চারিত্র্যে কবিতাগুলো

সমাজবাদী মতাদর্শের ছাপ থাকলেও তা সংগ্রামী ও বৈপ্লবিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত হতে পেরেছে।

'ছাড়পত্রে'র শেষ কবিতা 'হে মহাজীবন'-এ কবি বলেছেন ঃ

'হে মাহজীবন, আর কাব্য নয়–
এবার কঠিন কঠোর গদ্য আনো,
পদ লালিত্য-ঝঙ্কার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।'

কঠিন-কঠোর গদ্যের এই নমুনা আমরা 'ছাড়পত্র' কব্যে পেয়েছি। আশ্চর্য সফলতায় তিনি সে রীতিতে সেখানে উত্তীর্ণ। এ কাব্যেও ঐ রীতির উত্তরণে তিনি সিদ্ধকাম। বিপ্লব যখন আসন্ন, নিরীহ মানুষের বিপন্নতায় বিস্ফোরণ যেখানে প্রত্যাসন্ন, তখন কবিতার অলংকরণে ভাষার মৃদুতা ও পেলবতা নিতান্তই অসংগত, অপ্রতাশিত। তখন কঠিন-কঠোর গদ্যই হয় প্রকাশের সহজতম বাহন। এবং সেই ভাষাই হয় কবিতার শ্রেষ্ঠ অলংকার। এরূপ অংলকরণের আশ্চর্য সফলতা লক্ষ্য করা যাক্। যেমন 'পয়লা মে ১৯৪৬' কবিতায় ঃ

'তার চেয়ে পোষ মানাকে অস্বীকার করো
অস্বীকার করো বন্যতাকে।
চলো, শুকনো হাড়ের বদলে
সন্ধান করি তাজা রক্তের,
তৈরী হোক লাল আগুনে ঝলসানো আমাদের খাদ্য।
শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গজিয়ে উঠুক
সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাড়ে।'

আর একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতায় ঃ

'আমি যেন সেই বাতিওয়ালা,
যে সন্ধ্যায় রাজ পথে-পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে
অথচ নিজের ঘরে নেই যার বাতি জ্বালার সামর্থ্য,
নিজের ঘরেই জমে থাকে দুঃসহ অন্ধকার।।'

এ গদ্য কঠিন, এ গদ্য কঠোরও। অথচ কত সহজবোধ্য শব্দের উপস্থাপন। কষ্টকল্পিত শব্দে বক্তব্যকে দুর্বোধ্য করার প্রয়াস নেই ; জনবোধ্য বিষয়ের প্রাধান্যে দুর্বোধ্যতা অসংগত তাই বক্তব্য সংহত হলো, হলো শাণিত।

'মিঠে-কড়া' কাব্যে নতুন ধরনের ছড়ার প্রবর্তন লক্ষ্যযোগ্য। এ ছড়া গতানুগতিক নয়, এর মজ্জায় মিশে আছে সাম্যবাদী চেতনারই আদর্শ। বুর্জোয়াদের বিলাসবহুল জীবনের অফুরন্ত আয়াস ও সুখের প্রতি জিজ্ঞাসাচিহ্নের দ্বারা যে তির্যক-কটাক্ষ হেনেছেন ভঙ্গীর দিক থেকে চটুল হলেও তা উপভোগ্যও বটে। যেমন 'পুরনো ধাঁধায়' ঃ

'বলতে পারো বড় মানুষ মোটর কেন চড়বে ?
গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে ?
বড় মানুষ ভোজের পাতে ফেলে লুচি মিষ্টি।
গরীবরা পায় খোলামকুচি, একি অনাসৃষ্টি ?
বলতে পারো ধনীর বাড়ী তৈরী যারা করছে,
কুঁড়ে ঘরেই কেন তারা মাছির মত মরছে ?
হিং টিং ছট প্রশ্ন এসব মাথার মধ্যে কামড়ায়,
বড়লোকের ঢাক তৈরী গরীব লোকের চামড়ায়।'

ধনপতি পাল খান না, সব রকম খাবারেই তাঁর অরুচি — অরুচি নেই শুধু টাকায়। তিনি শুধুই টাকা টাকা করে চেঁচান কিন্তু খান না কিছুই। তাঁর রোগমুক্তি ঘটাতে ডাক্তার কবিরাজের বিদ্যে ব্যর্থ হলো। অনুগত নায়েব তাই চিন্তিত।

'নায়েব অনেক ভেবে বলে হুজুরের প্রতি
কী খাদ্য চাই ? কী সে খেতে উত্তম অতি ?
নায়েবের অনুরোধে ধনপতি চারদিক
দেখে নিয়ে বার কয় হাসলেন ফিক্-ফিক্ :
তারপর বললেন ঃ বলা ভারি শক্ত
সবচেয়ে ভাল খেতে গরীবের রক্ত।।'

নিদারুণ রসিকতা! কিন্তু কি প্রচন্ড কশাঘাত। মিঠে-কড়ার ছোট ছোট কবিতায় রসিকতার মসৃণ-প্রলেপে কবি যে কশাঘাত হেনেছেন তা সমাজবাদী চেতনা-সম্পন্ন পাঠকের নিকট স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সুকান্তের সমাজবাদী সত্তার রূপান্তর ঘটেছে 'গীতিগুচ্ছ' ও 'পত্রগুচ্ছ'-এ এসে। যেমন 'গীতিগুচ্ছ'তে ঃ

'কঙ্কণ-কিঙ্কিণী মঞ্জুল মঞ্জীর ধ্বনি,
মম অন্তর প্রাঙ্গণে আসন্ন হলো আগমনী
ঘুমভাঙ্গা উদ্বেল রাতে,
আধফোটা ভীরু জ্যোৎস্না তে
কার চরণের ছোঁয়া হৃদয়ে উঠিল রণরণি।'

এ ধরনের কবিতা পড়লেই বোঝা যায় যে তিনি প্রেম ও বিরহ চেতনায় কৈশোর-উত্তীর্ণ নন। কবিতাগুলো আবেগঘন না হয়ে হয়েছে নিতান্তই ফিকে ও পানসে। শ্যামলিমা-বিস্তারিত বাংলাদেশে দখিনা-সমীরণ-পুলকিত, ফাল্গুন-আকৃষ্ট প্রেমেপড়া চিত্তের ভাবালুতার কথা সুবিদিত — তাই প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্যের সাথে সাথে মানুষের মন হয় রূপান্তরিত — রূপে রূপে হয়ে ওঠে অপরূপ। মানুষ প্রেমে অনুভব করে নিবিড়তম আশা, বিরহে মধুরতম হতাশা। কবির এ অনুভূতি কেবল ব্যক্তিজীবনে সীমিত থাকে না, ব্যক্তির

সীমানা থেকে টেনে তাকে ছড়িয়ে দিতে হয় ব্যাপকতর, বৃহত্তর পরিধিতে। প্রেম ও বিরহ দুষ্য নয়— প্রেমের সহর্ষ ও বিরহের বিষাদময় ভাবটিকে ব্যক্তির সীমা থেকে বৃহতের সীমায় টেনে না আনতে পারলে সেটি হয় দোযাবহ। এ ভাবে অতিক্রমণ না ঘটলে সাহিত্যে তা হয় অপাংক্তেয়। সুকান্তের গীতিগুচ্ছ কাব্যের প্রেমসঞ্জাত অথবা বিরহপুষ্ট কবিতায় ঐ ধরনের কোন ব্যাপকতর ইঙ্গিত অথবা উচ্চতর চারিত্র্যগুণ নেই বলেই মনে হয়েছে। তাই এগুলো নিছক আত্মরতিতে পর্যবসিত।

'পত্রগুচ্ছ' কাব্যের মধ্যেও মানসিক ব্যাপ্তির সুস্থির কোন চেতনার প্রকাশ ঘটেনি। অবশ্যি পত্রঘটিত ব্যাপার, নিতান্তই ব্যক্তিগত চেতনাকে কেন্দ্র করে পল্লবিত হয়ে থাকে। 'পত্রগুচ্ছ'তে প্রেমের চেতনায় কখনো কবি উদ্দীপিত, উচ্ছ্বসিত— প্রেমের সংরাগে সে উচ্ছ্বাস বালকসুলভ চপলতায় আচ্ছন্নও হয় কখনও কখনও। আবার হতাশায় ম্রিয়মান হয়ে কখনও-বা লোকালয় থেকে 'গহন অরণ্যে— যেখানে স্পষ্টমনা হিংস্র আর নিরীহ জীবেরা বাস করে— সেখানে মন চলে যেতে চায়। সুকান্ত তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সে প্রেমে (?) পড়েছিলেন একাধিক বালিকার সঙ্গে। প্রেমতাড়িত চিত্তের অস্থিরতার প্রকাশ এইসব পত্রে অনায়াস-লক্ষ্য। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে প্রেমজনিত ব্যাপারে যে মানসিক অস্থিরতা ও বৈকল্য অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছিল, সমাজবাদী কবিতাসমূহে তার সামান্যতম প্রভাবও লক্ষ্য করা যায় না। যখন তিনি এক বা একাধিক বালিকার প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত তখন তিনি 'পূর্বাভাস' কাব্যের কিছুসংখ্যক কবিতা রচনা করেছেন। স্মরণীয় যে, তখন তাঁর বয়ঃক্রম তেরো অথবা চৌদ্দ। 'গীতিগুচ্ছ' ও 'পত্রগুচ্ছ' এর রচনাকাল যদি প্রথমদিকেই হয়ে থাকে (সময়ের নির্দিষ্ট ধারণায় সংশয় আছে বলে) তাহলে তাঁর মানসিক ভাবধারার বিবর্তন, রোমান্টিকতাকে বর্জন করে সমাজবাদী চেতনাকে অর্জন, বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এবং সেই সমাজবাদী মনোভাবকে তিনি শেষ পর্যন্ত লালন করেছেন। একটি মুহূর্তের জন্যেও তিনি ভ্রষ্ট হননি, বিচ্যুত হননি।

সুকান্ত বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে কম বয়সে, অতিশয় কম লিখে, সমাজবাদী কবি হিসাবে যেভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন তা অন্য কোন কবির জীবনে ঘটেনি। মাত্র তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর মানব-চৈতন্যের অপরিণত কিন্তু বিশুদ্ধ অনুভূতি ও চেতনা যে ভাবে মানব-প্রত্যয়ী হয়েছে তার কোন নজীর বাংলা সাহিত্যে নেই।

গণ-চেতনার প্রবল চাপে সাম্প্রতিককালের বুর্জোয়া-শাসিত সমাজ-জীবনের ভিত আলগা হয়েছে। জীবন হয়েছে উৎকেন্দ্রিক। সামান্যতম উৎকর্ণতায় অনাগত উজ্জ্বল জীবনের পদধ্বনি স্পষ্টভাবেই শোনা যায়। জীবনের চিরাচরিত মূল্যেবোধগুলো যা বৃহত্তর সমাজ-জীবনের পথে প্রতিঘ হয়ে দাঁড়ায়, সেসব মূল্যবোধ মানুষের জীবনের পাতা থেকে মুছে যাচ্ছে। পল্বলে ধ্বনিত হচ্ছে স্রোতগ স্রোতস্বিনীর কল্লোল। তাই কাব্য-জিজ্ঞাসায়ও দেখি আনন্দবর্ধন অথবা ইদানিং কালের অতুলগুপ্ত অপাংক্তেয়। জীবনকে মিলিয়ে, জীবনের ইতিহাসের ধারাকে মিলিয়ে হয় জীবন-জিজ্ঞাসা তথা সাহিত্য-জিজ্ঞাসা। মানুষই

সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু, সবকিছুর সারাৎসার, সবকিছুর পরিমাপক। সে মানুষ বুদ্ধির উৎকর্ষে অথবা সুখী জীবনের সুপ্রতিষ্ঠায় কুলীন কিনা তা বিচার্য নয়। সে মানুষ বৃহৎ মিছিলের মানুষ, জীবনের অনিবার্য পীড়নে ও দহনে তার অস্তিত্ব, তার অস্তিত্ব ইতিহাসের স্রোতগ ধারার পটভুমিতে। এরা সংখ্যাবাচ্যে যেমন বৃহৎ, তেমনি শক্তিতে মহৎ। আর এ-মাহাত্ম্য-স্মরণ বিজ্ঞান-বিশুদ্ধ-মনুষ্যত্বের উজ্জীবনেই সম্ভব হয়। লেলিন তাই শিল্পকর্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'শিল্পকর্ম মানুষের জন্য—এর সম্প্রসারণ ও ব্যাপ্তি' পরিশ্রমী মানুষের মর্মমূলকে স্পর্শ করেই হবে ঘটে থাকে। বৃহত্তর জনগণের মনন, চিন্তন ও অনুভূতির প্রতিফলন অবশ্যই লক্ষ্য করা যাবে শিল্পকর্মের মাধ্যমে। শিল্পকর্ম ঘর্মাক্ত মানুষের মুক্তচৈতন্যের বার্তাবাহী। সুকান্তের কাব্যে লেলিনের উক্ত ধারণা সুপ্রকটিত। সুকান্ত শুধু কবি নন, তিনি আশ্চর্য রকমের সৎবুদ্ধিসম্পন্ন কবি। তিনি কর্মীও। কর্মের ও কবিত্বের অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে সুকান্তে! সংগ্রামী জীবনের কর্মের সততায়, কবিত্বের কাপট্যশূন্য সরলতায় তাঁর কবিতা বৃহত্তর জনগণের কবিতা হয়েছে। কেবল স্বল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবীদের জন্য তাঁর কবিতা লিখিত হয়নি। এ ব্যাপারে নান্দনিক-বৈগুণ্য ঘটলেও তিনি অপারগ। সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁর কবিতার মূল্যায়নে কাল-চেতনা তাঁর প্রতি কতখানি নির্মম হবে অথবা প্রশংসিত-চেতনায় কতখানি উদ্বেলিত হবে তা নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল। সুকান্ত কবি হিসাবে বিশুদ্ধভাবে আন্তরিক। তিনি তাঁর কবিতায় মার্কসবাদ-লেলিনবাদের বিজ্ঞান-বিশুদ্ধ মানবিকতার উজ্জীবন ঘটিয়েছেন পরম নিষ্ঠায় ও উষ্ণ আন্তরিকতায়। এই কবির প্রয়াণ যদি একুশে না হয়ে একাশিতে হতো তাহলে তাঁর কাব্যের পরিণতি ও উৎকর্ষ কেমন রূপলাভ করতো তা ভাবলে অবাক লাগে।

কবিতা কি ? কবিতার উদ্দেশ্য কি ? তার প্রকৃত সংজ্ঞাই বা কি ? কবিতা সম্পর্কে এমনসব বিতর্কবাহক প্রশ্ন সব যুগেই ওঠে থাকে। কেউ বলেন, 'কবিতা রসাত্মক বাক্য'। কেউ বলেন, 'কবিতা দৈব্যবাণী।' কেউ বলেন, 'কবিতা রঞ্জনীশক্তি.' 'কবিতা লোকশিক্ষা'। অনেকে বলেন, 'কবিতা অবিস্মরণীয় বাণী।' আবার কেউ বলেন, 'কবিতা সমাজের মর্মোৎসারী অভিব্যক্তি।' যুগে যুগে কবিতার সংজ্ঞা বদলেছে। বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস অথবা আলাওল কবিতার মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা ভেবেছেন বহুকাল পরে ঈশ্বর গুপ্ত অথবা বঙ্কিম তা ভাবেননি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ব-কালের কবিতার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা তাঁর সমকালে অথবা বর্তমানকালে চূড়ান্ত বলে গৃহীত হয়নি। কবিতার কোন নির্ধারিত সংজ্ঞা নেই। কবিতা বিচারের কোন গাণিতিক নিয়মও নেই। কোন একটি কবিতা অথবা কবিতার খন্ডাংশ তার শব্দার্থে, ভাবার্থে, ব্যঙ্গার্থে, অথবা ধ্বনির অদ্ভুত গুঞ্জনে, সুরের চমৎকারিত্বে অথবা প্রতীকের ব্যঞ্জনায়— এসবের কোনও এক বা একাধিক গুণে পাঠকের হৃদয় জয় করতে পারে। নিয়মের নির্ঘন্ট মিলিয়ে কবিতার আস্বাদন হয় না। জীবনের মর্মোৎসারী উৎসংগের সাথে কবিতার অন্তরঙ্গ সংসক্তি, সে আসক্তি কখনও সৌন্দর্যের অনুধ্যানে অনুরঞ্জিত, কখনও ব্যক্তিজীবনের অন্তর্মুখী কামনায় উজ্জীবিত,

কখনও নৈর্ব্যক্তিক চেতনায় মন্ডিত, আবার কখনও শ্রেণীহীন সমাজের সমুচ্ছ্রিত-চেতনায় উচ্চকিত। বিচিত্রবিধ অনুভূতির প্রকাশ ঘটে কবিতায় ;কখনও সমন্বয়ে, কখনও ভিন্ন ভিন্ন চেতনার অনুষঙ্গে। কবিতা রূপকথা নয়; কবির প্রারম্ভিক, কৈন্দ্রিক, প্রান্তিক ও দৈগন্তিক অস্তিত্বের মূলে আছে মানুষ। মানুষ আর আছে প্রকৃতি। মানুষ বললে তার কালের কথা আসে। স্ব-কাল ও অনন্তকাল। যা বিগত ও যা আগত এবং যা গতিমান তাই অনন্তকাল! অনন্তকাল বললে ইতিহাসের অবিরাম স্রোতধারার কথা আসে। শ্রেণীসংঘাতের কথা আসে, আসে জীবনধারার কথা। আসে মানুষের মনন, চিন্তন ও অনুভূতির কথা। স্ব-কালে অবস্থান করে কবি জীবনের বিচিত্র তরঙ্গাঘাতকে স্বকীয় অনুভূতির রসায়নে কখনও ঘটমান জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে, কখনও জীবনের অন্তরালে অবস্থিত কল্পনাশ্রিত চৈতন্যকে, কখনও প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যকে রসায়িত করেন ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গীতে, ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে। এই ভঙ্গী কখনও সরলতায়, কখনও বক্রতায়, কখনও তির্যকতায় নিটোল রূপ নেয়। আঙ্গিকের বেলায়ও দেখি কোন কবির ঝোঁক শব্দের সরলীকণে, আবার কোন কবির দুরূহ ও সরলের সংমিশ্রণে। কোন কবির কাব্যস্মৃতির (allusion) জট উন্মোচিত হয় সহজতম বিজ্ঞতায় ; আবার কোন কবির বেলায় তা হয় কঠিনতম চর্যায়। কেউ হন সাধারণ-লোকবোধ্য। কেউ অসাধারণ-বোধ্য। কেউ ঘর্মাক্ত জনগণের, কেউ বিলাসী মুষ্টিমেয়ের। কবিতার উৎসারণ ও মূল্যায়নের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দান আমার অভিপ্রেত নয়। আমার উদ্দেশ্য সাধারণ লোক-বোধ্য সাম্যবাদী কবি হিসাবে সুকান্তকে পাঠকের সামনে তুলে ধরা।

পরিক্রম
ফেব্রুয়ারী-মে, ১৯৭০